পথে প্রান্তরে

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯

তৃতীয় সংস্করণঃ১৯৬০

প্রচ্ছদ

নীলরতন চট্টোপাধ্যায়

ব্লক

স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে শ্রীমনোমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও জ্ঞানোদয় প্রেস, ১৭ হায়াৎ খাঁ লেন, কলিকাতা ৯ হইতে শ্রীনীলরতন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

সরকারী কর্মচ্যুতি ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ আমার পরিবার-পরিজনকে স্বভাবতই আমার প্রতি বিরূপ করেছিল। অগ্রজ জানতে চেয়েছিলেন, বিগত বিশ বছর ধরে কী করেছি। মুখে বলার চেয়ে লিখে জানানোই ভালো মনে করে সব কিছু উপাদান সংগ্রহ করে বইখানা লিখেছিলাম আমার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে। হয়তো এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি বাক্সের তলাতেই থেকে যেত, শুধু এক-জনের সস্নেহ চেষ্টায় বইখানা জনসমাজে হাজির করা সম্ভব হয়েছিল। আমার অগ্রজ শৈলেশচন্দ্র রায় জীবিত নেই, আর যাঁর স্নেহধন্য হয়ে এগিয়ে চলেছি সেই পরম শুভানুধ্যায়ী প্রখ্যাতনামা সাংবাদিক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেনও জীবিত নেই। তাঁদের পুণ্যস্মৃতির স্মারক হয়ে থাকুক এই তৃতীয় মুদ্রণ।

গ্রন্থকারস্য

১৩৬৯

এই লেখকের :

পথে প্রান্তরে ১ম পর্ব

পথে প্রান্তরে ২য় পর্ব

যশাইতলার ঘাট

রূপোতি

কবি কংক [রাষ্ট্রীয় পুরস্কার-প্রাপ্ত]

বাদশা বেগম নফর

এই শহরে

গৌড় কন্যা

তিস্তার চরে

কোন এক রাতে

পথ যে আমায় ডাকে

অপ্রচলিত ও বিদেশী শব্দের অর্থ

জোশ—গৌরব
কওমের খেদমত—জাতির সেবা
এলেম—জ্ঞান
হাওলা—দায় অর্পণ
নেক—পবিত্র
গ্রেফ্‌তারী—পরাধীন
তোয়ারা—চলে যান
খামোশ – নীরব
বদদোয়া—অভিশাপ
নিমকহালাল—বিশ্বস্ত
হালালী—সৎ
বে-ইনসাফী—অবিচার
হৌটে—ঠিক আছে
ভাবী—বৌদি
মিল মহব্বৎ—প্রীতি, ভালোবাসা
সা-পুরী—পঞ্জাবের সাহাপুর জেলার লোক
শান, মন, ছীন, কাচিন—বর্মার উপজাতি
তেঁতুলে মুসলমান—মাদ্রাজী মুসলমান
চুলিয়া—মাদ্রাজের একশ্রেণীর মুসলমান
দীনিয়াত—মুসলমানের ধর্মপুস্তক বিশেষ
ফুফা—পিসী
ফারাজ—মুসলমানদের সম্পত্তি বিভাগ করা
রাইয়ৎ—প্রজা
এতিম—বাপ-মা হারা

তোমার হয়তো ঘেন্না ধরে গেছে জীবনে। তা ধরবে বইকি, অযাচিতভাবে সইতে হয় অনাহার আর অভাব, সইতে হয় পরবাসের জ্বালা! অথচ তোমায় বলা হয় নি আমার সব কাহিনী। কেন যে জীবনটা দুর্দান্ত হয়ে উঠল, তা হয়তো জান, তবুও ছন্নছাড়া এ জীবনের সব কথা তো তোমায় বলবার সুযোগ আর অবসর পাই নি, তাই বোধহয় তোমার অভিমান। বলবো বলবো ভেবেছি, অথচ গুছিয়ে বলতে পারি নি; সবগুলো কথা একসঙ্গে মনেও তো আসে না ছাই। পথ চলতে বাধ্য হয়েছি। ঘর ভাঙতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু কেন?

লক্ষ্মীছাড়ার আবার ঘর—পথই তার ঘর!!

পথ চলবার আগে ভারতের রেখাচিত্রখানা ভালো করে যদি দেখতুম, তা হলে সময় ও শ্রমের লাঘব হত। আবার, জন্মের আগে যদি বিধাতার কাছ থেকে ঠিকুজিখানা হাতড়ে আনতে পারতুম, তা হলে রেখাচিত্র দেখবার কোনই প্রয়োজন হত না। বিধাতা পুরুষ বললেন, যাও ভারতে মনুষ্য জন্ম নিয়ে পশু-জীবন যাপন করগে। আর পুলিস বললে, যাও পঞ্জাবে থেকে, পশুশ্রেষ্ঠ সারমেয়-জীবন যাপন করগে।

তাই ঠিকুজিও দেখা হয় নি, ভারতের রেখাচিত্রও দেখা হয় নি। ঘুরে বেড়াবার নেশাটা আফিমের নেশার মত মৌজ সৃষ্টি করেছে, তাই ঘুরেছি ও ঘুরছি। কি করে এই নেশার উৎপত্তি, তাই আবিষ্কার করতে চাইছি।

হোটেলে বসে ছিলুম। গত সোমবারে ছিলুম কলকাতায়, বুধবার অবধি ছিলুম রেঙ্গুন, বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যেয় এলুম ব্যাঙ্কক। হাজার মাইল পথ সোজাসুজি মাত্র ক ঘণ্টায় পাড়ি জমিয়েছি। নিজেকে দিগ্বিজয়ী মনে হচ্ছিল।

এ হেন দিগ্বিজয়ীর সামনে এসে ওয়েটারনী বললে—কফি!

—না, চা!

চায়ে চুমুক দিয়েই মনে পড়ল উনিশ শো একত্রিশ থেকে পঞ্চাশ সালের শেষ অবধি অথবা একান্ন সাল ধরেই এই সুদীর্ঘ বিশটা বছর আমি কি করলুম। সেই সব ভাবতে ভাবতে কাগজ কলম নিয়ে তোমায় চিঠি লিখতে বসেছি।

অর্থব্যয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তার দশগুণ

সময় আর সামর্থ্য ব্যয়ে কি তার চেয়ে কম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি? অঙ্ক কষে দেখবার হলে, দেখতুম ঠিকই, কিন্তু তা নয় বলে, মনের কাছে জিজ্ঞেস করি, চিরকাল তো রাজনীতির ক-খ পড়লাম, অর্থনীতির অ-আ শুরু করেছি, কিন্তু শিখেছি কি?

নর ও নারী, পরাধীনতা আর স্বাধীনতা, প্রাচুর্য আর অভাব, রাজতন্ত্র আর গণতন্ত্র, সব কিছু দেখতে দেখতে এক জায়গায় এসে থেমে গেছি। সে জায়গাটায় রয়েছে বিশ্বজোড়া একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন—?

যাদের উপর দিয়ে উড়ে এলুম, ওরা কারা? ঐ যে পর্বত, ঐ যে নদী, ঐ যে মাটি, ঐ যে সমুদ্র, ঐ যে বন, ঐ যে চাষের ক্ষেত—এরা কি? এদেরও একটা ইতিহাস রয়েছে, এরা বলতে পারছে না, কেউ হয়তো লিখে রাখে নি; কিন্তু এরাও পৃথিবীর একটা অংশ। এদের দিয়েও ইতিহাস তৈরী হতে পারে। হয়তো পারে। কিন্তু ঐ-যে অগণিত নর-নারী, ওদের ইতিহাসই লেখা হয় নি, কি করে প্রাণহীন, জড় পদার্থের ইতিহাস লেখা হবে। একটা মানুষ, সে জন্মাল, বড় হল, মরণের কোলে ঢলে পড়ল, এই কি মানুষ-জীবনের আদি আর অন্ত! ওরা না হয় জহরলাল নয়, এট্‌লি নয়, ট্রুম্যান নয়,—কিন্তু ওরাও তো মানুষ। তাই মানুষের ইতিহাস লিখতে বসেছি। কিন্তু এ ইতিহাস নৃতত্ত্বের থিসিস নয়। মানুষের প্রতিদিনকার সুখ-দুঃখের ইতিহাস, যেমনটা দেখেছি দেশ-দেশান্তরে, যেমনটা পেয়েছি প্রাণের সবটা অনুভূতি দিয়ে—এ সেই ইতিহাস। এ ইতিহাসে আমারও স্থান রয়েছে, রয়েছে গাঁয়ের করিম মিঞারও স্থান। এতে মিথ্যা আভিজাত্য নেই, নেই আলিবাবা আর মর্জিনার রূপকথা, নেই অসত্যের পাঁচালি।

প্রয়োজনবোধে নামগুলো বদলে দিয়েছি কোথাও কোথাও। কিন্তু সেটুকু করেছি তাদের ঘৃণিত জীবন তোমায় লিখলে, তুমি হয়তো কাউকে বলবে; তাতে আর কিছু না হোক, ব্যক্তিবিশেষের ওপর সবার একটা ঘৃণা জন্মাবে। সেটা আমি চাই না। যে যার পথে চলেছে, তাকে বাধা দিও না, তাকে চাবুক দিয়ে সোজা করতে চেয়ো না, আমি অথবা তুমি দুজনে সে কাজ করতে পারব না। সমষ্টিগত সামাজিক পরিবর্তনের ওপর ওদের সংশোধনের ভার দিয়ে, সমাজকে সজাগ করাই আমাদের কাজ। যেটা ব্যক্তিগত অন্যায় বলে মনে হচ্ছে, সেটাকে বিরাট রূপে না দেখে, সমষ্টিগত সমস্যায় পরিণত করে খুঁজতে হবে সমাধানের পথ।

তাই পুলিসী ব্যবস্থায় লাহোর ছাড়তে বাধ্য হলুম, কিন্তু পিছনে রয়ে গেল আমাদের জীবনের একটা করুণ ইতিহাস। সেই ইতিহাস থেকেই আমার যাত্রাপথ শুরু। আর তারই ভিত্তিতে আমার এই পত্রাবলী।

তোমরা সবাই চেয়েছিলে প্রতিযোগিতামূলক একটা পরীক্ষা দিয়ে আমি একটা কেই-কেটা হই। ইচ্ছাটা স্বাভাবিক, যদো-মধো সবাই সরকারী চাকরি পেয়ে বিরাটত্ব লাভ করেছে, আমায় কেন গোলামের খাতায় নাম না লিখিয়ে তোমরা ছাড়বে? তোমাদের যুক্তিও অগ্রহণীয় নয়। তোমরা বললে, কংগ্রেস যদি মন্ত্রিত্ব স্বীকার করতে পারে, তা হলে তোমার পক্ষে চাকরি নেওয়া কিসের অপরাধ? মন্ত্রিত্বও তো ইংরেজের চাকরি! পঁয়ত্রিশ সালের ভারত-আইন পড়ে তোমরা যে বল নি, তা জানি, কিন্তু তোমরা সত্য কথা বলেছিলে। তোমাদের এই লজিকটা যদি স্বীকার না করতুম, তা হলে গারো পাহাড়ের কোলে বসে, দুবিঘে জমি চষে, পাঠশালা করে একটা আশ্রম-জীবন চালাতে পারতুম। তাতে লাভের আশায় কলুর বলদের মত ঘুরতেও হত না, অথচ আমার ছোট্ট কুটীরখানির মহিমায় নিজেকে মহিমান্বিত করতে পারতুম।

যাবার আগেই বলেছিলুম, যদি পাসও করি, চাকরি আমার সইবে না। ঠাট্টা মনে করে তোমরা আমায় ব্যঙ্গ করেছ। কিন্তু নিরাশ্রয় করে যখন দেড় বছরের শিশুটির সঙ্গে অজ্ঞাত ভবিষ্যতের বুকে তোমায় রেখে যেতে বাধ্য হলুম, তখনকার তোমার মনের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখ দেখি! কাশ্মীরের আলোবাতাসে মন ভরিয়ে তুমিও রওনা হয়েছ, আর এদিকে দিল্লী থেকে খবর এসেছে আমায় বিদায় দেবার। আনন্দ ও নিরানন্দের অদৃষ্টপূর্ব চিত্র দুটি বাস্তবে এসে দাঁড়াল মনুষ্যধর্মকে ব্যঙ্গ করে। তুমি চমকে উঠলে, আমি নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম, এইতো ছিল প্রাপ্য, শুধু ত্বরান্বিত হয়েছে। হৃদয়হীন মনোধর্মঘাতী এ যজ্ঞ শেষ হতে বিলম্ব আর নেই। তবুও বাস্তব সত্য সেদিন তত চরম হয় নি, যতটা আঘাত হেনেছিল দুদিন পরে।

ভেতরে তুমি ঘর ভাঙার রূঢ়তায় আত্মপরীক্ষার সম্মুখীন, আর বাইরে পীর মহম্মদ আমায় পঞ্চনদের দেশ থেকে বাইরে নিয়ে যাবার পরোয়ানা নিয়ে বসে, আর আমি কদিন আগে কাবলী হাওয়ায় তাজা হয়ে এসেছি, তাই আঘাত সইবার সামর্থ্য ছিল বেশী। আমি তো প্রস্তুতই ছিলাম, কিন্তু তুমি ভেবেছিলে, সুখের ঘর বাঁধবে। তা আর হল না।

প্রিয়জনকে ছাড়তে বড়ই দুঃখ, খুবই মর্মান্তিক, অথচ নিরুপায়। স্ত্রী তুমি, রুদ্ধ আবেগে সন্তানকে বুকে চেপে স্বামীকে বিদায় দিতে বাধ্য হলে। সেদিন দুজন দুজনকে অনুভব করেছি। কাউকে জানাবার ভাষা সেদিন ছিল না।

বাইরে কজন পুলিস দেখে, পাশের পঞ্জাবীরা উঁকি দিয়ে ফিরে গেল, কেউ

সাহস করে একবার জিজ্ঞেসও করল না, কি হয়েছে। খুনী আসামীকেও বোধহয় এমন নির্লজ্জ ভাবে নজরবন্দী করবার নজীর পৃথিবীতে নেই।

তোমার চোখে জল নেই, আমার শুকনো চোখে শুধু চিন্তার ছায়া। পুলিস অথবা জেলকে ভয় নেই, কিন্তু তুমি সেখানে নতুন, তায় ছেলেমানুষ, কোলে তোমার অসহায় শিশু। লাঞ্ছিত নারীত্বের প্রতিমূর্তি! তবু আমায় যেতে হবে। দেশকে ভালবাসার পুরস্কার আমায় নিতেই হবে।

তাই ঘরের বন্ধন আমায় আটকে রাখতে পারল না। ইংরেজের কঠিন আইন সপারিষদ গভর্নরের আদেশ শুনিয়েই ক্ষান্ত হল না, সেই আদেশ কার্যকরী করতে ছফুট মাপের দুজন কনেস্টবল আর দারোগা পাহারা বসাল দরজায়।

একবার মনে হয়েছিল, ডাক্তার আলেকজাণ্ডার ম্যানেটের মত একখানা স্মরণীয় পত্র লিখে ঘরের দেওয়ালে গেঁথে রেখে যাই। রেখে যাই বুকের রক্ত দিয়ে এক লিপি, যে লিপিতে থাকবে বাল্মীকির মত উদাত্ত বাণী—'মা নিষাদ'। কিন্তু অন্ধকার ভবিষ্যতের চিন্তায় এত ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলুম, যেন মোগলপুরার গোটা বাড়িটা আমার চোখের সামনে স্তিমিত হয়ে গেছে। আমি সেই স্তিমিত গৃহের ছোয়ায় প্রেতাত্মার মত খুঁজছি এমন একটা পথ, যাতে তোমায় নিরাপদ ব্যবস্থায় রাখতে পারি।

কিন্তু টিক্ টিক্ করতে করতে আটচল্লিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। কিছুই করে উঠতে পারলুম না। কদিন আগে আনারকলি বাজারে কল্পনায় দেখতে চেয়েছি, সেলিম-দয়িতা আনারকলির করুণ মুখচ্ছবি। দেখতে চেয়েছি, জীবন্ত নারীর রূপ-যৌবন কোন্ পাথরের তলায় চাপা পড়ে রয়েছে! আর, আজকে আমার আনারকলির নিষ্পাপ ব্যথাতুর মুখের দিকে চেয়ে, মোগলপুরার ছোট্ট বাড়িখানায় যেন তার কবর রচনা করে গেলুম।

সেই করুণ ইতিহাস নিয়েই আমার যাত্রা শুরু। তারপর দেশে-বিদেশে কত করুণ মুখ দেখেছি, কত স্বামী-হারার বিলাপ শুনেছি, কত অত্যাচারের বীভৎস রূপ দেখেছি, তার ইয়ত্তা নেই। শত শত আনারকলির জীবন নিয়েই চলেছে জুয়াখেলা। কত নারীর বুকভাঙা ক্রন্দন দিয়ে তৈরী হয়েছে মানুষের প্রতিদিনকার ইতিহাস, কে তার হিসেব রেখেছে।

গাড়ি চলল ভাতিন্দার পথে, চলন্ত গাড়ি থেকে মেয়েটাকে তোমার কোলে তুলে দিয়ে কাঠের বেঞ্চে বসে ভাবতে ভাবতে চলেছি, কি নির্মম এই সাম্রাজ্যবাদ। হিংস্র সাম্রাজ্যবাদীর যূপকাষ্ঠে মুক্তিকামীর আশা-আকাঙ্ক্ষা অসার হয়ে যায়, সাম্রাজ্যবাদীর রক্তচক্ষু রক্তাক্ত করে তোলে চলবার পথ। আর্তের আর্তনাদে

বিষাক্ত হয়ে ওঠে আকাশবাতাস। তবুও সাম্রাজ্যবাদীর লোভের আর অত্যাচারের শেষ নাই। নির্মম সাম্রাজ্যবাদী পিতার কোল থেকে সন্তান ছিনিয়ে নেয়, স্ত্রীর প্রীতির বুকে মুগুর মেরে স্বামীকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়!

স্টেশনে দাঁড়িয়ে তোমায় বললুম, ইংরেজ তার মরণ কামড় দিয়েছে, এই কামড় আমাদের সহ্য করতেই হবে। তা নইলে আমাদের স্বপ্নের স্বাধীনতা আসতে পারে না। আমাদের দুঃখের শেষ হবেই হবে একদিন। একদিন নিশ্চিন্তে আমরা বসে দুমুঠো ভাত পাব—সেইদিন কোন নিয়তিই আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।

কিন্তু তা হয় নি। আজও আমরা ঘর বাঁধতে পারি নি। পারি নি একটা সুস্থ আবেশ সৃষ্টি করতে। আমাদের সেই করুণ ইতিহাসের যবনিকা আজও আসে নি। হয়তো এ জীবনে আসবে না। হয়তো আমরা পাব না স্বপ্নের সেই স্বাধীনতা।

নিপীড়িত লাঞ্ছিত মানুষের মুখে আজো হাসি ফোটে নি। হয়তো মানুষ দীর্ঘশ্বাস ফেলে অভিশাপ দেবে। বাঁচার মর্মান্তিক লজ্জা থেকে তারা নিষ্কৃতি পাবে।

আজ হোটেলে বসে ভাবছি সেই সব কথা। ভাবছি তোমার হিমালয়ের মত ধৈর্যের কথা। বছরের পর বছর কেটে গেছে, তুমি স্বামীর স্মৃতিকে পরিচর্যা করেছ। জীবনের শুভক্ষণগুলো তোমায় উপবাসে আর অভাবের তাড়নায় কাটাতে হয়েছে। অজ্ঞাত রয়ে গেছে জীবনের মুকুলিত বসন্ত! কেঁদে বেড়িয়েছে ফাগুনী হাওয়া!

এই করুণ ইতিহাস আমায় আজও ব্যঙ্গ করছে। আমি দেখতে চেয়েছি পথের আলো। আমি নই, তুমি নও, সহস্র সহস্র আমি-তুমি সেই আলোর সন্ধানে ঘুরছি—কোথায় পথ ?

তাই লিখতে বসেছি তাদের কথা, যারা আমাদের প্রতিবেসী, যাদের সঙ্গে আমাদের নাড়ীর টান হাজারো বছরের। যারা আমাদের অতি আপন জন।

পশ্চিমে ইরান, উত্তরে আফগানিস্তান, নেপাল, ভুটান, উত্তর-পূর্বে চীন ; পূর্বে বর্মা আর শ্যাম, পূর্ব-দক্ষিণে মালয় আর সিঙ্গাপুর, এগুলো নিয়ে তৈরী এশিয়ার যে বিরাট অংশ, সেই এশিয়ার কাহিনী বলব তোমায়। হয়তো আমাদের চেয়েও যারা দুঃস্থ, তাদের কথা শুনলে আমাদের ক্ষতে প্রলেপ দেওয়া হবে। এই বিশাল দেশের কোথাও যদি আলোর সন্ধান থাকে, তাও তোমায় জানাব। সেই জানার আলোয় বিচার করবে—আমরা কোথায়, আর কি চাই। তা হলেই উত্তর মিলবে, বিশ্বজোড়া বিরাট জিজ্ঞাসার।

আমার লাহোর ত্যাগের দিন থেকে আজ অবধি সূত্রহীন ঘটনাকে বিনি-সুতোর মালার মত গেঁথে চলবে। কোথাও যদি খুলে যায়, তাকে জোড়া দিয়ে নিয়ো।

এক-একটা ঘটনাকে আমাদের জীবনের এক-একটা অংশ বলে গণ্য করে তারই পরিপ্রেক্ষিতে আরও সতেজ করে তোল তোমার দেহ-মনকে, আরও বেশী করে সংগ্রহ কর কর্মের উন্মাদনা।

সর্বত্র একই রূপ দেখেছি, সর্বত্র দেখেছি মনুষ্যরূপী কঙ্কালের বাঁচার অক্লান্ত চেষ্টা। কোথাও সে চেষ্টা রূপ পেয়েছে, কোথাও পায় নি। কোথাও দেখেছি আনন্দ-উচ্ছল জনতার স্রোত, কোথাও দেখেছি বাঁচার নেশায় মরণের পথে চলেছে তারা। প্রকৃতি তার চরম প্রতিশোধ নিয়ে মানুষকে শেখাচ্ছে একজনের প্রতি অপরজনের প্রীতির সম্বন্ধ গড়তে। কেউ তা শুনছে, কেউ শুনেও শুনছে না, কেউ শুধু নিজেরটুকু নিয়ে ব্যস্ত।

এই হল আমার পত্রের সূচনা। এখান থেকেই উদ্ঘাটিত হবে রক্ত দিয়ে লেখা উপেক্ষিত ইতিহাসের কাহিনী—যে কাহিনীকে সবাই চায় উপেক্ষা করতে, অথচ যে কাহিনীর শিক্ষা পরোক্ষে সবাই গ্রহণ করছে।

তাই জিজ্ঞাসা জিজ্ঞাসাই থেকে যাচ্ছে, কোথাও সমাধান নেই।
সত্যই কি অশান্ত পৃথিবীর বুকে সমাধান নেই?

আছে। আমরা হামেশাই দেখছি সে সমাধানের পথ। কিন্তু উপেক্ষা করেছি, অন্যকে বঞ্চনা করতে।

তাই বঞ্চিতের ইতিহাসই মানুষের ইতিহাস। এখানে জাতি নেই, ধর্ম নেই, কালা নেই, ধলা নেই—রয়েছে মানুষ আর তার বুকভাঙা ক্রন্দন। আর রয়েছে বঞ্চনার বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষোভ আর বিদ্রোহ।

তালাত-নৈ

ব্যাঙ্কক-৩।৪।৫১

এক

ট্রেন এসে দাঁড়ালো ইরানের সীমানায়।

মরুভূমি আর রুক্ষ পাহাড়গুলো কদিন ধরে অসোয়াস্তিকর অবস্থায় আটকে রেখেছিল। আজকে সবুজ ঘাস-পাতা দেখে মনে কিছুটা শান্তি এল। কলকাতা থেকে সোজা এক গাড়িতেই এতটা পথ আসা যায়। কিন্তু সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা কায়েম রাখতে শাসকশ্রেণী তা করেন নি,—যাত্রাভঙ্গ অনিবার্য আর বহুবার। রাস্তাটাও তোমার আমার জন্য নয়, অভিভাবকবিহীন নাবালক মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষুদে রাজ্যগুলো আর ভারতীয় পৈতৃক জমিদারী রক্ষা করতে ক্লাইভের বংশধররা তৈরি করেছিলেন। লাভের চেয়ে লোকসান বেশী। তাতে এসে যায় না,—টাকা তো গৌরী সেনের।

অসামরিক যাত্রীসংখ্যা আঙুলে গোনা যায়, তাও বোধহয় সামরিকের বেনামীতে চলাচল করে লুকিয়ে। যুদ্ধের বাজার, কড়া পাহারা রয়েছে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে—তবুও পালিয়ে যায় অনেকেই।

বাইশগজী ময়লা পাগড়ি, ঢোলা জামা-সালোয়ার আর বিচিত্র কোর্তা—পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধের সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেয় বেলুচ সহযাত্রীদের উপস্থিতি। আমাদের দেশের চলমান 'আফগান ব্যাঙ্কে'র সঙ্গে বদল দেওয়া যায়। এসব সহযাত্রীদের অধিকাংশই লড়াইয়ের ময়দান থেকে দেশে ফিরছে ছুটিতে।

মস্ত বড় বেলুচ দেশ—আর ছোট্ট তার জনসংখ্যা—তারই আবার চার-পাঁচটা ভাগ। লক্ষণীয় সেখানকার শাসনব্যবস্থা। বন্দুকের কুঁদো দিয়ে যেমন কালাতের আমীরও শাসন করেন, তেমনি করেন ইংরেজ পুঙ্গবরা। বেলুচরাও তাই গোঁ ধরে ছোটে ঢাল-তলোয়ার উঁচিয়ে। তখন নরহত্যা আর পশুহত্যায় পার্থক্য থাকে খুবই কম। কিন্তু দারিদ্র্য আর জঙ্গী শাসন এদের চিত করে দেয় নিমেষেই। অশিক্ষা কুশিক্ষা, আর গোঁড়ামি এদের শত্রু।

যে পথে গাড়ি এল, সেই পথেই তিন-চারশো বছর আগে হুমায়ুন বাদশাহ্ পালিয়েছিলেন আশ্রয় সন্ধানে, দুহাজার বছরেরও আগে এসেছিল দক্ষিণী দ্রাবিড় জাতি। সেদিনও হয়তো এই পথে আর আশেপাশে ব্রাহুই আর মিশ্রিত উপজাতিরা ভেড়া-ছাগল চরিয়ে বেড়াত, সেদিনও হয়তো তারা আঙুরের ঝোপে বসে একতারা বাজিয়ে অদৃশ্য রূপসীর রূপকাহিনী গাইত,—আজও তেমনি আছে!

সেদিন ছিল পায়ে-চলা বন্ধুর পথ, আজ সেই পথের বুকে শুয়ে আছে লোহার পাত। সভ্যতার শেকলে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা।

সিন্ধুর বারিবিন্দু কঙ্কালের ওপর চর্ম আচ্ছাদনের মত। একে পেরিয়ে এলেই ধীরে ধীরে হৃদয়ঙ্গম করা যায় ভারতীয় ভাবধারা, সংস্কৃতি, সভ্যতা থেকে' ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি।

ইরানী সভ্যতার প্রবেশপথ এই বেলুচ দেশ।

ভারত আর ইরানের মাঝামাঝি স্থান দখলে রাখার প্রয়োজন, কোন বৃহৎ আদর্শের খাতিরে নয়, সাম্রাজ্য রক্ষার অজুহাতে। কাল্পনিক ভীতির জন্য ইংরেজ বন্দুক-কামান সব সময় উঁচিয়ে থাকতে অভ্যস্ত। এ যেন বাঘকে খাঁচায় পোরা হয়েছে—পোষ মানানো যায় নি। কোটী কোটী টাকা ব্যয়ে ইংরেজ গড়েছে নগর, ফৌজী ছাউনী, কেল্লা,—দর্শকের আনন্দবর্ধনের জন্য নয়, নিশ্চিন্তে দিবানিদ্রার অজুহাতে।

গরমের রাজা জ্যাকোবাবাদ।

গাড়িও জ্যাকোবাবাদ ছাড়ে—ব্যারোমিটারের পারদও ওপরে ওঠে।

গতির বাতাসের যে ঝাপ্‌টা, তাকেও ঝলসে দিচ্ছিল মরুভূমির আগুনে হাওয়ার হল্‌কা। আমাদের গাড়ির শার্সিগুলো বন্ধ করে দেওয়া হল। যারা এ পথে চলাচল করে তারাই অগ্রণী হয়ে জানালাগুলো বন্ধ করে দেয়।

ধু-ধু করছে মরুভূমি। না-আছে লোকালয়, না-আছে লোক। অন্তত খানিকটা নিষ্কৃতি পেলাম বালির ঝড় ছিল না বলে। বাহওয়ালপুরের মরুভূমির শুক্‌নো বালি Sand Cutter-এর ধাক্কায় চারিদিক অন্ধকার করেছিল। বেলুচি মরুতে বালি কম, আছে শুক্‌নো মাটি—দিগন্ত প্রসারিত। হয়তো আর্য সভ্যতার প্রথম যুগে এখানেই ছিল বসতি, কালের গতিতে নদী হয়তো সরে গেছে, অথবা মজে গেছে, তাই উঠে গেছে আবাদী। মরুর হাওয়ায় আগুন আছে, বিভ্রান্তি আছে, আরও কত কি আছে, কে বলতে পারে! শার্সির ভেতর দিয়ে দৃষ্টির শেষ সীমায় অপলকে চেয়ে ছিলুম,—একজন মানুষ, একটা উট, একটা ওয়েসিস্, একটা গাছ। নাঃ!—কিচ্ছু নেই।

চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল পর যখন গাড়ি দাঁড়ায়, তখন নবজীবন ফিরে পাই।

লাহোর থেকে সাথী আদালত খাঁ। মুলতানের খাস মোগলাই খুন তার শিরা-

উপশিরায়। বাপ-দাদা তার খুপসুরত ঔরতের নেকনজরে পড়ে জায়গীর-টায়গীর সব খুইয়েছে। নেহাত রুটির অভাব, তাই সে টাঙ্গা চালাত লাহোরে। কলকত্তা যাবার দিল্ ছিল, রেস্ত ছিল না। জঙ্গী জাত। লড়াইয়ের বাজনা বাজতেই চাবুক ছেড়ে বন্দুক ধরেছে। মোগলাই জোস্ তার খুনের এক-একটি বুঁদে, সে কি খামোশ্ থাকতে পারে? দুশমনের মহড়া নিতেই তো তারা পয়দা হয়েছে। এটা তার নোকরি নয়,—কৌমের খেদমত। তারা যদি লড়াইয়ে না যায়, খোদার বদদোয়া না পড়েই পারে না। রংরুটের আড়কাঠী তাদের এইসব ইলেম দিয়েই পাঠিয়েছে। তার কোম্পানী আছে চমনে, সেখানেই সে যাচ্ছে।

আধা উর্দু আর আধা গুরমুখীতে লাহোর থেকে এই সব কথা আমায় তালিম দিতে দিতে আসছিল। দু-একবার আমার পরিচয় জানতেও সে চেয়েছিল। শোনার চেয়ে বলার দিকে তার ঝোঁক বেশী—তাই রেহাই পেলুম।

সব বলাই যখন শেষ, তখন সে তার বদ্-নসীবের কথা বললে, হাত নিশপিশ করলেও লড়াইয়ের ময়দানে আজতক তার যাওয়া ঘটে নি।

গাড়ি এসে দাঁড়াল একটা স্টেশনে—বেলপাত।

গাড়ি থেকে হুড়হুড় করে নামতে থাকে যাত্রীরা, Watering স্টেশন। ইঞ্জিনের নয়, যাত্রীদের। গলাটা যেভাবে শুকিয়েছিল, তাতে অবিলম্বে ওয়াটারিং প্রয়োজন। আমি বের হলুম খাঁচা থেকে। এখানেও জলের জাত আছে। পেছনে গাঁথা জলের ট্যাঙ্ক থেকে আলাদা উর্দীপরা দু জাতের জল এল।

পানীয় শীতল না হলেও বুকের ভেতরটা ভিজল।

এবার নেমে আসে সন্ধ্যা। সমুদ্রের সূর্যাস্ত অবর্ণনীয়, মরুর সূর্যাস্তও কম নয়।

রাতের অন্ধকার নেমে আসে। নক্ষত্রের সামান্য আলোতে মরুর বুক চকচক করছে। এই টিমটিমে আলোতে বহু দূরের ছোট বালির স্তূপগুলো জোনাকির মত দেখাচ্ছিল। শুক্‌নো হাওয়া ছুটে আসছিল রূপকথার রাক্ষসীর মত, একটা ঝাপটার ওপর আর একটা ঝাঁপিয়ে পড়ে নিস্তব্ধ মরুতে পাগলিনীর মত অট্টহাস্যে। শার্সিগুলো নামিয়ে দেওয়াতে শুক্‌নো হাওয়া বুককাঁপানো অট্টহাসিতে জানালা-গুলোর আশেপাশে আছড়ে পড়ছিল। নিস্তব্ধ রাতে এই বিরাট মরুর বুকে ট্রেনের ঝকঝকানির সঙ্গে যেন তাণ্ডব শুরু হয়েছে। সারাদিনের গরম হাওয়া অনেকটা গা-সওয়া গোছের হয়েছে রাতের আঁধারে। ক্রমে রাত বাড়তে থাকে, কমতে থাকে জলুনি—অনেকটা হিম হয়ে আসে হাসির তাড়না। গাড়ি চলছে তো চলছেই! কখন যে থামবে, কে বলতে পারে?

—ড্রাইভার ঘুমিয়ে পড়ে নি তো!

ছোট একটা স্টেশন পেরিয়ে গেল। দূরে, বহু দূরে সবুজ একটা আলোর রেখা দেখা যায়—অনেক উঁচুতে, Light House-এর মত। কোন লুপ নেই, বাঁক নেই, সোজা পথ। গাড়ি উঠতে থাকে পাহাড়ে।

অবশেষে থামল এসে একটা বড় স্টেশনে—শিবি।

আদালত খাঁ জিজ্ঞেস করলে, হুকুমনামা আছে তো?

হুকুমনামা!—নেই তো!

তার মোগল'ই প্রাণটা সদয় হল, হাজার হোক বাদশা'হী নজর। তাড়াতাড়ি তার একটা উর্দি পরতে দিয়ে বললে - শীগ্‌গীর, পুলিস আসবার আগেই!

যো হুকুম! হুকুমনামা যখন নেই, তখন তার হুকুম মেনেই পুলিসবৈতরণী পার হতে হবে বইকি!

ফৌজি উর্দি দেখে পুলিস কোন প্রশ্ন না করেই নেমে যায়।

আদালত খাঁ স্বয়ং ফেরেস্তারূপে আমার পাশে বসে, আমার আবার শঙ্কা কি!

লাহোরের প্রভুরা যখন অর্ধচন্দ্র দান করলেন, তখন শুক্‌নো মাঠে তো আমায় ত্যাগ করতে পারেন না! পেছনে যখন ছাপ আছে, তার ওপর যখন বংগালী, তখন না-হোক্ দু-পাঁচটা বোমা তৈরি করতে কতক্ষণ! পীর মহম্মদকে আমার অভিভাবক ঠিক করলেন। নিমকহালাল তুর্কীনন্দন অবিচার করে নি। শ্যামল ক্ষেত্র অন্বেষণ করতে করতে সিন্ধু সরকারকে আমার উপস্থিতির এত্তেলা দিয়ে গেল, হাওলা করতে পারল না। সরকারী হুকুম নেই। রোরির প্রভুরা রোরিং করলেন, দন্ত দেখালেন। অক্ষমতার অনুশোচনায় নতুন করে হুকুম আনতে করাচী গেলেন। ততক্ষণ আমি নিরাপদ, সিন্ধু ছেড়ে বেলুচে এসে গেছি। আদালতের কৃপায় নিষ্কণ্টকও বলতে পারি।

শিবির নন্দীভৃঙ্গীরা বিদায় নিলেও স্পেজান্দে এসে আবার নতুন করে তল্লাশি শুরু হল। এবারকার ব্যবস্থা একটু কঠিন। লম্বা-চওড়া বেলুচ পুলিস, ককেসীয় আকৃতি, প্রকৃতি অত্যধিক উগ্র। কথায় তাদের তাপ বেশী—হেডঅফিস শূন্য। ভোরের কনকনে বাতাসে তাদের ব্যবহার উপভোগ্য মোটেই হয় নি, বরং মনটা দমিয়ে দিল। আদালত খাঁ এবারও ফেরেস্তার চরিত্র অভিনয় করল।

কোয়েটার কাছে আসতেই সে আমায় 'ফল্ ইন্' হবার তালিম দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে সিগারেটে আগুন ধরাল।

জানি না কি কারণে আদালত খাঁ আমায় হুকুমী-আদালত থেকে বাঁচাচ্ছিল।

মনোবিজ্ঞানীরা হয়তো বলতে পারবেন। আমি বুঝলুম, সুপ্ত মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক বিকাশ। নরঘাতকও শিশুকে বুকে নিয়ে হাউ-হাউ করে কাঁদে, মানব-চরিত্রের এই Complexity বিশ্বজনীন।

পুরো দুটো দিন বাদে মাটির বুকে পা ফেললুম। পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বহু সমস্যা এক সঙ্গে জমির ওপর থেকে যেন শূন্যগামী করে তুলল—অনেকটা ত্রিশঙ্কুর মত অবস্থা!

ইরানের গাড়ি ছাড়বে পাঁচদিন পর। প্রবেশ-অনুজ্ঞা ব্যতীত স্থান সংগ্রহ অসম্ভব। পকেটের অবস্থাও ক্ষীণ, অবিলম্বে প্রয়োজন আশ্রয় আর আহার্য। স্টেশনে বসে থাকলে কোন সমস্যা সমাধানের পথ হবে না। আদালত খাঁর আশ্রয় নিলুম। সে ছিল মুসাফিরখানায়—চমনের গাড়ির প্রতীক্ষায়।

টাঙ্গাওয়ালাকে ডেকে সাধ্যমত উপদেশ দিয়ে আমায় হোটেলে যাবার পরামর্শ দিল। এইখানেই আদালত পর্ব শেষ। আজ সে কোথায়, কোন আদালতে বিচারপ্রার্থী, তা জানি না, কিন্তু তার সহায়তা আজও স্মরণ করি গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে।

টাঙ্গা কিছুটা পথ এসে গলির মধ্যে প্রবেশ করল। গলির মুখটায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে প্রসারিত করে সে জানাল তার দুর্বোধ্য ভাষায় অনেক কিছু। বহু কষ্টে বুঝলুম, এখানকার যে-কোন হোটেলে নিরাপদে বাস করতে পারি।

আদালত তাকে কোন প্রকারে জানিয়েছিল, আমি বিদেশী, আর নতুন এসেছি এদেশে। এইটুকুর সুযোগ সে গ্রহণ করেছিল মাত্র। আগে কি জানতুম ছাই। জানা সম্ভবও নয়। অনেক সময় আবার অমঙ্গলের ভিতর দিয়াই মঙ্গলের সূচনা। নামবার আগে ভাল করে দেখলুম, দেখে—বিপদের আভাস যে স্পষ্ট, তাও বুঝলুম। চিক্ টাঙানো রয়েছে ঘরে ঘরে—কোথাও তারই পেছনে বসে ছ'ফুট উঁচু মেয়ে আড়াই ফুট উঁচু ফুরসীতে প্রাতঃকালীন তাম্রকূট সেবন করছে। চোখে সুরমা, গালে রং, কারুর চোখে ঘুম। কেউ-বা সবে উঠে বদনার পানিতে মুখ প্রক্ষালন করছে। দেশকালপাত্র ভেদে Danger Signal বুঝতে হয়। আমি সংবিত ফিরে পেয়েই বহু কষ্টে টাঙ্গাওয়ালাকে বোঝালুম, হোটেল জিনিস কি এবং কেমন।

অবশ্য গাত্রভঙ্গী আর দু-একটা উর্দু জবান সম্বল। আমি যে বাঙালী একথা বোঝাতে চাইলুম বার বার। সে কি বুঝল জানি না, অশ্বতরকে এগিয়ে নিয়ে চলল। একবার মনে হল, স্টেশনে ফিরে যাই। আদালত হয়তো ত্রাণ করতে

পারবে। আবার নিজেকে অতটা অসহায় ভাবতেও কষ্ট হচ্ছিল। 'দেখি কি হয়', ভাব নিয়ে বসে রইলুম।

ইতিমধ্যে টাঙ্গাওয়ালা ভাড়াটা নেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তার কণ্ঠস্বরে নিজেকে বড়ই অপমানিত মনে করছিলুম। ভাড়াটা অগ্রিম পাবার সঙ্গে সঙ্গে একটা পাকা বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে সে জানাল, ইয়ে বংগালীন্। আমাকে নামিয়ে দেওয়াই তার উদ্দেশ্য, নেমেও পড়লুম।

আমার দুর্দশা দেখবার অপেক্ষা না করেই তৎক্ষণাৎ অশ্বতরটিকে জোরে চাবুক মেরে সে সরে পড়ল।

স্থানটি জনমানবশূন্য। বাড়িটার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে চিন্তা করলুম, কি করা যায়। অবশেষে কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে বামা কণ্ঠে উত্তর এলো, নেহি হোগা।

বংগালীন্ বলায় একটু সাহস সংগ্রহ করে, চাল-চানাভাজা না চিবিয়ে সহজ বাংলায় বললুম, আমি বিদেশী, একটু শুনবেন কি ?

মিনিট পাঁচ-সাত দাঁড়িয়ে রইলুম।

পাশের জানালা খুলে উত্তরদায়িনী দেখা দিলেন। কেন ? কি দরকার ? —তাঁর চোখে-মুখে প্রশ্ন। বিরক্তির ভাবও কম নয় !

সংক্ষেপে বললুম নিজের দুরবস্থা আর দুর্ভাগ্যের কথা।

যেন দয়া উপজিল ! দয়া করেই তিনি বাতলিয়ে দিলেন—স্টেশনের রাস্তায় খোট্টাদের ধর্মশালা রয়েছে, সেখানে যান। এদেশে কেলোর হোটেল নেই—সাহেবদের হোটেলে স্থান হবে না।

আমি সবিনয়ে নমস্কার জানিয়ে ফিরলুম। জানালাবাসিনীও নেপথ্যে অন্তর্হিত হল। ভাবছিলুম টাঙ্গা ডাকবার কথা। সামান্য পূর্বের অভিজ্ঞতা তাতেও বাদ সাধল।

দু-চার পা এগোতেই ডাক এল, শুনুন।

আমার জিজ্ঞাসার অবসর না দিয়েই সে বললে, আপনি এখানে এলেন কি করে ?

প্রশ্নটা গুরুতর। বললুম, সে কথায় আপনার কি প্রয়োজন ?—জবাবটা রূঢ় এবং সঙ্গত।

আমার বিরক্তি লক্ষ্য করেই সে জোর দিয়েই বললে, প্রয়োজন আছে। বিনা পাসে এদেশে আসা অসম্ভব। লুকিয়ে যদি এসে থাকেন বিপদ অনিবার্য। ভেতরে আসুন।

এ-কামরা সে-কামরা করে যে কামরায় আমায় এনে বসাল, সেটা পোশাক-ঘর। এক কোণায় খাট—পুরু গদি-মশারি-বালিশ দিয়ে সুশয্যা, অপর দিকটায় আলনা, টেবিল-চেয়ার দিয়ে সুসজ্জিত। সামান্য সাদর সম্ভাষণের পরই বেশ-ভূষার দিকে নজর দিয়ে আমায় জোর করে গোসলখানায় পাঠাল।

আহারাদির কোন ত্রুটি নেই, শয্যাও দুগ্ধফেননিভ। দিবানিদ্রায় নিজেকে ছেড়ে দিলুম। দু-আড়াই দিনের পথের ক্লান্তি অপনোদন ভালই হল। যখন ঘুম ভাঙল তখন বেলা গড়িয়ে গেছে। দরজার সামনে জল তোয়ালে রাখাই ছিল। হাতমুখ ধুয়ে চেয়ারে এসে বসলুম। সারাটি দিন কোথা দিয়ে কেটে গেছে, টেরও পাই নি। অথচ এ পর্যন্ত গৃহস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ না করাটা নিজের কাছে অমার্জনীয় অপরাধ বলে মনে হচ্ছিল। সকাল থেকে দাসী পরিবৃত প্রমীলার সঙ্গে আলোচনা করছি। একবার গৃহস্বামীর কথা জিজ্ঞাসার ইচ্ছেও হয়েছিল, তবু ভরসা করে প্রশ্ন করতে পারি নি।

যে পল্লীতে টাঙ্গাওয়ালা আমায় নামিয়ে দিয়েছিল, তার রূপ সাদা চোখেও দেখা যায়।

মনের এ উত্তেজনা এত সময় আটকে রেখেছি অতীতের অভিজ্ঞতার দরুন। কি দারুণ লজ্জা! বাঙালীর মেয়েকে এ দূর দেশে দেহপণ্যে আত্মনাশ—কল্পনাও করা যায় না।। অথচ পারিপার্শ্বিক অবস্থা হতাশাব্যঞ্জক। অবিশ্বাস করবার মতো পরিবেশ নয়, করতে পারলে খুশী হতুম।

সামান্য কথা বলতে অনেক কথা মনে আসে।

দশ বছর আগের কথা। চুপিসারে পালাচ্ছিলুম বীরভূমের কোন জায়গা থেকে। কেউ যাবে রেলপথে, কেউ যাবে হাঁটাপথে, কেউ যাবে মোটরে। সঙ্গী একজনকে স্টেশনে নিরাপদে উঠিয়ে দিয়ে, আমরা ঠিকা বন্দোবস্তী ঘোড়ার গাড়ির নিকট এসে দেখলুম, গাড়ি বেহাত হয়ে গেছে। একজন বর্ষীয়সী আর একজন যুবতী সোয়ারী গভীর রাতের অজুহাতে গাড়ি দখল করেছে। গাড়োয়ান ঠিকা বন্দোবস্ত করেছে, আমাদের বিনা অনুমতিতে যেতেও পারছে না।

আমরা আসতেই গাড়োয়ান বিনয় সহকারে জানাল, মেয়ে সোয়ারী নামিয়ে এসে আমাদের নিয়ে যাবে। দুরন্ত শীতের রাতে খোলা মাঠে এক ঘণ্টা অকারণে বসতে কেউ রাজী নই। উপরন্তু, পলায়ন ব্যাপারে সময় নষ্ট যুক্তিযুক্তও নয়। অন্য কোন গাড়িও নেই, অথচ রমণীযুগলকে বহিষ্কার করাও নীতিবিরুদ্ধ।

আমাদের অসহায় ভাব দেখে যুবতী যিনি তিনি বললেন, আপনাদের জরুরী থাকলে এক সঙ্গেই আসুন না কেন ?

অপরিচিতা যুবতীর নিমন্ত্রণে অ্যাডভেঞ্চার রয়েছে—নিমন্ত্রণ গ্রহণও অসম্ভব নয়। কিন্তু অভিভাবকহীন নারীর সহযাত্রী হওয়া সঙ্গত কি না, এ কথা ভাবছিল সঙ্গীরা। আমার অহেতুক কৌতূহল হল তাদের পরিচয় জানতে। যেতেই যদি হয়, জেনে শুনেই হাওয়া শ্রেয়ঃ। বললুম, আপনার পরিচয়টা কি জানতে পারি ?

—আমার পরিচয় ! গাড়ির স্তিমিত আলোকে স্পষ্ট দেখতে পেলুম তার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। মাথা বাইরে হেলিয়ে কথা বলছিল, কিন্তু আমার প্রশ্নে সেই-যে আত্মগোপন করল, আর শব্দটিও করল না।

পরিচয় জানতে চাওয়া ইংরেজী কায়দা নয়, অনেক সময়ই অভদ্রতা হয়ে দাঁড়ায়। তবু অতীতের এই স্মৃতিটুকু পরিচয় জানতে ব্যগ্র করে তুলেছিল। আশ্রয়দাত্রী ভাল কি মন্দ তার প্রয়োজন কম,—জেনে রাখা দরকার। 'আমার পরিচয়' বলে ইনিও কি আত্মগোপন করবেন ?

অবাধ্য মনের ওপর জুলুম না করে সান্ধ্য-চায়ের আসরে জিজ্ঞেস করলুম—আর সবাই ?

বিকারহীন ভাবে সে বললে, তার চিন্তা করতে হবে না।

জবাবটা মুখ মেপেই দিয়েছিল। প্রশ্ন করেই বেকুফ বনে গেলুম। নিজের সত্তাকে দম দিয়ে স্প্রিংয়ের মত ছিটকে বললুম, ওঁদের আসতে বিলম্ব আছে বুঝি ?

গম্ভীরভাবেই সে বললে, খেয়ে নিন, পরে বলছি।

পরে সে বলেছিল। না বললেও বুঝতে অসুবিধা মোটেই হয় নি। এক রাতের অভিজ্ঞতাই তাকে জানতে যথেষ্ট।

পরদিন সকালে উঠেই জানালুম, আমি অন্যত্র থাকতে চাই।

বিনা প্রতিবাদে সে রাজী হল। মনে করলুম, দুঃস্থ মক্কেলকে বিদায় না দিলে দায় হবে ভেবেই সে প্রতিবাদ করল না।

আমিও প্রস্তুত হলুম। সে পায়ের কাছে মাথা রেখে টিপ করে একটা প্রণাম করল। উঠেই সে বললে, বসুন। ঘৃণা নিয়ে যাচ্ছেন, যান ; যদিও মর্মান্তিক, তবুও পতিতার গৃহবাস আপনাকে অশান্ত করছে, সেটাও মর্মান্তিক। নয়তো বলতুম, ভালমন্দের হিসাব খতিয়ে দেখলে জাগতিক ধর্মে কাউকেই বিচার করা চলে না। অন্ধকার রাতের সর্পসংকুল পথের সর্বত্রই সর্পভয়—নয় কি ?

এমন স্বচ্ছ আর যুক্তিময় বাক্যরচনা পতিতার পক্ষে অসম্ভব—ভাবিয়ে তুলল।

আমি বিস্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলুম। গৃহত্যাগ উচিত, কিন্তু উচিত অনুচিতের বাইরে কিছু কি নেই!

সতেজ কণ্ঠে সে বলতে থাকে:

—আপনারই মত জন্মেছিলুম বামুনের ঘরে। দারিদ্র্য ছিল পৈতৃক। জ্ঞান হবার পর থেকেই অনুভব করেছি বাবা মার অসহায় অবস্থা। দারিদ্র্যের চরম লাঞ্ছনা ঘটে ধনপিপাসায়। নিবৃত্তির পথ নেই অথচ আকাঙ্ক্ষা কমে না। স্কুলের পড়া শেষ করলেও জীবনের পাঠ শুরু হয় নি তখনও। মা-বাবা তাঁদের অনিচ্ছাকৃত অক্ষমতার দরুন আমাকে কোন কাজেই বাধা দিতেন না। দারিদ্র্য গোপন করা যেন আমার সেদিনকার ধর্ম ছিল। অর্থ না থাকলেও অর্থের ভণ্ডামিগুলো ছিল। মন কাঁচা, কিন্তু দেহ কাঁচা রয় না, দেহে লালিত্য উঠল ফুটে। ঘর বাঁধবার নেশায় পেয়ে বসল। দেহই আমার মূলধন। স্তাবকও জুটল। ভুল হল পাত্রনির্বাচনে। অনভিজ্ঞতা দায়ী হলেও, ফল সইতে হল আমাকে। আমার মত মেয়েদেরই ধনের লিপ্সা বিপথে টেনে নিয়ে যায়। একটু সুখে থাকব, অভাব থাকবে না এক ছটাকও —এ মনোবৃত্তি ভুল করাল।

—যাকে আপনার ভাবা যায়, তার কাছে দেউলে হতে কতক্ষণ! ভণ্ডামিকে সত্য বলে মেনে নিলুম। সত্যের রূপ দেখতে পেতুম না, যদি না মাতৃত্ব এসে আঘাত করত। মনের আশমানী রং একদিনেই উবে গেল। বিবাহসংকট পার হতেই হবে। আমি তো আর গান্ধারী নই যে অনন্তকাল সন্তান আমার গর্ভেই রয়ে যাবে। যে এল, সে দেখবে জগতের আলো। মাতৃত্বের অনুভূতি তখন প্রতিটি লোমকূপে, সন্তানের সামাজিক স্বীকৃতি দেবার চেতনা তাই ব্যাকুল করে তুলল। প্রেমরাজ্যের দেউলিয়া তো কখনও অপরাধী হয় না। পরিসমাপ্তি চাইলুম অনিশ্চিতির। শেষ পর্যন্ত গেলুম তার কাছে, বললুম আমার অসহায় অবস্থা, আর প্রতিকারের উপায়। আমি যেন কত অপরিচিত। অপরিচিতা বলেই পরিচয় দিল তার সঙ্গীদের কাছে। সবাই বলল, ব্লাকমেলিং।

—কৌমার্যের ব্যভিচার যত না পীড়ন করছিল তার চেয়ে বেশি পীড়ন করছিল পিতৃ-পরিচয়হীন সন্তান। ভালবাসার বাঁধন বড়ই ঢিলে। সমাজ আর ধর্মের বাঁধন না থাকলে ভালবাসার মূল্য তাসের ঘরের চেয়েও ঠুন্‌কো। আঘাত পেলুম, কাঁদলুম। আত্মহত্যা করতে চাইলুম, সন্তানের মুখের দিকে চেয়ে তা পারলুম না। ওর কি অপরাধ! অবশেষে সে-ও যখন বিদায় নিল, তখন আমি একা। কিন্তু ঘর বাঁধবার নেশা যায় নি।

—কি বললেন, লেখাপড়া শিখে এ ভুল করা উচিত হয় নি? স্কুলের কথানা

কেতাব আর বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেটগুলো বুঝি ভুল না করবার প্রমাণপত্র? এ ভুল আমার মত হাজারো মেয়ে করছে—আর করবে। কামনার রূপ পশুত্বের বিকার। চোখের নেশা ভ্রান্তির বাইরে নয়। সেখানে বিচারবুদ্ধির কোন দাম নেই। বোধহয়, পৃথিবীর কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হলে, দক্ষিণাও দিতে হয় যথেষ্ট। ভুলের মাশুল যোগাতে হয় জীবন-ভোর।

উদাসভাবে খোলা জানালার ভেতর দিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল বাইরে। হঠাৎ ঘৃণামিশ্রিত কাঠিন্যে তার মুখখানা কুঞ্চিত হয়ে উঠল, সে দম নিয়ে বলতে লাগল:

—ঝড়ো হাওয়ায় শুক্‌নো কুটোর মত আবার ঘর বাঁধতে চাইলুম ফৌজী এক কাপ্তেনের সঙ্গে। সেও গেল পালিয়ে, আমি রয়ে গেলুম এ মরুর বুকে। মৃত্যুপথগামীরা সর্পকে রজ্জু ভ্রম করে লুটিয়ে পড়ছে পায়ের তলায়—তাদের সর্বস্ব দিয়ে। অর্থের নেশা আমার নেই, নেই কোথাও বাস্তব অভাব। অভাব শুধু এক জায়গায়—যার রূপ নেই, গন্ধ নেই, আছে দাহন। তার তীব্র দাহনে যেমন নিজেও জ্বলছি, তেমনি জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছি এ আহাম্মকদের মনে। নিজের বোঝা নিজেই বইছি, শোধ নিচ্ছি পুরুষ জাতটার ওপর।

একটা হিংস্র হাসিতে তার মুখখানা বিকৃত করে সে আমার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিপাত করে আবার বলতে থাকে, আমার রূপ আর দেহগরিমা অন্যের দয়া আকাঙ্ক্ষা করে না।

আমি বাধা দিয়ে বললুম, এসব শোনবার মত ইচ্ছে আর সময় দুটোরই অভাব। আমায় মাপ কর।

—মাপ করার প্রশ্ন নেই। যাকে ঘৃণা করে চলে যাচ্ছেন, যাবার আগে তার কথাটাও শুনে যান। অন্তত একটা রাত আমার গৃহে বাস করলেন, তাতে আপনার শুচিতা-অশুচিতা কি বৃদ্ধি পেল, সেটা জানতে চাইবেন না?

—প্রয়োজন হয় না।

—পুরুষরা এমনিধারাই। তাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে, অন্যের দিকে তাকাবারও অবসর পায় না। একদিন করুণা চেয়ে পেয়েছি লাঞ্ছনা, সে-ও দিয়েছে আপনার মত একজন, সে-ও তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়াতে চলে গেছে। যাওয়ার অন্তরায় আমি নই, কিন্তু লাঞ্ছনা সইতে পারি না। গুমোট ভেঙে হঠাৎ যেমন বোশেখী কালো মেঘ থেকে জলের ধারা নেমে আসে, তেমনি অশ্রুর ধারা নেমে এল তার কঠিন রঙীন গাল বেয়ে।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললুম, এবার আমায় যেতে হবে।

—যে যাবে, তাকে রুখবে কে? একটু সাবধানে থাকবেন।

আর অপেক্ষা করা দৃষ্টিকটু। পরিহার করবার ইচ্ছে আমার নিজস্ব। সে যখন আমায় স্বেচ্ছায় বিদায় দিল, তখন মনে মনে খুশী হলুম।

বুদ্ধির বিকার কোথায় কখন কাকে টেনে নিয়ে যায়, কে বলতে পারে? আমি সংযত ধীর পদক্ষেপে বাইরের দিকে এগোলুম।

নিঃসম্বল হওয়ার কত সুবিধে, ওঠা-চলা কারুর ওপরেই নির্ভর করে না। দেহমন একসঙ্গে চলে।

তার দৃষ্টিপথের বাইরে গিয়েছি মাত্র, এমন সময় তার দাসী এল—সংবাদ ডেকে পাঠিয়েছে। তার কাহিনী যেমন হেঁয়ালিভরা, ব্যবহারও তেমনি শৃঙ্খলাবিহীন। অনিচ্ছাটা জানাবার অবকাশ পেলুম না—সে নিজেই এসেছে, বক্তব্য—আমার বাইরে থাকা নিরাপদ নয়। বাঙালী হয়ে দেশের লোককে তো বিপদে ফেলতে পারে না।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে সর্বজনপরিচিতা অখ্যাত অথবা কুখ্যাত নারীর সঙ্গে বচসা করা যুক্তিযুক্ত নয়। একখানা কম্বল যার সম্বল, তার পক্ষে তাঁতের মাকুর মত ছিটকে চলায় অভিনবত্ব কিছুই নেই। ফিরতে হল—বিনা বাক্যব্যয়ে। কেটেও গেল কটা দিন। একঘেয়ে হলেও নিরাপদে আর নিশ্চিন্তে।

আজকে এ সব পুরাতন কাহিনী লিখতে বসে কত কথাই না মনে পড়ছে। টুকরো টুকরো ঘটনা, দেশ-দেশান্তরে ঘটেছিল। কোনটা দশ বছর, কোনটা বিশ বছর আগে বিচ্ছিন্ন ভাবে ঘটেছে—কোথাও কোথাও সামান্য মিলও আছে।

প্রভার কাহিনী শুনবার কান করণই ঘটে নি, সমাজের সঙ্গে বিশেষ কোন সম্বন্ধ রাখতে পারি নি কোন দিন। আমাদের ছোট সমাজে আমার উপস্থিতিটা শঙ্কাজনক, আবার অনেকের দিক থেকে ঘৃণ্য ও নিন্দনীয়। তবুও প্রভার কথা শুনে তরল কারুণ্যে মনটা ভরে উঠল। দেহের পরিমাপ মনের পরিমাপ নয়। মানসিক দুর্দৈবই মানুষের সবটা নয়, তার বাইরে রয়েছে স্নেহ-মমতা-কোমলতা,—সুপ্ত হলেও যোগ্য আহ্বানে জাগ্রত হতেও দেরী হয় না। যারা বঞ্চিত তারা ব্যথিত, যারা বঞ্চক তারা ঘৃণ্য। তবুও একপক্ষকে ভুলের মাশুল যোগাতে হয়, আজীবন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যে বঞ্চিত, তাকেই ভুগতে হয়। এ বিবেকহীনতা জন্ম দেয় প্রতিহিংসাপরায়ণতার।

কৈশোরে অনেক সময়ই পলাতক জীবন ছিল অনিবার্য। স্থান, অস্থান, কুস্থান—সর্বত্রই আত্মরক্ষার্থে যেতে হয়েছে। এমনি একটা সময়ে পরিচয় হয়েছিল

সখ্‌জাদীর সঙ্গে। সখ্‌জাদীও পতিতা। বিবেকহীনা নারী। বিগতযৌবনা। মিথ্যা আর চাতুরী, আর বাইরের আবরণই তার মূলধন। নাম জিজ্ঞেস করলে বলে, মনোরমা। একটা রাতের কয়েক ঘণ্টা জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে সে আমায় আশ্রয় দিয়েছিল। সেদিন মৌখিক কৃতজ্ঞতাই জানিয়েছি তাকে, শ্রদ্ধা জানাই নি। পরিণত বয়সে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা তার প্রতি জন্মেছিল। কয়েক ঘণ্টার আশ্রয় সে দিয়েছিল পয়সার বিনিময়ে, কিন্তু যতই নীচ হোক না তারা, 'Woman is woman, she ends in a mother'. এ অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছিলুম সেদিন। নারী চায় অবলম্বন, চায় ঘর, চায় সন্তান। যেদিন তার অবলম্বন দূরে সরে যায়, যেদিন তার ঘর ভাঙে, মাতৃত্ব পরিহাস লাভ করে সেদিন সে কোথায় যে নেমে যেতে পারে তা যারা দেখেছে তারাই জানে। কল্পনাও নিথর হয়ে যায়। সখ্‌জাদী এমনি একটি অবলম্বনহারা, ঘরভাঙা ব্যথিত মাতৃত্বের প্রতিমূর্তি, বারান্তরে সখ্‌জাদীর কথা বলব।

যতই মিথ্যা হোক এদের কাহিনী, এক জায়গায় এরা একমত, পুরুষের উপর এদের প্রতিশোধস্পৃহা। কেউ হয়তো আসে দারিদ্র্যকে জয় করতে, কেউ হয়তো আসে কামনার দায়ে, কেউ হয়তো আসে বঞ্চিত হয়ে, কেউ হয়তো আসে অত্যাচারে; পরোক্ষে আর অপরোক্ষে এরা দায়ী করে পুরুষকে। তুলনামূলকভাবে দেখতে গেলে, কে যে প্রকৃত দোষী, তা বলা যায় না। তবুও এই পতিত নারী-জীবনই নীতিহীন সমাজকে অনেকাংশে রক্ষা করে আসছে আদিম যুগের আদিম প্রবৃত্তি থেকে। নয়তো ভেঙে পড়ত আমাদের ঐতিহ্যের গরিমা।

কালকে ছাড়বে ইরানের গাড়ি।

প্রভার ব্যবস্থায় অর্থ ও স্থান কোনটারই অসুবিধা হয় নি।

যাবার বেলায় ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে, বলে, ভুলবেন না যেন। মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেও, মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব।' কালের ক্ষীয়মাণ স্মৃতিতে কজনেরই বা মনে থাকে, মানুষের মন তো কত ঠুনকো। তাকে স্তোক দিলাম মাত্র। মানুষ চায় পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বল্‌গা ধরে চালনা করতে, অথচ পারিপার্শ্বিক অবস্থা কারুর ইচ্ছা-অনিচ্ছার ধার ধারে না। সেকারণেই মানুষ অনেক সময় অবস্থার দাস। নীতি, ধর্ম, প্রতিশ্রুতি, আদর্শ ভেসে যায়—মাংস-মেদহীন দেহটা অবস্থার চাপে দুমড়ে যায়—চলতে থাকে অক্লান্ত লড়াই।

ব্যক্তিগতভাবে প্রভার এ সমস্যা যেমন বিরাট, সমষ্টিগতভাবেও এর মূল্য কম নয়। তাই প্রতিশ্রুতির কোন দাম নেই—বরং বলা চলে, চেষ্টা করব। প্রতিশ্রুতি

আত্মগরিমা প্রচার করে, আত্মবিশ্বাসকে অখণ্ড মনে হয়—এ দাম্ভিকতা সময় সময় পতনের পথে টেনে নিয়ে যায়। সদিচ্ছা থাকলেও তা রূপান্তরিত হয় না।

অবশেষে এলাম ইরানের জমিতে। পাহাড়গুলো পাতলা হয়ে গেছে। উচ্চতা আর স্থূলতা উভয়ই দর্শনীয়ভাবে কম। প্রকৃতির হাতে-গড়া সবুজ রেখা দেখা দিল এদিক ওদিক। মারোয়াড়ী ঘরের বউ, দুহাত ঘোমটা, কর্কশ গলার শব্দ,—এইটেই সব নয়, ঘোমটার অন্তরালে থাকে সুন্দর একটি মুখচন্দ্রিমা। তেমনি বেলুচের শুকনো মরুভূমি আর কর্কশ পাহাড়ের পেছনে সুন্দর শ্যামল দেশ ইরান। সর্বত্র না হলেও—বহু স্থানে।

পাঠশালায় ইরান আর ইরাক দুটো দেশের কথা পড়েছি অনেকবার। সাময়িক পত্রিকায় ভ্রমণকাহিনীও পড়েছি। দূরের প্রিয়া সুন্দরী। নৈকট্য সৌন্দর্যের সমালোচনার অঙ্গ। যে শ্রদ্ধা ছিল এ দেশগুলোর ওপর—যতই এদের দেখতে পেলুম, ততই কমতে লাগল সে শ্রদ্ধা। সোহ্‌রাব-রুস্তম থেকে রেজা শাহ্ পর্যন্ত সেনাপতি আর রাজাদের বীরত্বের কাহিনী জড়িত এদেশ। অথচ জাহিদানের মাটিতে পা দিয়েই মধ্যযুগীয় বীরত্বকে পুতুলখেলা মনে হল।

জাহিদান পারস্যের পূর্বপ্রান্তের দ্বার-রক্ষক—ইংরেজের মস্ত ঘাঁটি। পাকাপাকি-ভাবে ফৌজী ছাউনী ফেলে, বিমানঘাঁটি বেধে, ইংরেজ নিজেদের সাম্রাজ্যবাদের বুনিয়াদ দৃঢ় করেছে। স্বাধীন ইরান দেশ, যুদ্ধেনিরপেক্ষ—এ দুটোই ভণ্ডামি। স্বাধীনতাটাও সন্দেহজনক, নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করাই অবান্তর। ইরানের শাসকশ্রেণী জনমতের তোয়াক্কা রাখে না—তারা ইংরেজ ও আমেরিকার কারপরদাজ। জনতার সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্বন্ধ অতি ক্ষীণ। রিকেটের রুগীর মত হাত-পা সরু লিকলিকে—মাথাটা মোটা। এ হচ্ছে ইরানের আসল রূপ। আজকের দিনে ইরানও এগিয়েছে—আরও এগোবে। যারা এগিয়েছে তারা ওদেশের মাটির মানুষ নয়, তারা রূপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছে। তবুও ভাল, এগিয়ে চলবার স্বপ্ন ওরা দেখতে শিখেছে। দুহাত বাড়িয়ে যে দিন ওরা মাটির মানুষকে বুকের সাথে আঁকড়ে ধরবে সেদিন মানুষের দুঃখ ঘুচবে।

ইরানকে দেখতে অথবা জানতে আসি নি, এসেছি আশ্রয়-সন্ধানে' আশ্রয় না মিললে ইরান-ইরাক পেরিয়েও যেতে হবে।—কোথায়, তা জানতুম না।

স্বল্পকাল স্থিতি ইরানের জনসমাজে মিশবার অন্তরায়। যে-কোন দেশেই যাও, তার বাসিন্দার সঙ্গে মিশতে হবে, তাও শহরে নয়—পল্লী অঞ্চলে, তবেই জানা

যাবে সে দেশটা। ইরানীদের সঙ্গে মিলবার যেটুকু সুযোগ হয়েছিল, তার সদ্ব্যবহার করতে পারি নি। তার প্রধান কারণ তাদের মিথ্যা আভিজাত্যের মূর্খামি। সরল অনাড়ম্বর তাদের জীবন। কিন্তু হিন্দুস্থানী দাস জাতি; বড়ই অনুকম্পার চোখে তারা দেখে হিন্দুস্থানীদের। এ Vain চিন্তাধারা সম্পর্ক-সৃষ্টির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

পথেই পরিচয় কর্মকার বাবুর সঙ্গে।

ময়মনসিংহ জেলায় বাড়ি। লেখাপড়া শিখেছে সামান্য। তুনিয়ায় বউ ছাড়া কেউ নেই। বয়স অল্প বলে, শ্বশুর-শাশুড়ী আসতে দেয় নি তাকে, হু'তিনবার হাঁকিয়েও দিয়েছে। বিরহীর শেষ সান্ত্বনা যুদ্ধক্ষেত্র। সেও এসেছে। বলা বাহুল্য, কর্মকার জাতব্যবসাই গ্রহণ করেছে,—কর্ম তার ভাঙা মোটর মেরামত। একান্তে ডেকে বললুম, ক্যাপটেন্ বোসের উপদেশ। ক্যাপটেন্ বোস প্রভার অনুগ্রহপ্রার্থী হলেও কোয়েটার স্বল্প-বাঙালী সমাজে বেশ নাম-করা। ক্যাপটেন্ বোসের কথা শুনে, সে আমায় একটা বাবলা জাতীয় গাছতলায় বসিয়ে আশ্রয় সন্ধানে বের হল।

কতক্ষণ বসেছিলুম জানি না, রাত অনেকটাই হবে—ষষ্ঠী-সপ্তমীর জ্যোৎস্না ক্রমে ক্রমে ঢিমিয়ে আসছিল। সেই সঙ্গে দেহও ঝিমোচ্ছিল।

সারাদিন আহার্য সংগ্রহ হয় নি। অনেকদিন ঘর ছাড়া। আজ খোলা আকাশের তলায় বসে হাড়-কাঁপানো শীতে অতীতের সুখস্মৃতি মনে জাগতে থাকে। সেই আমার ছোট্ট গৃহ—যেখানে রেখে এসেছি বাল্য আর কৈশোরের স্মৃতি, সেই আমবাগান, সেই পুকুর,—সেই খেলার সাথী। ঝাপসা-ঝাপসা সবই জাগছিল মনে।

আজ খাবার জোটে নি। কাল খাবারের থালা নিয়ে কত না অনুরোধ আর অনুযোগ করেছিল প্রভা। অক্ষুধায় খেতে হয়েছিল। খাওয়াটা তখন বড় নয়,—তার নিংড়ে দেওয়া স্নেহকে অপমান করতে পারি নি। সময়ের সামান্য ব্যবধানে কত ব্যবধান ঘটে যায় মানুষের জীবনে!

এতদিন আমার কথা জানতে সে চায় নি। খেতে দিয়ে জিজ্ঞেস করে কত কথা। বলে, কেমন করে সবাইকে ছেড়ে থাকেন আপনি?

হেসে বললুম, অভ্যেস হয়ে গেছে।

—ধন্য আপনার অভ্যেস, আমি হলে আঁচলে বেঁধে রাখতুম।

—রাখতে না, রাখতে চাইতে; পারতে না। স্বভাব আমার বৈরী, পুলিস আমায় ছিনিয়ে নিয়ে যেত তোমার আঁচল-তলা থেকে। অদৃশ্য ভগবানের ইচ্ছা পূরণ হয় অদৃশ্যরূপী ভগবানের ভিতর দিয়ে। আমার-তোমার ইচ্ছটাই ইচ্ছা নয়।

পারিবারিক জীবনের আস্বাদন তার জীবনে নেই। সে চায় অন্যের জীবনকে জানতে। কোথায় একখানা ছোট ঘর, ছোট একটা সংসার, ঘোমটা টানা বউ-এর কোলে সোনার চাঁদ ছেলে!—আরও কত কি সে জানতে চায়। সে সংবাদ কে দেবে তাকে! যারা আসে, তারা আসে কামনার বেসাতি করতে। নারীত্ব আর মাতৃত্বের সঙ্গে তাদের পরিচয় থাকলেও, বিকাশ নেই এক কণাও। হয়তো সে ভাবে, যারা পেয়েও হারায়, তারা কত দুঃখী। বিবাহ যেন নারী-জীবনের বীমা!

সেও পেতে চায় ছোট একটা সংসার, বললুম অসম্ভব নয়।

আজ জাহিদানের খোলা মাঠে বসে আমিও ভাবছিলুম, চাওয়া আর পাওয়া—যেন স্বর্গ আর পাতাল। দুটোই কাল্পনিক, বাস্তব সত্য অতিশয় নির্মম। যা পেতে তার আকুলিবিকুলি, তা ফেলে আসা কত বড় নিষ্ঠুরতা, তা সে বুঝলেও, আমি বুঝি নি। এই চিন্তার বেদনা, যেন বাবলা গাছের কাঁটার মত খোঁচাচ্ছিল। কি ছিলুম, আর কি হয়েছি! পলাতক জীবনের যে সমাজ, তাকে ভদ্র বলে গ্রহণ করতে মোটেই পারি নি। অথচ এ অভদ্র জীবনযাপনই সবচেয়ে নিরাপদ। দেহ ও মনের সামান্য প্রয়োজনও ঘটে না এই জীবন পেতে—এ জীবনে নেই কোন কর্ম, নেই কোন তৃপ্তি, আছে কেবল আশঙ্কা আর অশান্তি। সেল-এর জীবন অনেক ভালো। সেখানে অশান্তি থাকলেও আশঙ্কা থাকে না। ছুটতে হয় না অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে।

নাঃ, ভালো লাগে না এ জীবন, ভালো লাগে না এ নোংরামি। দেশের বাইরে বসে কাজ করবারও নেই। অনর্থক এই খিন্নতা। মনে হল, ফিরতে হবে, ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে কর্মক্ষেত্রে। যৎ করোমি জগন্মাতঃ তদেব তব পূজনম্। বিশ্বমাতৃকার পদে সর্বকর্মফল অর্পণ করলেও মাটির নেশায় আত্মহারা হলুম।

সেদিনই তা প্রথম নয়। পাঠ্যজীবনেও মাসে একবার করে হোস্টেল পালিয়ে বাড়ি যেতুম। যখনই বাড়ির কথা মনে পড়ত, তখনই রওনা হতুম। মাটির মায়া ব্যাকুল করে তুলত।

তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক।

আমার হোস্টেল-ত্যাগ নিয়মিত ভাবে ঘটাতে সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি একদিন নিরালায় ডেকে জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললুম, বাড়ি যাবার কথা মনে হলেই আমি থাকতে পারি না। কেন যে পারি না, তা জানি না।

—মায়ের জন্য ?

—মা মারছেন অনেক দিন আগে। বন্ধন নেই কোথাও। তবু, 'আমার বাড়ি' একথা মনে হলেই আমি পাগল হয়ে উঠি।

এ পাগলামি কমল বন্দিশালায়।

যে কদিন বাড়ির মায়া আমায় আচ্ছন্ন করে থাকত, সে কদিন কারুর সঙ্গে কথা বলতুম না।

বাবলা-তলায় যখনই ভেবে নিলুম, দেশে ফিরতে হবে—তখনই সেই জীর্ণ পাগলামির লক্ষণ দেখা দিল। যেতেই যখন হবে—তখন বিলম্বে কি প্রয়োজন ?

এক সপ্তাহ অনিবার্যভাবে বসে থাকতে হবে। সপ্তাহে একদিন গাড়ি। কি করা যায়, এ কয়টা দিন !

এখানকার ভারতীয় বাসিন্দা সবাই ফৌজী। চিত্রগুপ্তের খাতার ডান পাশে নাম লিখিয়ে এসেছে। শৃঙ্খলা আর নীতি তাদের জন্য নয়। বেপরোয়াভাব সর্বত্র। বড়ই শিথিল এরা—শিথিল ছাউনীর আইন-কানুন। কে, কি, কেমন—এসব প্রশ্ন অবান্তর। এক চুমুকে পৃথিবীর সব ভোগ্যবস্তুকে গলাধঃকরণ করতে ব্যস্ত। কেউ প্রশ্নও করে না আমার পরিচয়।

ঠিক করলুম, সিরাজ নগরী যাব।

সেই গোলাপের দেশ ! সরাব আর সাকীর ডিপো ! শিশু-সুলভ চাপল্য দেখা দিল—সিরাজ না দেখলে যেন জীবনই বৃথা। এর আগে লিখেছি, রিক্ত হবার কত সুবিধা। রিক্তের বাধা-বিঘ্ন গা-সওয়া—গুরুত্ব নেই কিছু।

কয়েকটি ভারতীয় মুদ্রা বদল করে পরের দিন বাসে উঠলুম। ভীড় অত্যধিক। সিরাজের যাত্রী কম। Floating passenger-ই বেশি। সেজন্য অল্প দূর গিয়েই বসবার জায়গা হল। ছোট ছোট বাস, সোজা দাঁড়াবার উপায় নেই। আমার দেখা পৃথিবীর দেশগুলোর মধ্যে বর্মায় অনেকটা এই ধরনের বাস দেখেছি যুদ্ধোত্তর কালে। যেমন গরীব এদেশের যাত্রী, তেমন বাসের আকৃতি।

বাস চলছে তো চলছেই। আমাদের দেশের মতই চীৎকার হৈ-হৈ ওঠা-

নামা—নূতনত্ব কিছু নেই। ইরানীরা অত নোংরা নয়, দীনতা তাদের ব্যাপক ও ভয়াবহ। উৎকট গন্ধটা কিছু কম।

পাকা বাঁধানো রাস্তা। ধুলোয় আকাশ-বাতাস অন্ধকার করে বাস ছুটেছে। ছোট ছোট খেজুরের ঝোপ, কোথাও পাহাড়ের কোল থেকে ঝরনা নেমে আসছে, তার আশেপাশে ছোট ছোট kitchen garden-এর মত বাগান। ন্যাসপাতি ডালিমগাছও দেখা যায়। আমাদের দেশের বস্তির মতই গ্রামের ঘরবাড়ি। বীরভূম-বাঁকুড়া জেলার মাটির ঘরের মত ঝুপরি—জানালাটা প্রায় ক্ষেত্রেই অজ্ঞাত। অভিনব এ দেশের দারিদ্র্য।

সারা দুনিয়ায় যারা আলো জ্বালায়, তাদের ঘরে আলো জ্বলে না। এই তো ভাগ্যের পরিহাস! দারিদ্র্যের আর অর্থের সামঞ্জস্যবিহীন সমন্বয়! সিরাজ আর তার উপকণ্ঠ দেখলেই পারস্যের সাধারণ অবস্থা জানা যায়। একদিকে নিরন্ন জনতার অসংখ্য বস্তি, অন্যদিকে কতকগুলো ধনীর বিলাস-গৃহ। সুন্দর আর অসুন্দরের চমৎকার জয়যাত্রা! রাস্তায়-ঘাটে পুরুষ আর দারিদ্র্য পৌরুষ প্রদর্শন করে চলছে।

নারী-মুখ দর্শন এদেশে সহজে সম্ভব নয়। এদেশ পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারক ও বাহক হলেও নারী এদেশে পুরুষের কর্মসঙ্গিনী নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হারেমের রান্নাঘরে তাদের কাজ—আর কাজ সন্তানসৃষ্টি। বোরখাবিহীন নারী রাস্তায় তামাশার বস্তু। বাজীকরের খেলায় যেমন লোক জোটে—তেমনি সহস্র চক্ষুর ভীড় হয় এই সাহসিনীর ওপর। ইরানী পুরুষরা গৌরবর্ণ, উন্নতনাসা, মেয়েরা কাশ্মীরী মেয়েকেও হার মানায়। তবে দারিদ্র্য তাদের মুখে বয়সের ছাপ রেখে যায়। দারিদ্র্যের পেষণে শিশুমৃত্যু আর অকালবার্ধক্য ভয়াবহভাবে প্রকটিত।

এই সিরাজ! সিরাজ নয়—সারা পারস্যেই এরূপ। সুন্দর মূর্তি—প্রাণহীন। সিরাজের নামে দুনিয়ার চোখে স্বপ্ন। স্বপ্নের মতই ভ্রম বাস্তবের সিরাজ। যদি না আসতুম এদেশে, এই ভ্রমাত্মক স্বপ্ন নিয়ে জীবন কাটাতে পারতুম। স্বপ্নের সেই সিরাজ, ওমরখৈয়ামের সিরাজী আর সাকী, গোলাপের বাগ—হায়রে! সবই বুঝি কেতাবী সিরাজ! বাস্তবের সিরাজ লজ্জানত, অবগুণ্ঠিত, বিগতযৌবনা—নামের স্মৃতি নিয়ে অতীতকে উপহাস করছে। মাত্র কয়েক ঘণ্টা! দেখাবার মত অনেক কিছুই বাকী রয়ে গেছে। মিনার, মসজিদ, ইসলামী স্থাপত্য আর ভাস্কর্য ছড়িয়ে আছে এদিক ওদিক। দু-এক দিনে সবটা দেখা সম্ভব হলেও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া অসম্ভব।

ফিরতি বাস নেই জেনেই পান্থশালা খুঁজে বের করলুম। বাইরের ভদ্র আবরণটা ভালোই লেগেছিল। কম্বলখানা কামরায় রেখে বেরিয়ে পড়লুম শহর দেখতে।

সামনের গলিতে কজন বালক খেলছিল—আমাদের দেশের বস্তির ছেলের মতই তাদের বেশ-ভূষা। পার্থক্য—সবার মাথায় ছোট একটা 'ফকরে' গোল টুপি। রক্ত-গৌরবর্ণের শিশুদের মাথায় অর্ধময়লা জরাজীর্ণ টুপিগুলো সুন্দর দেখাচ্ছিল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলুম তাদের খেলা। পরাজিত পক্ষ আর বিজয়ী পক্ষ শেষ পর্যন্ত বাক্‌যুদ্ধ শুরু করল। স্বাধীন জাতের ছেলে, বাক্‌যুদ্ধের পরই হস্তপদ ছোড়াছুড়ি আরম্ভ করল। হা-হা করে প্রবীণরা এল।

এ কোণায় সে কোণায় মসজিদ। চবুতরায় বসে শেখ সাহেবরা বৈকালিক আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত। এ দেশের রাজনীতি আর অর্থনীতি তার সঙ্গে সমাজব্যবস্থার জন্ম এই চবুতরায়। আফগানিস্তানেও এরকম ব্যবস্থা দেখেছি। খোলা ময়দানে অথবা ক্লাবে তারা বসে না—ধর্মস্থানেই খোদার নামের সঙ্গে খোদার সৃষ্ট ব্যবস্থা রক্ষায় তারা আত্মনিয়োগ করে। আফগানী সর্দার আর ধর্মগুরুরা যেমন হাত-পা নেড়ে বক্তৃতা করে আর শ্রোতারা 'আমেন' বলে সায় দেয়, তেমনটা এদেশে নয়। পরিণতবয়স্ক সবাই বলতে পারে—আর বলেও তাদের মতামত।

একটা চবুতরায় এসে বসলুম। শ্বেতপাথরে গড়া চবুতরা। পরিষ্কার ঝকঝকে—সিঁদুর খুঁটে তোলা যায়।

সূর্য পাটে বসেছে। সারাদিনের রুক্ষতা হ্রাস পেয়েছে।

বিদেশী দেখে একজন আলাপ করতে এগিয়ে বসল। কথ্য ইরানী ভাষা আর ভারতের কেতাবী ইরানী ভাষায় তফাত অনেকটা। সুযোগ ছাড়বার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু হাত-পা নাড়ানো ছাড়া অন্য উপায় নেই। মুশকিল আসান করল ওদের মধ্যেই একজন কমবয়সী যুবক। ব্যবসায়ের খাতিরে হিন্দুস্থান গেছে বহুবার। ইংরেজীও জানে কিছু কিছু।

ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে বোঝাচ্ছিল তাদের সাধারণ অবস্থা!

মেঝের ওপর হাত দিয়ে বললে, **this not Iran.** অর্থাৎ এই শ্বেতপাথর ইরানে পাওয়া যায় না। শেখ সাহেব—যিনি প্রবীণ, মেহেদী মাখানো লাল-সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে তাকে মাঝে মাঝে তালিম দিচ্ছিল। সেও নব উৎসাহে বুঝিয়ে চলছিল।

মোটমাট বুঝলাম, দেশ দরিদ্র নয়, কয়েকজন দরিদ্র আছে—যেমন অন্যদেশেও আছে। এর জন্য দায়ী গরীবরাই। আল্লার বদ্‌দোয়াতে তাদের এ অবস্থা। হালালী কাজ, নেক্ কাজ কেউ করে না। আল্লার দরবারে বে-ইনসাফী কিছু হবার নেই। আল্লার মর্জি তারা মাথা পেতে নিয়েছে। তবুও তারা আজাদ—আর হিন্দুস্থানীরা গ্রেপ্তারী।

হায়রে আজাদী! লক্ষ লক্ষ লোক যে দেশে অনাহারে ধুঁকছে—তারাও আজাদ! দেশের সকল সম্পদ ইয়াংকী আর ইংরেজের হাতে তুলে দিয়ে তারা আজাদীর বজ্জাতি-বাজনা বাজাচ্ছে।

সে দেশের বাজার দেখবার ইচ্ছে ছিল। রাত অনেক হওয়ায় ফিরলুম হোটেলে। খাবার প্রস্তুত ছিল, উটের মাংসের কাবাব, লাল রং-এর নানরুটি, কয়েকটি খেজুর আর দুধ খেয়ে শুতে গেলুম।

হোটেলের চাকরটা বিছানা পেতে দিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলে, তফ্‌রী হবে কিনা।

তফ্‌রী শব্দের অর্থ সেদিন জানতুম না। শোবার আগে 'bed tea' অনেকেই খেয়ে থাকে। এদেশেও সে রেওয়াজ থাকতে পারে বিবেচনায় বললুম, পাঠিয়ে দাও।

কয়েক মিনিট মাত্র!

নিঃশব্দ পদক্ষেপে দরজা খুলে দাঁড়াল বোর্‌খাপরা মেয়ে।

ইরানের সাকী। দ্বিধাহীন পদসঞ্চারে ভেতরে এসেই দরজা বন্ধ করে দিল। তার চলনই জানিয়ে দেয়, এ কামরা তার পরিচিত, আর এ কাজে সে অভ্যস্ত। বোর্‌খা খুলতেই যে রূপ দেখলাম, সে রূপ আজও ভুলতে পারি নি।

এদিকে বুকের রক্ত হিম হয়ে আসছে। বলবার চেষ্টা সত্ত্বেও তাকে বলতে পারছি না। ভূতে-পাওয়ার মত অবস্থা।

বয়স আমার চেয়ে বেশী নয়। তার তৈলবিহীন কেশদাম, অনাহার-শীর্ণ দেহ কুঞ্চিত কপাল, উঁচু চোয়াল এবং সমস্ত দেহের মধ্যে বিশিষ্ট নাসিকা তার অল্প বয়স বুঝতে দিতে চায় না।

নিজের ভ্রান্তি বুঝতে পারলুম, অনেক কষ্টে জানালুম, শয্যাসঙ্গিনীর প্রয়োজন আমার নেই। অনুনয়, বিনয় সব ব্যর্থ। দেহের মূল্য তাকে পেতেই হবে। গোপন অভিসারের মূল্য তার চাই—অনাহারী সন্তানের আহার্য তার চাই।

শেখ সাহেবের 'আল্লার মর্জি' কথাটা মনে হল। সে যদি থাকত—তাকে দেখিয়ে দিতুম, আল্লার মর্জি কখনও কুরূপ হয় না—মানুষের মর্জি কুৎসিত সৃষ্টি করে। বহু-বিবাহের ব্যবস্থা করেও দেহপণ্য রোধ করতে পারে না যে সমাজ, সে তার অক্ষমতার দোহাই দেয় ওপরে আঙুল দেখিয়ে। দারিদ্র্য এর চেয়ে ভীতিপ্রদরূপে কখনও দেখা দেয় না। সমষ্টিগত প্রশ্নে যা সামান্য মনে হয়, ব্যক্তিগত প্রশ্নে তা বিরাট। চিন্তার অবসর ছিল না। ইতিমধ্যে সে আমার বিছানায় স্থান গ্রহণ করেছে।

তার হাতে দুটো রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে মাপ চাইলুম, জ্ঞাত সকল পারসী শব্দ একত্র করে তাকে বোঝালুম, মক্কেল চিনতে পারে নি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

দোষ তার নয়, আমার। আমি না বুঝে সম্মতি না দিলে এ পরীক্ষায় পড়তে হত না। দুটো টাকা হাতে পেয়েই সে বেরিয়ে গেল। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম।

অনিদ্রায় রাত্রি যাপন করলেও আর কোন উৎপাত হয় নি।

পরের দিনও নয়।

৮

কর্মকার আর আমি একই ছাউনীতে থাকতুম। সিরাজ থেকে আসবার সময় "সফেদী" এনেছিলুম। আমাদের দেশের তরমুজের মত ফল, মরুতে জন্মায়, একটু ডিম্বাকৃতি। মিষ্টত্ব প্রশংসনীয়। পিপাসা মেটাতে এর জুড়ি নেই।

কর্মকার তার বন্ধুবান্ধব ডেকে আনল। সদ্ব্যবহার করতেও দেরী হল না।

বিকেল বেলায় শহরে যাওয়া সবার কাজ। ছাউনি তখন খালি। আমি যেতুম তাল-খেজুরের ঝোপে। সূর্যাস্তের পর আসতুম ফিরে। কর্মকার আসত অনেক রাতে।

আজ অবধি কর্মকারকে জিজ্ঞেস করি নি, কোথায় যায়, কেন যায়। ইঙ্গিতেই বুঝেছিলুম স্থানটি পবিত্র নয়।

আমার উদাসীনতা কর্মকারের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। পরের ঢেঁকি কাঁধে করে বেড়ানো যাদের কাজ, তারা নিজের সূচটা তুলতে পারে না। এই স্বাভাবিক মনুষ্যধর্মের ব্যতিক্রম নেই বলেই—আমার উদাসীনতা শেষ পর্যন্ত balance রাখতে পারে নি।

পরের দিন কোয়েটা ফিরবো।

পথ চলার ক'টা মামুলি উপদেশ দিয়ে কর্মকার শুয়ে পড়ল।

অনিশ্চিত যাত্রার প্রারম্ভে দুশ্চিন্তা আসে অনেক। সারারাত এপাশ-ওপাশ করে কাটালুম। শেষ রাতে কর্মকার গোঙাতে লাগল।

উঠলুম। মোমের সেজ জ্বালালুম।

কর্মকার জ্বরে বেহুঁস। ঘড়িতে দেখলুম, কোয়েটার গাড়ি ছাড়তে আর ঘণ্টা দুয়েক দেরী। কর্মকারের অবস্থা দেখে একটু শঙ্কিত হয়ে পড়লুম। ভোরের আলোয় লোকজনের হেপাজত করে যেতে হলে গাড়ি পাবার সম্ভাবনা থাকে না। এভাবে তাকে রেখে যাওয়াও নৃশংসতা; কেমন বাধো-বাধো লাগছিল।

যাওয়াটা যেমন দু মিনিটে স্থির করেছিলুম, থাকাটাও তেমন স্থির করে ফেললুম। আজ না যাবার অর্থ এক সপ্তাহ বসে থাকা।

বেলা দশটা নাগাদ কর্মকারের জ্ঞান হল। চোখদুটো রক্তজবার মত—দৃষ্টি চঞ্চল ও ভাসাভাসা। দেহে প্রচণ্ড ব্যথা।

আমার দিকে অপলকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বললে, আপনি যান নি? তার কথার কোন জবাব না দিয়ে বললুম, হাসপাতালে খবর দেওয়া হয়েছে—সেখানে আপনার বেডও ঠিক হয়েছে।

কর্মকার ভয়ে আঁতকে উঠলো, রোগের গুরুত্ব সে বুঝতে পারল; মিনতি করে বললে, আমায় হাসপাতালে দেবেন না, সেখানে আমি বাঁচব না।

সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, জ্বরতো সবারই হয়, মরণ কি অত সহজ!

—সহজ নয়, কিন্তু এ জ্বর সে জ্বর নয়। যদিও বাঁচতুম, হাসপাতালে মোটেই বাঁচব না। কিছুক্ষণ থেমে আবার বললে, যদি মরি, একটা খবর দেবেন বউকে। আর, আর পারেন তো দুটো খেতে দেবেন। কদিনের মধ্যে সে আর কিছু বলতে পারে নি। কঠিন বসন্ত রোগে সে বেহুঁস। পাঁচ দিনের দিন খবর পেলুম ক্রাইসিস্ কেটে গেছে। আমার অপেক্ষা করার কোন কারণই নেই। বিকেলে হাসপাতালে তার সঙ্গে দেখা করে বিদায় নিয়ে এলুম।

বিরহী কর্মকার লড়াই-শেষে তার স্ত্রীর কাছে নিশ্চয়ই ফিরেছে, আছেও হয়তো সুস্থ জীবন নিয়ে। আর দেখা হয় নি তার সঙ্গে। যদি কোন দিন হয়, শুনব তার পরের কাহিনী।

কিন্তু সব সময়ই মনে পড়ে তার হাসপাতাল-ভীতির কথা। কি মিনতি তার চোখে! বাইরের হাসপাতালের অভিজ্ঞতা অনেক সময়ই এভাবে ভীত করে তোলে। কেন করে, তাই বলব পরের চিঠিতে।

ফৌজী হাসপাতাল আর সচরাচর যে সব দেশী হাসপাতাল দেখে থাকি তাদের মধ্যে তফাত অনেক। আমার কোন আত্মীয়কে অসুস্থ অবস্থায় দেশ থেকে মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসার আশায় নিয়ে গিয়েছিলুম। আউটডোরে দেখবার পর বললে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে।

সেদিন জায়গা ছিল না। এক টুকরো কাগজে লিখে দিল তারিখ, যে তারিখে এসে সংবাদ নেব জায়গা আছে কিনা।

এলুম তারিখ মত। স্থান হল না। আবার তারিখ পেলুম।

এমনি করে চার-পাঁচবার আসতে না-আসতেই দেখা গেল, হাসপাতালের বেড খালি না হলেও পরলোকের বেড খালি হয়ে গেছে।

তবুও টিকিটখানা ছাড়লুম না। মৃত আত্মীয় ধর্মরাজের কোর্টে হয়তো সওয়াল করছিলেন সুকর্মের আর কুকর্মের, আর আমি টিকিটখানা হাতে করে আসতে লাগলুম প্রত্যেক নির্দিষ্ট তারিখে—নতুন তারিখ নিতে।

একদিন ভীড় হয়েছে বেশি, কাজও ছিল বাইরে, বললুম দয়া করে তারিখটা দিয়ে দেবেন—আবার কবে আসতে হবে।

টিকিটের পাতা উল্টে ডাক্তার বাবু বললেন, মানে ?

—মানে, রুগী মারা গেছেন চার মাস আগে, বিনা বেডে। ধৈর্যের মহড়া নিচ্ছিলুম কত দিনে আপনাদের বেড খালি হয়, তাই দেখতে।

ভদ্রলোক লজ্জিত হলেন না। বললেন, কি করব, বলুন ; জায়গা খালি না হলে···আর শুনবার ইচ্ছে ছিল না, বুঝলুম, এরূপ কাজে এঁরা পক্বতা লাভ করেছেন। পরে শুনেছিলুম, ডাক্তার বাবুদের বাসায় এনে প্রচুর দক্ষিণা দিলে, বেডও রোজ খালি হয়।

আরও একটা ঘটনা ঘটেছিল বিহারের হাসপাতালে।

কদিন থেকেই জ্বর, পেটেও ব্যাথা। সেদিন জ্বরটাও যেন একটু বেশি। ঝম্পটীবাবু এসেই হাসপাতালের ব্যবস্থা করে গেলেন। প্রায় বেহুঁস অবস্থায় আমায় নিয়ে গেলেন হাসপাতালে।

বিশ-বাইশ বেডের ওয়ার্ড। স্থান মিলল। টিকিট হাতে আসা-যাওয়া করতে হয় নি। পরে শুনেছিলুম, ঝম্পটিবাবুর ব্যক্তিগত খাতিরেই স্থান সংগ্রহ হয়েছে, নয়তো আমার মত রুগীর স্থান হাসপাতালে নয়।

বাঁ পাশের বেডে যে রুগী, তার জন্য ডাক্তার-নার্স একটু বেশি ব্যস্ত। দু-

একজন ইউরোপীয়কেও দেখলুম। বেশ নজর করে দেখলুম রুগী ভারতীয় এবং মসীকৃষ্ণ।

মাঝ রাতে ফোঁপানীর শব্দে ঘুম ভেঙে গেল।

বৃদ্ধ রুগী বিদায় নিয়েছে ইহকালের মায়া মমতা থেকে। বৃদ্ধের পুত্র ফোঁপাচ্ছে। কিছুক্ষণ মাত্র।

তারপর সব চুপ। সবাই গেল চলে। রয়ে গেল মৃতদেহ।

এতক্ষণ ডানদিকে লক্ষ্য করি নি। টিমটিমে আলোতে দেখতে পেলুম তিনিও চাদর-ঢাকা। পরলোকের পথে যেতে গালিচা বিছিয়েছেন।

দুটি মৃতদেহের মাঝখানে আমি। ওরা যেন ইশারা করছে—ঐ গালিচার পথ বেয়ে আসতে। এমনি হয়তো কত রুগী আমার এই শয্যাতেও পরলোকে পাড়ি জমিয়েছে। কে জানে কত তাদের সংখ্যা! মৃত্যুর বিভীষিকা চোখ থেকে ঘুম কেড়ে নিল। কখন যে দিনের আলো দেখা দেবে! এক এক মিনিট এক-একটা বছর!

ভোরের হাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। সারা রাত্রের অনিদ্রা দেহকে আরও দুর্বল করেছে। ইতিমধ্যে রাতের সঙ্গী দুজন স্থানচ্যুত হয়েছেন। তাঁদের স্থানে নতুন ওয়ারিস এসেছেন, বোধহয় পারের কড়ি সংগ্রহ করতে।

দুপুর বেলায় মালকোঁচা এঁটে, হাসপাতালের রাঁধুনী নোংরা একটা পেতলের থালা ভর্তি ভাত আর অড়হরের ডাল এনে চিরাচরিত প্রথায় আমার পথ্য নির্দেশে রেখে গেল আমার বেডে।

বিহারের হাসপাতালে অড়হরের ডাল পথ্য অবাস্তব নয়। বিহারী পেটে ছাতুর বদলে ডাল উপকারীও বটে! পেটের যন্ত্রণাকাতর রুগীর এ পথ্য পাশবিক চিকিৎসারই অঙ্গ। দেহের তাপও কম নয়। দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনায় পথ্য মেনে নিলুম, কয়েক মুঠো মুখেও দিলুম।

ঐ পর্যন্ত। তারপর সারা দিনটা কোথা দিয়ে কেটে গেল জানি না। বিকেলে সাহেব ডাক্তার এলেন, আমায় জানালেন, কাল বিদায় নিতে হবে। আমি সে কথা লক্ষ্য না করে বললুম, Abnormal pain.

সাহেবের কর্তব্যজ্ঞান টনটনে। হাসপাতালের সুখ ছেড়ে আমি যেতে রাজী নই, এইটে তিনি বুঝলেন। ধমকে বললেন, Come in out-door—আউটডোরমে আও!

বললুম, Absurd. I can't move even.

সাহেব ডাকলেন, Nurse, thermometer please. Have temp.

জ্বর দেখে, চার্ট দেখে ডাকলেন সকালের নার্সকে।

কালো মিশমিশে চেহারা। ওজনে দু মণ পেরিয়ে গেছে। পানের রসে দন্তপংক্তি দেহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেছে। বয়সও কিছু হয়েছে, অন্তত যুবতী নয়। কাল রাত্রিতে এসে দাঁড়ালে আমার নামও চিত্রগুপ্তের খাতায় তুলতে হত। রূপের বালাই নেই—সাজের বালাই যথেষ্ট। 'কারিয়া-পিরেত' সাক্ষাৎ দেখলুম। তিনি এসেই রায় দিলেন, সকালে জ্বর ছিল না।

সাহেব ইংরেজের বাচ্চা, নার্সের কথায় বিশ্বাস করলেন না, বললেন, Impossible. See me in the Office.

ঔষধ, পথ্য সবই এল, তার সঙ্গে এল দুরন্ত রক্ত-আমাশা। 'কারিয়া-পিরেত'কে আর দেখি নি। শুনেছিলুম অন্য ওয়ার্ডে বদলী হয়েছে।

এই চরম সুখের অভিজ্ঞতা যাদের নেই তারাও শঙ্কিত হয় হাঁসপাতালের কথা শুনলে। মানুষ বুঝতে শিখেছে আমাদের এই সোনার দেশে যার পকেটে সোনা চকচক করে না, তার পরমায়ুর অঙ্ক চকচক করবার অধিকার হারায়। হাসপাতাল তাদের যাদের স্বর্ণখণ্ডের ওপর মালিকানা আছে। দরিদ্রের জন্য হাসপাতাল কেবলমাত্র শবদেহ সংকারের আইনসঙ্গত বিনামূল্যে সার্টিফিকেট পাবার দপ্তর। কর্মকারবাবুর শঙ্কা তাই অমূলক ছিল না।

কদিন আগে ধরিত্রীলাল চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল। হরিবল্লভ সহায় ছিলেন সাথে। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা ইস্তফা দিয়েছে। দেশের সঙ্গে ইংরেজের লড়াই আসন্ন।

ধরিত্রীলাল হেসে বললেন, ইংরেজের সঙ্গে লড়াই আসন্ন। জেলেও যেতে হবে। এবার দুঃখকষ্ট কম। আগের মত লোহার সান্‌কি নেই। এলুমিনিয়মের থালা-বাটি মিলবে, মাছ-মাংসও মিলবে, মিলবে আরও কত কি—যেন স্বর্গসুখ!

ভাগ্যি বিহারের জেলে বাস করতে হয় নি। হাসপাতালরূপী জেলই কঠিন অভিজ্ঞতা দিয়েছে। বিহারের অড়হরের ডালকে পেটে আস্তানা দিয়ে, বাকী কটা দিন হাসপাতালের স্বর্গসুখ চরম উপভোগ করেছিলুম।

বিকেলে বসলুম গিয়ে সেই পুরানো বাবলা তলায়। প্রথম দিন থেকেই তার সঙ্গে পরিচয়। নিঃসঙ্গ জীবনের সাথী। তার সঙ্গে দেখা করে এলুম। তাল-খেজুরের ঝোপ-ঝাপ পেরিয়ে গাছতলায় এসে বসলেই কেমন একটা উদাসীনতা অনুভব করতুম। স্বপ্নের মত ভেসে আসত অপঠিত ইতিহাসের কথা। কল্পনার জাল বুনে দেখতে চাইতুম পারসিক বীরদের লড়াই, সাকীর নাচ। চিন্তাধারা

চার-পাঁচশো বছর পেছনে দৌড়ে যেত। এইখানেই বোধহয় মেহেরউন্নিসার জন্ম, এখানেই বোধহয় আলি আস্‌গরের লীলাক্ষেত্র। চিন্তাগুলো মনের ওপর ছায়ার মত ভেসে বেড়াত!

তিনজন বেদুইন সন্ধ্যার প্রাক্কালে নমাজ পড়ছিল।

তাদের মাটি দিয়ে ওজু করা থেকে নমাজ পড়া শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করছিলুম। হঠাৎ মনে হল, ইসলামের জয়ের বাণী যেন চারিদিকে বিঘোষিত হচ্ছে। বিশ্বের সকল মুসলমান একই সঙ্গে এমনিভাবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে। এদের এজেণ্ট দরকার হয় না। দরকার হয় না কোন আড়ম্বরের। সরল সহজভাবে প্রত্যেকেই হাতজোড় করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে চলেছে—নাই কোথাও সামান্য ভেদাভেদ।

ভৌগোলিক অবস্থার ওপর ধর্মের অনুশাসন কত বেশি নির্ভর করে! জলের অপ্রতুলতার জন্য মাটি দিয়ে ওজু করার ব্যবস্থা, কাঠের অপ্রতুলতার জন্য মৃতদেহ কবর দেওয়া, এ সবের প্রয়োজন হয়েছে আরবের মত শুষ্ক দেশে এ ধর্ম-ব্যবস্থার সৃষ্টি বলে। মৃতদেহ, দাহ করবার ব্যবস্থা যদি আরবে থাকত, তা হলে সুন্দরবনে পাঠাতে হত সে দেহ দাহ করতে, স্নানের অভাবে যদি পবিত্রতা রক্ষা অসম্ভব হত, তা হলে পবিত্র হওয়া অনেকেরই জীবনে ঘটত না। দেশের অবস্থার ওপর ধর্মের অনুশাসন নির্ভর করে। সে কারণেই ইসলাম শিক্ষা দেয় সহজ জীবন যাপন আর মিতব্যয়িতা। তাদের হদিস শেখায়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন দ্রব্যই নেবে না। তোমার যদি দুটো উট থাকে, তা হলে একটা বিলিয়ে দেবে অন্যকে, যার উট নেই। নীরস মরুতে মানুষের কমনীয় বৃত্তি অনেকাংশে হ্রাস পায়। সেখানে জন্মায় বলিষ্ঠ খানাবদলের জাত। নতুন দেশে সুলভ জীবিকা আবিষ্কারের নেশা তাদের জন্মগত। সেজন্যই ইসলাম ধর্ম প্রচারের পাঁচশত বৎসরের মধ্যে স্পেন থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।

মারোয়াড়ী আর গুজরাতীদের দিকে তাকিয়ে দেখ। তাদের অনুর্বর দেশ আর জীবিকার অভাব—এই দুই কারণে তারাও ছড়িয়ে পড়েছে সারা দুনিয়াতে। সেই পরিমাণে আমরা কুনো—আমাদের কর্মক্ষমতার দশগুণ আলস্য। পেটের যেখানে দায়, সেখানে ভাবুকতা চলে না। তাই বিধিলিপিতে আমরা ভাবুক আর প্রেমিক, দেশ আমাদের দেশী-বিদেশীরা করছে শোষণ, আমরা শোষিত ও শাসিত। প্রাচুর্য আর দুর্বলতা বাইরের শত্রুকে ডেকে আনে, শোষণের পথ খুলে দেয়।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছিল থমথমে নীরবতার ভিতর দিয়ে। দু-একটা কাক ফিরে চলেছে তাদের ডেরায়। আমারও আজকেই ইরানে শেষ দিন—আগামী ঊষায় আবার যাত্রা হবে শুরু।

আবার সে খটাখট ঘটাঘট শব্দ। একটানা—বিরক্তিকর!

ট্রেন চলেছে তো চলেছেই।

ফিরতি পথে যাত্রী কম। দু-একজনের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে পথ পাড়ি দেবার মতলব ছিল। মনের মধ্যে একটা কথা কেবল মোচড় দিচ্ছিল। আমি কি কেবল মন্দটাই দেখে আসছি? প্রত্যেকেরই তো ভালো-মন্দ আছে। ভালো দিকটায় তত নজর না দিয়ে মন্দটা বেশি করে দেখছি কেন? বোধহয় স্বভাবে হীনতা এসে গেছে।

হবেও বা। ভালটা একঘেয়ে রুটীনে বাঁধা। মন্দের মধ্যে যেন নূতনত্ব বেশি, তাই তার আকর্ষণ বেশি অনুভব করছি!

একই বেঞ্চে আমরা তিনজন যাত্রী।

দুপুরের দিকে শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছিল। বিকেলের দিকে দেহের তাপ যেন বাড়তে থাকে। ওদিকে লক্ষ্য না দিয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে গল্প শুরু করলুম।

সঙ্গী একজন নাগরকোটের জাঠ—শ্যামলাল। আগাগোড়াই তার বংশের বীরত্বকাহিনী শোনাচ্ছিল। সুলতান মাহ্‌মুদের সৈন্যের সঙ্গে তার কোন্ ঊর্ধ্বতন পুরুষ লড়াই করেছিল, মসলা দিয়ে সেগুলোই বলে চলছিল। খেদের সঙ্গে বলে চলল, নগরকোটের দুর্ভাগ্যের কথা।

আর একজন সাথী ঝিলাম জেলার রওশনলাল। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ।

মাথায় মুসলমানী টুপি, পরণে মুসলমানী পোশাক। নামের অর্ধেকটা মুসলমানী। লালিমা পাল 'পুং' লিখে না জানালে যেমন স্ত্রী পুরুষ বোঝা কষ্ট, তেমনি রওশান-এর সঙ্গে 'লাল' না লিখলে হিন্দু-মুসলমান নির্দেশ দুষ্কর।

রওশানের বড় ইতিহাস নাই। আছে চিরাচরিত প্রেমকাহিনী।

আমি যখন বললুম, এ যুদ্ধ আমার নয়, এতে হিন্দুস্থানের কোন লাভ নেই, তখন সে ভ্রূ কুঁচকে বলল, লাখ লাখ লোক করে-কম্মে খাচ্ছে, লাভ নেই!—আশ্চর্য!

তাকে বুঝিয়ে দিলুম। সবটা না বুঝলেও, আন্দাজ কিছুটা সে করল—শ্যামলালও তাকে কিছু বোঝাল। ইংরেজের ভাড়াটে সৈন্যের বৃহৎ অংশ জানে

না তাদের নিজেদের অবস্থা। আড়কাঠী যেমন শেখায় তেমনি শেখে। শোষকদের কাছে সৈন্যরা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে নির্বুদ্ধিতা আর বর্বরতার জন্য, বিচারবুদ্ধি দিয়ে যারা গুলী চালায়, মানুষমারা কাজ তাদের নয়। স্বদেশেও ইংরেজ এই রকম লোক সংগ্রহ করে—শুধু বর্বর সৈন্য তৈরি করতে।

শরীরটা ভাল ছিল না বলেই সের দেড়েক আঙুর কিনেছিলুম। সারা দিনরাত ওই আহার্য। একটা-একটা করে আঙুর মুখে দিচ্ছিলুম আর শুভ্র জ্যোৎস্না-স্নাত পাহাড়গুলোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ছিলুম। দিনের আলোয় যে পাহাড়গুলো রুক্ষ দানবের মত মনে হয়েছিল, সেগুলোই রাতের জ্যোৎস্নায় নবরূপে দেখা দিল। অন্যমনস্ক হয়ে দেখছিলুম। এমন সময়ে শুক্নো সার্ডিন মাছের জেলী আর শুক্নো নান্‌রুটির একটা টুকরো রওশন আমার সামনে রেখে অনুরোধ জানাল,—থোরা মেহেরবানিসে—

কুড়িয়ে-পাওয়া ফুটো কড়িও ফেলতে নেই—অন্তত বিদেশে।

দুজনে মিলে অখাদ্য সার্ডিনের জেলী সহযোগে নান্‌গুলো গলাধঃকরণ করতে থাকি। হঠাৎ রওশন বললে, জংমে আনেকো দিল্ নেহিথা, লেকিন তাজুবেওয়া —কথাটা বলেই সে লজ্জিত হল।

বেওয়া শব্দের অর্থ 'বিধবা'। আমার নজর ঐ শব্দটার ওপর গিয়ে পড়ল, বললুম, বেওয়া?

ফুটবলের ব্লাডার খুলে দিলে যেমন হুস্ করে সবটা বাতাস বেরিয়ে যায় একসঙ্গে, তেমন বেরিয়ে এল তার কাহিনী।

পড়শী মেয়ে তাজু। বিয়ের পর চারদিন মাত্র স্বামী ছিল তার ঘরে। সেই যে গেল লড়াইয়ে, তারপর চার মাস পরে খবর এল—মিশরের মরুভূমিতে সে ফতে হয়ে গেছে। পড়শীর সুখদুঃখে দাঁড়ানোই পঞ্জাবী রীতি। সেও নওজোয়ান, মরদের বাচ্চা, জঙ্গী জাত—সা-পুরী তো নয়। ধীরে ধীরে তার ওপর জন্মাল কেমন একটা মমতা। তারপর যা হয় তাই। বিয়ে ঠিক করল নিজেরাই, কিন্তু বাদ সাধল তার বাপ।

এক ছেলে—তার বউ 'বেওয়া' হলে ইজ্জত থাকে না। বামুনের ঘরে কুঁয়ারীর কি অভাব রয়েছে! এদিকে সে কথা দিয়েছে, বামুনের ছেলে সা-পুরী বানিয়া তো নয়! কথার খেলাপ কি ক'রে করে। ঠিক হল, পালিয়ে যাবে। পালালে খাবে কি? তাজুর পেনশানও বন্ধ হবে। আবার বিয়ে না করেও উপায় নেই। তাজু গর্ভবতী। ছমাস হয়ে গেছে তার শিক্ষাশিবিরে—ফিরছে বিয়ে করতে।

শরীর ভাল না থাকায় শুনবার ইচ্ছে হচ্ছিল না। সেই পুরানো কাহিনী।

সেই মজনুর চোখে লায়লাকে দেখা! ভালো লাগে না! রওশনলালের আর বলবারই বা কি আছে? আমার উদাসীনতায় সেও নিরুৎসাহ হল।

রওশনলাল যাচ্ছে তাজুকে বিয়ে করতে, আর সমাজ-ব্যবস্থায় অবিবাহিতা প্রভা তার প্রিয়জনকে দিচ্ছে অভিশাপ! সমাজে উৎকৃষ্ট আর নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব সর্বত্রই রয়েছে। পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ভুল সর্বত্রই অনর্থ ঘটায়। দোষ বুদ্ধির, কর্মের নয়! কোথায় ঝিলামের পার্বত্য অঞ্চলের শুক্‌নো মাটির পিঁজরায় রওশনের দয়িতা অধীর প্রতীক্ষা করছে, সে চিন্তায় সে বিভোর। এমনও হতে পারে, আর একজন মমতাশীলের সঙ্গে পিঁজরা ভেঙে সে উড়ে গেছে।

মন্দটা চিন্তা করাও পাপ। যাক্ গে; থাকুক রওশনলাল আর তাজু, বেঁচে থাকুক তাদের প্রেম—অক্ষয় হোক তাদের সুখের ঘর।

সার্ডিনের জেলী আর আঙুরের খোসা বেশ গোলযোগ শুরু করল শেষ রাত থেকে। দেহের তাপও বেড়ে গেল। কোয়েটা পৌঁছুতে পৌঁছুতে বেশ কাবু করে তুলল। কর্মকারকে দেখে এসেছি, ভয়টাও বেশ হল।

রওশনলাল জানাল পরের ট্রেনে যদি তাকে যেতে না হত, তা হলে আমায় হাসপাতালে না পৌঁছে সে যেত না।

শ্যামলালও এমনি ধারা কিছু বলে সরে পড়ল।

পড়শীর সুখ-দুঃখে দাঁড়ানোর ঐতিহ্য দুজনেই বেমালুম ভুলে গেছে।

কম্বলটি সম্বল—সেইটি নিয়ে কোন রকমে টাঙ্গায় উঠলুম। নির্দেশ দিলুম ধর্মশালায় যেতে। একবার মনে হয়েছিল, প্রভার বাসায় যাই। কি যেন একটা লজ্জা আর অহমিকা আমায় যেতে দেয় নি।

ধর্মশালায় যেতে বললুম বটে, কিন্তু ধর্মশালা-ভীতিও কম নয়।

ধর্মশালাগুলো নিরাশ্রয় বিদেশীকে আশ্রয় দেয়। সারা ভারতে, ভারতের বাইরেও যেখানেই রয়েছে ভারতীয়, সেখানেই রয়েছে বহু ধর্মশালা। দাতার মহৎ ইচ্ছা পরিচালনার দোষে বড়ই কষ্টদায়ক আর লজ্জাজনক হয়। কতকগুলো স্বার্থপর নীচমনার হাতে গিয়েই এ অবস্থা। সেবার শীতের সময় দিল্লীতে এসেছিলুম। সেই আমার প্রথম দিল্লী আসা। আশ্রয় নিলাম স্টেশনসংলগ্ন ধর্মশালায়। বারান্দায় স্থান সংগ্রহ হল। সারাদিন শহরের কাজ সেরে রাত প্রায় নটায় ফিরলুম। ম্যানেজারের কাছে গেলুম নাম লেখাতে। নাম শোনামাত্র তিনি স্থান দিতে অস্বীকার করলেন। কারণ প্রাদেশিকতা, অপরাধ মৎস্যভোজন। অনুরোধ জানালুম—অন্তত একটা রাত থাকতে দিতে। নতুন এসেছি দিল্লীতে, রাস্তাঘাট জানি না, তার ওপর হাড়কাঁপানো শীত।

কিন্তু আমার অনুরোধ আর যুক্তি ম্যানেজারের হৃদয় স্পর্শ করল না। প্রভুর আদেশে দরোয়ান আমার বিছানাপত্র রাস্তায় রেখে এল। মনুষ্যত্বহীন লোকের নির্মমতা এতেই শেষ নয়। আমি ক্ষীণ প্রতিবাদ করে বললুম, ওগুলো ফেলে দেবার কি দরকার, যাবার সময় নিয়েই যেতুম। এ ক্ষীণ প্রতিবাদের মাশুল পেলাম অর্ধচন্দ্র। বাক্যে নয়, কার্যে।

এ রূঢ় অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আসতে বাধ্য হলুম ধর্মশালায়। সেদিন নিরাশ্রয় নই—রুগ্ন। সেদিন কিন্তু আশ্রয় পেয়েছিলুম।

ম্যানেজারটি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের হিন্দু—সৌম্যদর্শন যুবক, গৌরবর্ণ, উন্নতকায়, সদালাপী। পদের যোগ্য। শেষ কয়েকটি টাকা তার হাতে দিয়ে, ডাক্তার ডাকতে অনুরোধ জানালুম।

ডাক্তার এসে জানিয়ে গেলেন, ব্যাসিলারী ডিসেন্ট্রী। ঔষধ-পথ্যের শতাধিক টাকার হিসাব দিয়ে, দক্ষিণা নিয়ে চলে গেলেন।

ম্যানেজার সাহেব চিকিৎসার ত্রুটি করেন নি। কিন্তু আমার অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করে বারবার জিজ্ঞেস করতে থাকেন আত্মীয়-স্বজনের ঠিকানা।

বুঝলুম, আমাকে নিয়ে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছেন। হঠাৎ মনে হল, হাসপাতালে যাই। আবার অসামরিক হাসপাতালে যেতে মন সরছিল না।

সেদিন বাঁচবার নেশা যেন পেয়ে বসেছে। এই বিদেশে অজ্ঞাত অবস্থায় মরব, এ কথা ভাবতে পারলুম না। অবিলম্বে সাহায্য না পেলে যে, রোগের উপশম হবে না, তাও বুঝলুম। বললুম, একখানা চিঠি দিচ্ছি, এই শহরে পৌছে দেবেন। সেখান থেকে কোন সাহায্য না পেলে, আর দরকার নেই। মরলে পর, আমায় দাঁড় করিয়ে কবর দেবেন। পোড়াবেন না।

আমার শেষের কথাগুলো রহস্যজনক। রসিকতা করে বলতে পারি নি যে, আমার দম্ভ যেন মৃত্যুর পরও থাকে। আমার অনমিত মাথা যেন মরণের পরও নমিত না হয়।

ক্রমেই বেলা বাড়তে থাকে। দেহের তাপও বাড়তে থাকে।

কেয়োলিন আর গ্লুকোজ গিলছি—আর পেটের যন্ত্রণায় কর্তিত ছাগশিশুর মত ছটফট করছি। তারপর সব অন্ধকার।—আর জানি না।

যেদিন চোখ মেলে তাকালুম, সেদিন স্থান পরিবর্তনটা নজরে পড়ল।

গভীর রাতে ক্ষীণ আলোকে মনে হল হাসপাতাল।

আবার সব অন্ধকার।

এবার যখন আলো দেখলুম, তখন মনে হল, আমি যেন বিশ্ববিজেতা সম্রাট। ধীর পদক্ষেপে লোকজন আসছে, যাচ্ছে। অবোধ্য হলেও, ফিসফিসানি কানে আসছে। কেউ বিশ্ববিজেতার শান্তি ভঙ্গ করছে না। কত যেন সাবধানতা! আবার অন্ধকার। বারেবারে ঝিমিয়ে পড়ছি।

ভোরের আলো জানালা দিয়ে এসে পড়েছে বিছানায়—আমারও ঝিমুনি ছুটে গেছে।

অনেকদিন যেন পৃথিবী দেখি নি। পাশ ফিরে শুতেই মনে হল, পায়ের কাছে কে যেন শুয়ে আছে। ঈষৎ ঘাড় উঁচু করে দেখলুম, কালো চওড়াপাড় শাড়ি পরনে, অবিন্যস্ত কেশদাম, তপস্বিনীর মত ধ্যানে মগ্ন—প্রভা। রাত্রি-জাগরণের ক্লান্তিতে কোন্ সময় ঘুমিয়ে পড়েছে।

ভোরের স্নিগ্ধ বুকে অরুণ এল, এল তপন। তপন তার তাপ ছড়িয়ে দিল সারা ঘরটায়।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল প্রভা।

বেলাটা অনেক হয়েছে, ঘুমটা তার অন্যায়—এই ভাব নিয়ে সে উঠে বসে। আমার উন্মুক্ত আঁখিপল্লবের দিকে চেয়েই সে আনন্দে চীৎকার করে বলে,—তবে?

—হাঁ, তবে মরি নি, বেঁচেছি, বেঁচে আছি।

—উঃ, কি লড়াই যমে আর মানুষে! এগারোটা দিন! শান্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এগারোটা দিন কেটে গেছে। এগারো দিন পৃথিবীকে দেখি নি। নতুন করে তারিখ আর বার গুনতে হবে আজ থেকে। কতই না পরিবর্তন হয়েছে পৃথিবীর—Rip Van Winkle-এর মত নূতন পৃথিবী দেখতে পাব!

সতত চলমান জগতে সবই পাওয়া যায় বিনিময়ে, পাওয়া যায় না একটি স্নেহকাতর প্রাণ। কোথাকার একটা ফেরারী, আর কোথাকার একটা পতিতা। না আছে কোন সম্বন্ধ, না আছে লাভের অঙ্ক, অথচ—আর ভাবতে পারি না।

অন্নপথ্য করেই ফিরবার বাজনা বাজালুম। অনিশ্চিত যাত্রা আবার হবে আরম্ভ। ডেকে বললুম, অতি নিকট আত্মীয় কেউ না হলে এমনি ধারা কেউ করে না! কে ছিলে তুমি গতজন্মে!

—গতজন্ম বিশ্বাস করি না। এ জন্মে আপনি ছিলেন অসহায় রুগী, আর আমি সাহায্যকারী নার্স—কিছুকাল অভিভাবিকা!

বাস্তববাদী কথায় হেসে ফেললুম। বললুম, এর বেশি কিছু নয়?

—মোটেই নয়। এর বেশি আশা করি না—চাইও না।

শেষের শব্দটায় জোর দেওয়াতে ক্ষুণ্ণ হলুম। আমার অহেতুক কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরও প্রয়োজন ছিল না, আত্মীয়তা সৃষ্টি করাটাও ন্যাকামি মনে হল। অন্যমনস্কভাবে বললুম, সেই ভালো।

—ভালো তো, জানতে চাইলেন কেন?

—মাপ কর, ভুল হয়ে গেছে। অনেক সময়ই তোমার ঐ সেবিকামূর্তি দেখে আত্মহারা হয়ে যেতুম, তাই জিজ্ঞেস করছিলুম। এখন বুঝেছি—এটা ছেলেমানুষি হয়ে গেছে। মনে করতুম, ভালোবাসা মনোধর্মেই শেষ নয়—ভালোবাসা বিনিময়-প্রার্থী। আমার মত না-পাওয়াতে পাওয়ার সার্থকতা সবাই অন্বেষণ করে না।

—যারা না-পাওয়ায় খুশী হয় তারা বাতুল, মনুষ্যধর্মী নয়।

শেলের মত তার কথাগুলো অন্তরাত্মায় আঘাত করল। বিদায়ী দক্ষিণা ভালোই পেলুম। মানসিক অবস্থা প্রকাশ না করেই বললুম, তারা বাতুল নয়, মনুষ্যধর্মী। এই না-পাওয়ার গৌরব ছিল বিদ্যাপতির, চণ্ডীদাসের। লছমীদেবী আর স্বামী যদি ঘোমটা টেনে ঘরকন্না করতে বসত, তা হলে পদাবলীর মত সাহিত্যের সৃষ্টি হত না। বুকভাঙা গান দিয়েই তৈরী হয়েছে পৃথিবীর সৌন্দর্য। আপাতমধুর নয় বলে তার সার্থকতা নেই এ কথা বলা চলে না। নয়ত কতটুকু দান ঐ তাজমহলের—ওটা তো রোশন-আরার ব্যর্থজীবনের কাহিনী নয়—মমতাজকে হারানোর প্রেমের সার্থক পূর্ণতা।

—রূপক জীবন নয়। কবি আর দার্শনিক সাধারণধর্মী নয়। দেহের আর মনের ক্ষুধা গড়তে চায় সাম্রাজ্য, সেখানে অন্যের প্রবেশ নিষেধ।

—ভালোমন্দের স্বপক্ষে আর বিপক্ষে অনেক যুক্তিই আছে। জীবনে দুঃখ মানুষকে বড় করে। কোথাও যে ব্যতিক্রম হয় না, এমন নয়। দৃষ্টিভঙ্গীর তফাতে অনেক কিছু হয়। শিব গড়তে বাঁদর গড়লে মাটির দোষ দেওয়া চলে না। দুঃখের ফরমুলা দেখেই আঁতকে উঠলে চলবে কেন? নিজেকে দুঃখের পথে টেনে নিয়ে—সুখের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া যায় না।

—দুঃখ জীবনকে বড় করে না; যারা বড় হয়, তারা দুঃখকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নেয়—অনুভূতি তাদের থাকে না। যারা দুঃখকে দুঃখরূপেই দেখে, তাদের মনুষ্যযোগ্য বৃত্তিগুলো শুকিয়ে যায়। সে মানুষ বড় হয় না, হয় না কোন স্ফুরণ তার জীবনধর্মের। অনাহারীর উদ্যম, উৎসাহ ও বৃত্তি দুঃখের আঘাতে লোপ পায়। কঙ্কালের ওপর দেহবিজ্ঞানের পরীক্ষা সম্ভব—সুস্থ মানবজীবনের উপর পরীক্ষা চলে না। শিব গড়তে বাঁদর গড়লে মাটির দোষ হয় না—কিন্তু

ভাস্করের দোষটা উপেক্ষা করা যায় না। একটি পদার্থ—আর একটি রূপকার। রূপকার-ধর্ম পালন না করলে সে রূপকার নয়, সে প্রতারক। প্রতারণায় যে অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকে দুঃখের ফরমূলা বলে না। সে দৃষ্টিভঙ্গী হারালে মানুষের ব্যথা বাড়ে। সে ব্যথার নিগ্রহ হয় সত্তাকে অস্বীকার করে, দুঃখের পথে টেনে নিয়ে, সুখের ওপর শোধ নিয়ে নয়। তাই না-পাওয়াকে সার্থক বলে মানতে রাজী নই।

—তাই শোধ নেবার স্পৃহা ওতঃপ্রোতভাবে তোমার সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

—অস্বীকার করতে পারি না। জন্মের পূর্বে আর মৃত্যুর পরে যা আছে তা অবিশ্বাস্য। বিশ্বাসীরা সান্ত্বনা পায়। এটাকে মূলধন করে চলতে পারে না কেউ-ই। অতীত আমার শিক্ষক, ভবিষ্যৎ অজ্ঞাত কর্মক্ষেত্র, বর্তমান আমার সংযোগস্থল। এ বর্তমানকে নিয়েই আমি ব্যস্ত—অতীতের শিক্ষাকে উপেক্ষা করতে পারি না। এ দৃষ্টির পেছনে মহৎ কোন বৃত্তি নেই, নিছক আত্ম-প্রতারণা রয়েছে। শোধ না নিলেই আত্মপ্রতারণাকে আশ্‌কারা দেওয়া হয়।

—এতই যদি তোমার জীবনে বিতৃষ্ণা আর বাস্তববাদ, তবে আমায় আশ্রয় দিলে কিসের প্রেরণায়?

—এর উত্তর আজ দিতে পারব না, যদি কোন দিন সময় হয়, তবেই দেব। তবে এ কথাটা ভুলবেন না, ত্যাগে আমার ভক্তি নেই—ত্যাগীকে আমি অনুকম্পা করি।

—সে অনুকম্পাই বুঝি আমায় টেনে এনেছে ধর্মশালা থেকে। এর বেশি কিছু নয়?

—বলেছি তো পরে দেব উত্তর। তর্কাতর্কি যাই করে থাকি—আসলকে পরিহারই আমার কাজ—মেকী নিয়ে আমার কারবার। বাইরের আমি আমি নই।

সারাদিন তার সঙ্গে আর দেখা হয় নি। দাসীকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে সে জানাল, 'আম্মাজান রোতি হ্যায়।'

সকালে যাবার আগ পর্যন্ত তার দেখা নেই।

প্রস্তুত হয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। আজ পর্যন্ত প্রভার কামরায় প্রবেশ করি নি। প্রয়োজনও হয় নি। দরজায় দাঁড়িয়ে অনুসন্ধিৎসু চোখে এদিক-ওদিক দেখতে লাগলুম।

ডেকে বললুম, প্রভা, আমি যাচ্ছি!

শুধু একটা জবাব এল, আচ্ছা।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার ব্যবহারগুলো বড়ই হেঁয়ালিপূর্ণ।

সেদিন সে এটা খান, ওটা খান, জামা গায়ে দিন, গরম জলে স্নান করুন—কত কি করে আমার পরিচর্যা করেছে—অথচ আজ যাবার বেলা একবার দেখাও করল না। অপমান সয়ে সয়ে গায়ের চামড়া পুরু হয়ে গেলেও তার কাছে এ রকম অনাদর আমার প্রাপ্য নয়। নিজেকে বড়ই অপমানিত মনে করলুম। এ রকম অবস্থায় দাঁড়ানো যুক্তিযুক্ত নয়। ভালোয় ভালোয় বিদায় নিতে পারলে হয়।

সেবার যাবার সময়, 'ভুলবেন না' বলে স্মৃতির দুয়ারে যে রেখা কেটেছে, আজকে তার কাছে এতই অপ্রয়োজনীয়! একটা মেয়ে, তাও আবার সমাজের অতি নিম্ন শ্রেণীর! কি সাহস তার যে, আমায় অপমান করতে পারে? যাকে মনে করতুম স্নেহ—নিজের যে অবস্থাকে স্নেহের ঋণ মনে করতুম—সে মনে করা ধসে গেল। খেলানো তার ব্যবসা, আমার প্রতি যে উপকার, এটা তার খেয়াল।

একবার মনে হল, আর দাঁড়ানো উচিত নয়।

তার ব্যবহার যতই কটু হোক, আমি কেন তিক্ততা সৃষ্টি করব? অন্তত দেখা করে যাওয়া কর্তব্য। আমি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কামরায় প্রবেশ করলুম।

খাটের বাজুতে মাথা রেখে প্রভা কাঁদছিল। তার পাশে এসে দাঁড়ালুম।

আমার উপস্থিতিতে তার অশ্রুর বাঁধ ভেঙে গেল। সে ফুঁপিয়ে উঠল।

সে নীরবে উঠে এসে প্রণাম করল, বলল, মেয়েদের স্নেহ মায়া মমতার পেছনে ঘুমিয়ে থাকে একটা অভিমানী প্রাণ। যে সুন্দর—সেও অসুন্দর হয়—এ ঘুম ভাঙলে। মাপ করবেন। যদি কোন দিন নিজেকে ফেরাতে পারি, সেদিন আমার পরিচয় আপনিই দেবেন—আমাকে দিতে হবে না।

ফিরতে হল।

সারাটা পথ ভাবতে ভাবতে এসেছি।

মেয়েদের বুঝতে আমরা কত না ভুল করি!

একটু আশ্রয়। একটু সুখ। একটু মিষ্টি কথা। একটু সততা। একটু স্নেহ। অথচ এইটুকুর অভাবে দিনের পর দিন কত না সংসার ভেঙে পড়েছে। কিন্তু সমস্যা সমস্যাই থেকে যায়, সমাধান আর হয় না। মেয়েদের কপালে সাইনবোর্ড এঁটে আমরা তাদের অপকর্মের বিজ্ঞাপন দিই। পুরুষের কপালে এমনিভাবে যদি সাইনবোর্ড দেওয়া যেত, তা হলে সমাজরক্ষা সম্ভব হত।

কালের স্রোতে সবই ভেসে যায়। স্মৃতি-বিস্মৃতির যুদ্ধে নিজেকেই স্থির রাখা যায় না। অন্যের কথা চিন্তার অবসর কোথায়?

প্রভার স্মৃতিও ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে এল। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম পৌঁছে সংবাদ দেব, তাও দেওয়া হয় নি।

অবশেষে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে বসে লিখলুম একখানা পোস্টকার্ড, সেন্সার পাস হয়ে সেটা নির্দিষ্ট স্থানে হয়তো বা পৌঁছেছিল, কিন্তু আড়াই বছরের মধ্যে কোন জবাব এল না। শেষ পর্যন্ত প্রভার স্মৃতি মিটে গেল।

আড়াই বছরে কত না পরিবর্তন হয়েছে পৃথিবীর! কত নগর গড়ল, ভাঙল, কত রাজ্য উঠল, পড়ল! আমরা সরে আছি এ পরিবর্তন থেকে বহু দূরে, কেবলমাত্র বিশ ইঞ্চি দেয়ালের ব্যবধানে।

অবাঞ্ছিত অতিথির স্থান কারাগারে। বৃটিশ আইনের এই ছিল মহিমা। আজও সে রীতির পরিবর্তন হয় নি; বরং অনেক ক্ষেত্রে কঠোরভাবে তা প্রয়োগ হয়ে থাকে। সেদিনও যেমন পুলিস-রাজ ছিল, আজও তেমনি আছে, কেবল রঙ-এর বদল হয়েছে। অপরাধ সামান্য অথবা নিরপরাধ, সন্দেহ অত্যধিক; সেই কারণেই রাজ-অতিথি হতে হয় হাজারো ব্যক্তিকে। আমার অতীত আমার বর্তমানকে প্রভাবান্বিত করতে কার্পণ্য করে নি। ইংরেজের কায়েমী জমিদারী ভাঙতেই হবে, এই ছিল পণ।

ভাঙল।

জেলে বসেই বুঝতে পেরেছিলুম, ইংরেজের রোজকিয়ামত ঘনায়মান। কিন্তু যাবার আগে সে চূর্ণ করে গেল ভারতের জাতীয়তাবোধের বুনিয়াদ।

এক দুষ্টব্যক্তি সারাজীবন গ্রামের সবাইকে অশেষ কষ্ট দিয়ে গেছে। মরবার সময় গ্রামের সবাইকে ডেকে বললে, ভাইসব, আমৃত্যু তোমাদের যন্ত্রণা দিয়েছি, আজ আমার মরণ সময়। এবার তোমরা শোধ নিতে পার। আমি মরলে, তোমরা চৌরাস্তার মাথায় আমার লাস একটা শূলে চড়িয়ে রেখে দিও।

ফলাফল অবর্ণনীয়। বেঁচে থেকে সে সবাইকে যন্ত্রণা দিয়েছে। এবার শূলে দেবার অজুহাতে গ্রামের সবাইকে পুলিস গ্রেপ্তার করল। ফলে, সে মরেও যন্ত্রণা দিয়ে গেল সবাইকে। ইংরেজ বিদায় হয়েছে, হবার আগে চরম লাঞ্ছনা তুলে দিয়ে গেছে ভারতের আপামর জনসাধারণের কাঁধে।

আমরাও কম নই।

অনভিজ্ঞ, দুর্নীতিপরায়ণ, আদর্শত্যাগী শাসকের হাতে পড়ে বলছি, ছমির শালা ছিল ভাল।

ছমির ছিল চোরের সেরা। সবাই তাকে ভয়ও করত, ভালও বাসত। চুরি সে করত ঠিকই—আবার চুরির ধন বিলিয়ে দিত গরীবদের। বললে বলত, কি করি কন, আমি দেই বলেই তো ওরা চুরি করে না। না দিলে সবাই যে চোর হবে, আপনাদের পুলিস বন্দুক দিয়ে রুখতে পারবেন কি?

এত বড় সমাজতত্ত্ব বলে ছমির হাসত হি-হি করে। সে ছমিরও মরল—মরবার আগে একমাত্র ওয়ারিস পুত্র সবুরকে উপদেশও দিয়ে গেল।

ছেলেও কম নয়। সে শুধু চুরিই করত না—আসবার সময় গেরেস্তের রান্নাঘরে মলমূত্র ত্যাগ করে আসত। এ চোরের অত্যাচারে সবাই অতিষ্ঠ।

সবাই বলতে থাকে, ছমির শালা ছিল ভাল।

পরলোকে বসে ছমির আনন্দিত হয়েছে কিনা জানি না, কিন্তু সাত হাজার মাইল দূরে বসে এ দুর্দশায় ইংরেজ মুচকি না হেসে পারছে না।

আমাদের পরিণতি এমনি ধারা হবে—তাও বুঝেছিলুম কারান্তরাল থেকেই।

লড়াইয়ের পর ইংরেজদের কদম রাখবার স্থান রইল না। মণ্ডলের ঘরে আগুন লেগেছে, সে আলোকে রাতের খাওয়া শেষ করতে সবাই ব্যস্ত। ইংরেজের দেওয়া নির্যাতন হল মূলধন। উপোসী রুগীর সামনে সুখাদ্য, পাকাশয়ের পীড়া অনিবার্য। হয়েছেও তাই। জবাইনন্দ প্রোগ্রাম তৈরি করতে বসে গেল, বিশুই বা কম কি! আমি আবার বাংলার নই। তাই আমার অনুপস্থিতিটা অনেক ক্ষেত্রে রুচিকর। এখানে জন্ম নিল ভবিষ্যৎ ভারতের দুর্ভাগ্যের ইতিহাস। জাহান্নমে গেল জনতার মুক্তি।

বারো রাজপুতের তেরো উনুন তৈরী হল। কচকচানি আরম্ভ হল পাওয়ার পলিটিকসের। কেউ ন্যাশনালিজম্, কেউ কমিউনিজম্, কেউ হিন্দুইজম্—কত কি 'ইজমে'র ব্যাখ্যা চলতে থাকে। কোন 'ইজম' নিল জন্ম, কোন 'ইজমে'র হল দ্বিজত্ব লাভ। যারা রাজনীতির 'ক-খ'-ও পড়ে নি, তারাও মুখস্থ বুলি আওড়ে 'দাদা' হবার রিহার্সেল দেয়। পরিণতি ভয়াবহ। ভারত বিভাগ—প্রাণ দিল লাখো লাখো লোক, ইজ্জত দিল হাজার হাজার মেয়ে, গৃহহীন হল কয়েক কোটি। স্বপ্নের স্বাধীনতা বীভৎসরূপে দেখা দিল।

শূন্য দেউলে যারা যুদ্ধের বাজারে মনসা পুজো করেছে, ধূপধুনো জেলেছে তারাই এগিয়ে এল—স্বাধীন দেশের প্রতিনিধি তারা, তারাই তো দেশপ্রেমিক। যারা করল ত্যাগ, তারাই তো বোকা। ত্যাগের জন্যই তো তাদের সৃষ্টি।

তুমিই কতদিন অনুযোগ করেছ ; করেছ নয়, করতে বাধ্য হয়েছ। শীর্ণ বুভুক্ষু সন্তানের দিকে চেয়ে দেখলে সব মা-ই পাগল হয়ে ওঠে। আমার মত অবাঞ্ছিত ব্যক্তির স্ত্রীর আরও পাওনা থাকে। লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপমান, গৃহবিতাড়ন। এ সবগুলো নীরবে সহ্য কর নি—নিষ্ফল প্রতিবাদে নিজেই ক্ষত-বিক্ষত হয়েছ। আমিও নিজের অযোগ্যতাকে অস্বীকার করি নি। আমি জানতুম দেশ একদিন স্বাধীন হবেই।

সেদিন আমাদের দুঃখ থাকবে না। দুঃখ শেষ হয় নি। আজও আমরা অনাহারী। মনে হয়, দেশ স্বাধীন হয় নি, নয়ত কেন চলবে অবিচার? যারা দেশের স্বাধীনতায় সর্বস্ব ত্যাগ করেছে—তারাই সৈনিক। সব দেশেই প্রাক্তন সৈনিকদের ভরণপোষণ করে দেশের সরকার। কিন্তু আমাদের দেশে যারা স্বাধীনতার পথে ছিল অন্তরায় তারাই আজ দেশের বিধাতা! আর যারা সারা জীবনের প্রাপ্য ও সঞ্চয় স্বাধীনতালাভের যজ্ঞে আহুতি দিয়েছিল তারা রইল উপেক্ষিত এবং অনাদৃত। নিয়তির চরম পরিহাস!

*

এলুম বাইরে, দেখলুম নূতন জগৎ।

একদিকে দুর্ভিক্ষ-মহামারীতে ধ্বংস হয়েছে বাংলার পল্লীসমাজ—অন্যদিকে কালোবাজারী দৌলত জম্‌জমা। জনতা মুমূর্ষু, মনুষ্যত্ব পদদলিত, নারীত্ব বিভ্রান্ত। স্বদেশে ভিখারী বাঙালী সার দিয়ে চলেছে। হত্যাকারী চলেছে ঝাণ্ডা উঁচিয়ে! এরাই ছিল আজাদীর দুশমন, এরাই আজ আজাদীর ধারক আর বাহক। বাইরের জগৎটা ঘোলাটে হয়ে উঠেছে।

তারপর চলল রক্তস্নান! কায়েমী স্বার্থের দেওয়া মন্ত্রে বাঙালী করল লড়াই—নিজের ঘরে, নিজের ভাইয়ের বুকে কশাইয়ের মত ছুরি বসিয়ে। যে বাংলা সারা ভারতকে জাতীয়তা শিখিয়েছিল, সে বাংলাকে আজ কে বোঝাবে ভ্রাতৃহত্যার শোচনীয় পরিণাম!

তমসাবৃত রাতে গোপন পথে ভিক্ষাপাত্রে বর্ষিত হল ইংরেজের করুণা। ক্ষমতার মোহ ত্যাগীকে ভোগধর্মে প্রলুব্ধ করল। সারা বিশ্ব জানল, আমরা স্বাধীনতা পেলাম। সমাজের জরাজীর্ণ অট্টালিকায় চুনকলি ফেরানো হল, নব জীবনের স্বপ্ন চূর্ণ হয়ে গেল। ভাইয়ের বক্ষরক্ত পান করে পুরস্কৃত হলাম। চোখ বুঁজেই উদ্দাম নৃত্য করলাম, ভবিষ্যৎ রইল আঁধারিয়া রাতের বিভীষিকা হয়ে।

তবুও ইংরেজ সত্যি সত্যিই ভারত ছাড়ল, ছাড়ল শুধু শাসনক্ষমতা।

আজ আমরা স্বাধীন!

কলকাতার ফুটপাতে আজ স্বাধীনতা যেন ফেটে ছড়িয়ে পড়ছে। কোথায় কে পর্ণকুটীরে অনাহারে রয়েছে, তার খবর নেবার অবসর কোথায়? সুচেতো উদাত্ত কণ্ঠে বন্দে মাতরম্ গাইল, কেল্লায় ঝাণ্ডা বদল হল। সাদার স্থানে কালো এল। সবই হল, পেট ত ভরে না।

রাত্রিনাথের সঙ্গে দেখা। থাকে হোটেলে—তপশীলী বলে কর্মসংগ্রহ মন্দ হয় নি। অনাহারী রাত্রিনাথ আজ আহার যোগাচ্ছে। বেতারে বাণী দিচ্ছে, পত্রিকায় ছবি ছাপাচ্ছে। বইও লেখে।

রাত্রিনাথ বললে, সকাল সাতটার আগে যেন তার কাছে যাই।

যাওয়া হল না। পেলুম তার চিঠি।

অবশেষে একদিন গেলুম।

দরজাতে বাধা দিল দ্বাররক্ষী। বচসা শুরু হল। রাত্রিনাথের কেউ বন্ধু থাকতে পারে, তা সে বিশ্বাস করে না। রাত্রিনাথ এল বেরিয়ে।

—আরে তুমি যে! এস, এস।

বললুম, ডেকে এনে গলাধাক্কা না দিলে কি হত না?

—দোষ ওর নয়। কমিউনিস্টদের অত্যাচারে এ ব্যবস্থা। কে ভালো, কে মন্দ, কেমন ক'রে জানবে!

বসলুম গিয়ে তার ঘরে। কথা দু-চারটে—কিন্তু বসতে হল অনেকক্ষণ। এর মধ্যে কম করে চল্লিশজন এল চাকরির উমেদারি করতে। তার মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই বেশি।

রাত্রিনাথ দ্বাররক্ষককে ডেকে উপদেশ দিল, West Bengal হলে আসতে দেবে। E. B. হলে আটকাবে।

আমি বললুম মানে?

—মায়ে তাড়ানো, বাপে-খেদানো বাঙালগুলোর জ্বালায় পারছি না।

—কিন্তু তোমরাই ত প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেশ ভাগ করেছিলে।

— না করে উপায় তো ছিল না। যেমন অবস্থা তেমন ব্যবস্থা।

কতকগুলো মেয়েকে আমি চিনতুম, বললুম, মেয়েদের অনেকগুলো তো বাঙাল?

—বোঝ না, ladies first.

চুপ করে বসে রইলুম। চাকরি দেবার selection list তৈরি করে বললে, দেখ তো ঠিক হয়েছে কি না?

আমি বললুম, তুমি—বললে রাগ করবে, তবুও বলছি। যখন list তৈরি করছিলে, তখনই দেখেছি, তোমার selection—bad selection. যোগ্যতাকে মূল্য না দিয়ে, তুমি লক্ষ্য রেখেছ মেয়ে আর West Bengal. বাংলাকে বাংলা হিসেবে চিন্তা করতে এক বছরের মধ্যে ভুলে যাবে একথা ভাবতে পারি নি। এটা রাজনীতি, না যৌননীতি, না, মনুষ্যনীতি—তা বোঝা দুষ্কর।

রাত্রিনাথ দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হল। অপমানিতও হয়েছে সে। তার মত ক্ষমতাশালী লোককে স্পষ্ট মত দেওয়া সে বরদাস্ত করতে পারে নি। আমি বুঝলুম, দলীয় রাজনীতিতে অযোগ্য ব্যক্তিকে উচ্চপদে বসালে—দলের অবমাননাই হয়। দলের শীর্ষে যারা বসে রয়েছে তারা যত শীঘ্র এই সাধারণ ধর্ম শিখতে পারে ততই মঙ্গল।

কথার মোড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, তারপর তুমি কি করছ ?

—কিছুই না।

—একটা কাজ নেবে ?

—আপত্তি কি !

খসখস করে একখানা কাগজে লিখল, 'পত্রবাহক আমার লোক, একে যেন কাজ দেওয়া হয়।' কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে তুললুম। বললুম, আমার কাজ এত সহজে যদি সংগ্রহ হয়, তা হলে যারা এল তাদের কাজের কি কোন ব্যবস্থা হতে পারে না ?

আমার ব্যঙ্গ এতক্ষণে সে বুঝল। আমি বললুম, অনাহারী রাত্রিনাথকে একদিন আমিই আশ্রয় দিয়েছিলুম, আজও সে অভিমান আমার কমে নি। আজ আমি অনাহারী হলেও সমানের মর্যাদা আমার প্রাপ্য—তোমার কৃপার দাসত্ব নয়।

এর পরও বহুবার রাত্রিনাথের পত্র পেয়েছি—দেখা করবার অবসর পাই নি, পেলেও ঘৃণায় যেতে ইচ্ছা হয় নি।

আমার ত্যাগের কি দাম, কি দাম তোমার পনেরো বছরের কষ্টসহিষ্ণুতার ?

আমার সৃষ্টি অন্যের চলার পথ তৈরি করতে—তাতে ত্রুটি হয় নি এক বিন্দুও।

আমাদের অপমানিত লাঞ্ছিত মনুষ্যত্ব যেন কেঁদে ওঠে না—তা হলে ভবিষ্যৎ জাতি অভিশপ্ত হবে। হারাবে তারা আমাদের সঞ্চিত ধন—এ দুশমনের আজাদী।

চিঠির পর চিঠি লিখে চলেছি। সমস্যাই বেশী—সমাধান কোথায় ? আজ যেন balance রাখতে পারছি না। বিশ বছরের ছোট ছোট ঘটনা, দেশ-

বিদেশের কথা। সবগুলো একত্র করলে পাবে একটি কথা 'লাঞ্ছনা'—এ হল আমার জীবনের ইতিকথা।

কলকাতায় পেট চলে না।

বাড়িতে ফিরলুম সুদীর্ঘ ছবছর পর।

বাড়ির অবস্থা আমার চেয়েও শোচনীয়।

কয়েকজন অভ্যাগত স্থান করেছে সেখানে। বিনা নোটিসে মালিকের আগমনে তারা চঞ্চল হয়ে উঠল। চামচিকেরা কিচমিচ করে উড়তে থাকে, আরশুলারা ফুড়ুত ফুড়ুত করে দৌড়তে থাকে। বিষধররা মুষিক-গহ্বরে স্থান করে নিল। গৃহস্বামীর উপস্থিতি প্রীতিকর না হলেও, তাদের স্থান পরিবর্তন অপরিহার্য।

দরজার ফাঁক দিয়ে কতদিন আগে বৈষ্ণবের নামাবলীর মত ছাপমারা একখানা লেফাফা কে যেন ফেলে গেছে—প্রাপকের মত জীর্ণ শীর্ণ তার অবস্থা। ইংরেজীতে পাকা হাতে শিরোনামা লেখা। ডাকঘরের মোহর দেখে মনে হল—আগমনকাল বৎসরাধিক পূর্বে।

চালের বাতায় চিঠিখানা গুঁজে, গৃহসংস্কারে মন দিলুম।

বিকেলে চিঠিখানার কথা মনে পড়ল। তারই ভাবার্থ :

"সবিনয় নিবেদনমেতদ্‌,

"আপনার চিঠি সময়মত পেয়েছিলুম। পত্র প্রাপ্তি আর আমার প্রত্যাবর্তন একই দিনের ঘটনা। সেজন্য ইচ্ছে হলেও উত্তর দেওয়া ঘটে নি। আপনার মুখে দেশের নাম শুনেছিলুম—তাও জ্বরের ঘোরে। সে ঠিকানা মনে করে পত্র দিচ্ছি। অনেক ইতস্ততঃ করে ডাইরেক্টরী দেখে এ চিঠি লিখলুম। চিঠি পৌছুলে যেমন খুশী হব—তেমনি খুশী হব বিলম্ব মার্জনা করলে।

"কোয়েটার সব বিক্রি-সিক্রি করে এলুম কলকাতায়। আপনার রোগশয্যায় বসে ভাবতুম, রোগী কত অসহায়—কত পরমুখাপেক্ষী। আপন করে নেবার মত পর না জুটলে কত-না এদের কষ্ট। ঠিক করলুম—কষ্ট-মোচনের ধর্ম আমার। তাই সংগ্রহ করেছি নার্সের কাজ। শিক্ষা সমাপ্ত করে কলেজ-হাসপাতালে আছি।

"ভ্রান্ত রুচির পরিবর্তন এল। মাতৃত্বে রুচি নেই। যেখানে নারীত্বের বিকাশ নেই, সেখানে মাতৃত্ব অভিশপ্ত। তাই মহৎ আদর্শের পায়ের তলায় নিজেকে বিছিয়ে দিয়েছি, বিলিয়ে দিয়েছি অকুণ্ঠভাবে। আজ আমি সুখী!

"এ সুখও সইবে না। যারা দিল্লীর লাড্ডুর স্বপ্ন দেখে তাদের সংখ্যা কম নয়;

আবার কপট লাজ্জ্ জ্ঞাপনকারীর সংখ্যাও যথেষ্ট। এরা শিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপমারা। তবু রুচির কোন বালাই নেই। বিচারবুদ্ধি শুদ্ধ। অধ্যবসায় এদের অনিন্দনীয়; শুক্‌নো হাসিতে আপ্যায়ন এদের নিত্যকার কাজ, এদের নাকি-স্বরের 'নোমোস্‌কার' দেবদুর্লভ! দাড়ি না উঠলেও ক্ষুর রেহাই পায় না। মেয়েলী ঢংএর ন্যাকামি—অদৃশ্য শত্রুর ওপর বীরত্ব প্রদর্শন মামুলি ধারায় চলে আসছে।

"মেয়েরা যদি মুখ খোলে তবেই বিপদ। মাথাটা কাত করে অভিনন্দন জানানোই যথেষ্ট। হেসেছে কি মরেছে। ভারসাম্য তখন আর থাকে না। অঙ্গের নড়ন-চড়ন control করাই এখানে মেয়েদের কাজ।

"Top list-এ এসেছে বরেন। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। সাহস তার বেশি। হঠাৎ একদিন বাসায় এসে হাজির। অভ্যর্থনা জানালুম, চা দিলুম। পুরানো প্রেমকথা শুনতে ভালো লাগে না। তাকে কিছু বলতে না দিয়েই বিদায় দিলুম। বললুম, আসবেন সময় হলে।

"না বললেও, সে আসত।

"পরদিন হাসপাতালে গিয়ে বুঝতে দেরী হল না, বরেন তার adventure কাহিনী রসাল করে সালঙ্কারে প্রচার করছে বন্ধু-মহলে। ফলে, মুচকি হাসি আর টিটকারি সহ্য করতে হল।

"সেই দিনই বিকেলে এল বরেন। আমি বললুম, আমায় বিয়ে করে ঘরে নিতে পারেন?

"কেন পারব না। অনেক সামর্থ্য সংগ্রহ করে সে জবাব দিল।

"আপনার বাবা মা যদি গ্রহণ না করেন?

"করবেন নিশ্চয়ই!

"করলুম তর্কাতর্কি। স্বীকার করল অজ্ঞাতকুলশীলাকে গ্রহণ করা তার পিতার পক্ষে সহজ নয়। পিতার অধিকারকে অস্বীকার করলেও, পিতার অর্থকে অস্বীকার করা অসম্ভব। তাদের মনে দুঃখ দিয়ে সর্বস্বান্ত হওয়া তার কল্পনার বাইরে। বললুম, তবুও অষ্টম এডওয়ার্ড হতে চান? ওটা ভারতীয় আদর্শ নয়—ভারতের আদর্শ স্ত্রী ত্যাগ! তার চেয়ে আমার নিঃসঙ্গ জীবনে একটা ভাইয়ের প্রয়োজন আছে, আজ থেকে আমরা দুজন ভাই-বোন। আমি দিদি—আর আপনি আমার ছোট ভাই বরেন।

"নভেলের গল্প নয়—তা হলে দিদি বলে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করত। কিন্তু তার জিব গেল শুকিয়ে, বাস্তবের কঠিন আঘাত সহ্য করাও কঠিন। কাল

সারারাত হয়তো তার ঘুম হয় নি। কল্পনায় যাকে শয্যাসঙ্গিনী করেছে তাকে ছিছি বলতে সে পারল না।

"তার পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। দেখা হয়েছে, কথা কয় নি। মুচকি হাসি ফচ্‌কে ছেলেদের ঠোঁটে দেখা যায় না। আহা, ভদ্রলোক ওরা!

"অতীতকে গোপন করে চলেছি—তবু ভুলতে পারছি না। মাঝে মাঝে মুষ্‌ড়ে পড়ি। শক্তি সংগ্রহ করি আপনার কথা ভেবে। আগের কালে দিদিমারা নারায়ণশিলাকে পতি নির্বাচন করতে বলত কুমারী নাতনীদের। সেকেলে এ-রীতি আজ নেই। থাকলে ভাল হত। আদর্শ দেয় শান্তি। জয়-পরাজয় গণনীয় নয়। কামনা হয় কেন্দ্রীভূত, থাকে না লেনদেনের সমস্যা—সমাধানও সহজ হয় সর্বক্ষেত্রে।

"শেষ সময়ে মিনতি জানাচ্ছি, ছন্নছাড়া জীবনটাকে আয়ত্তে আনুন, বাঁধুন একটা ঘর—একি সম্ভব নয়?—"

ঠাস বুনানি গেঞ্জীর মত লেখা—কলমে নিবের বদলে বুঝি ভোঁতা সরু ছুঁচ ব্যবহার করেছে। অনেকদিন পরে প্রভার চিঠি পেয়ে অনেকটা প্রশান্তি লাভ হল। তার চিঠিখানা দুবার উলটেপালটে পড়লুম। জয়ের আনন্দ নেই ওতে। প্রতিহিংসার একটা গোপন রূপ যেন উঁকি দিচ্ছে ওর তলায়।

তোমাকে আর বিনয়কে চিঠি দিলাম। প্রভাকে লেখা আর হল না। চিঠির উত্তর এল না।

দক্ষিণ থেকে এলে তুমি, পশ্চিম থেকে এল বিনয়।

তোমাকে বুঝিয়ে দিলাম ঘর-সংসার আর পতিভক্তির definition—কানের দুল-জোড়া যা বাকী আছে, সেইটে দিয়ে এবার পতিসেবা করতে হবে।

বিনয় এসেই তার চিরাচরিত লেকচার শুরু করলে। দেশ, জাতি, স্বাধীনতা, আদর্শ, ত্যাগ, নির্যাতন can be found in the Dictionary of fools.

এ foolishness আমার একচেটিয়া, সেজন্য তাকে বললুম তোর কথা বল, অন্যের কথা শুনতে চাই না।

সে বললে, যথা পূর্বং তথা পরম্‌। দায়ও নেই দায়িত্বও নেই। রঙীন দিনগুলো কাটিয়েছি শুক্‌নো গলায়—এখন আর সা-রে-গা-মা করতে পারছি না। সেদিন যদি Price সাহেবের কথা শুনতুম। সাহেবের বাচ্চা বড়ই practical, বিয়ে করলেই রেহাই দেবে বলে শপথ করলে। তার advice-টা নিলে আজ এত কষ্ট হত না। Price বদলী হয়ে নূতন পুলিস-সাহেব এল, এসেই মার-মূর্তি। 'কি

করি' একটা ভাবও ছিল—ছু-একটা বান্ধবীকে টোকা দিয়েও দেখছিলুম। অবশেষে সব ভেস্তে দিল বাঁড়ুজ্যেশালা। হপ্তায় আবার তিনদিন হাজরে দিতে লাগলুম।

—এবার ক্যাম্পে দেখলুম না কেন? ছিলি কোথায়?

—আমেদাবাদের ডাইনিং টেবিলে চাকরি নিয়েছিলুম। বুঝলি না? যুদ্ধের বাজার, সাহেবরা কাগজ আর ছাপাখানা পকেটে নিয়ে ঘুরছিল। দরকার হলেই খচাংখচ বেরিয়ে এল তাজা আনকোরা নোট এক ছুই দশ একশো। আমি ফাঁক পড়ি কেন? চীনাদের আরশোলা আর মরা ইঁদুরের contract খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলুম Jail-এর ration contract। জেলে গেলে আর কি হত? যারা গুলী খেয়ে, না খেয়ে মরল, তাদের পোড়াবার কাঠ দিলুম, যারা জখম হল, তাদের দিলুম ব্যাণ্ডেজের কাপড়, যারা নেহাত খেয়ে-বাঁচতে জেলে গেল, তাদের দিলুন খাবার। এর পরই স্বশরীরে স্বর্গবাস। অর্থাৎ আধপোড়া মড়ার আশীর্বাদে, ডাস্টবিন-কুড়ানো কাপড়ের দৌলতে, কুমড়োর ঘ্যাঁট আর বাগান চচ্চড়ির মহিমায় ব্যাঙ্কে কিছু জমে গেল। ভাবছি, আবার কবে আলুর গুদামটা পুড়বে!

বললুম, ছুর্দিনকে এভাবে মূলধন করে নিতে পারলি?

কেন পারব না? প্রথমটা বাধ বাধ লেগেছিল, পরে রূপোর রূপ দেখে আদর্শের মৃত্যুশোক ভুলে গেলুম। মা ভুলে যায় পুত্রশোক, আমি ত কোন্ ছার! আদর্শের মুখোশটা এঁটে পরতে পারলেই কেল্লা ফতে। সাইক্লিক রেভল্যুশান্। একই ব্যক্তি সন্তান, ভ্রাতা, পিতা, অভিভাবক ইত্যাদির চরিত্র অভিনয় করে চলছে। সে একই ব্যক্তি—দেশের ছুর্দিনে কেঁদেছি, আবার দেশের ছুর্দিনে হেসেছি, পয়সা সংগ্রহ করেছি। তোর মতন বৌ-ছেলেকে শুকিয়ে রেখে আদর্শবান হই নি বটে, কিন্তু বাজারে তোর চেয়ে আমার দাম অনেক বেশি।

এটা সাইক্লিক রেভল্যুশান্ নয়, জীবনের প্রতি ব্যভিচার।

হতেই হবে। মানুষ যখন বুঝতে পারে ভোগ্যবস্তুর অভাব নেই ভোগের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, তখন সে পাগলা কুকুরের মত কামড়াতে চায়। Animality wins over rationality. এইটেই সহজ সত্য, তাই জীবনের প্রতি ব্যভিচার ঘটলেও আপসোস করবার মত কিচ্ছু নেই।

এ বুঝি তোর কর্ম?

আরও আছে। ক্রমশ প্রকাশ্য। বর্তমানে একজন Rice Agent-এর সঙ্গে কথা পাকাপাকি হয়েছে। এক মণে একপো হিসেবে পাথর-গুঁড়ো supply

দিতে হবে। বছরে এক লাখ মণ চাল সে সরকারী গুদামে তুলে দেয়। তা হলে সোয়া ছশো মণ পাথর-গুঁড়ো দরকার। সাত টাকা দর। খরচ-খরচা বাদে হাজার দুয়েক থাকবে। চাল পাস করিয়ে নিতে তাকেও নজরানা দিতে হবে তো! তাতে বিশেষ কিছু তার থাকবে না, খুব জোর হাজার দুয়েক। এর পর যাব মাদ্রাজে। তেঁতুল বীচি সংগ্রহ করতে—আটা তো খাওয়াতে হবে।

—সর্বনাশ!

—মোটেই নয়। জনসংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে খাবার সে অনুপাতে নেই। জনসংখ্যা কমাতে হবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে, তা না হলে Three hundred two-তে যেতে হবে যে। জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও হচ্ছে, আর হচ্ছে সব ভেজালের ব্যবস্থা। দশ বছরে ত্রিশ পারসেণ্ট আউটপুট। সরকারী খাতায় লেখা হবে 'Reason for death—Cholera, T. B., Pox, Typhoid, Apendicitis'; কোথাও লেখা হবে না famine, starvation. পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নজীর আর থাকবে না। শিউরে উঠছিস যে? অমরকে মনে আছে, যে গাঁজার দোকানে পিকেটিং করে শুধু শুধু জেল খাটত? সে জেল থেকে উকীল হয়ে এল। এখন সে দিব্যি শেয়াল-মামা। Modern Rule-এ Struggle for Existence মেনে চলেছে।

—শেয়াল-মামার কাহিনীটা কি?

অমরের ভাগ্নে Sales-Tax Inspector, আর অমর Sales-Tax-এর উকীল। ভাগ্নে মক্কেল পাকড়াল, মামা পাঠাল দালাল। চুক্তি হল Inspector-বাবুকে কিছু দক্ষিণা দিয়ে হিসাব পাস করাতে হবে। মিথ্যা হিসাব বানাল বিকানিরী-শালকরা, ভাগ্নে পাস করলেন, মামা ঘুষ আর দক্ষিণা দুটো নিয়ে এলেন। তার পর দশ আনা ছআনা। দিব্যি বউ-ছেলে নিয়ে আছে তারা—প্লেনে দিল্লী যাচ্ছে, যাচ্ছে পুরী, ওয়ালটেয়ার। আর উভয়েই শ্বশুরকুল প্রতিপালক। ক'দিন পরেই দেখবে, অমর হয়েছে এম.এল.এ, ভাগ্নে হয়েছে মস্ত বড় অফিসার। মুখে তাদের গান্ধীবাদ আর নানারকম আদর্শ। মন্ত্রিত্বটাও বাদ যাবে না নিশ্চয়ই।

—কিন্তু লজ্জা না থাকুক ওদের, জেলের ভয়ও-তো আছে। পড়বে পুলিসের হাতে।

—পড়বে ঠিকই, জেলে যাবে না। পুলিস তো আর পরমহংসের মানসপুত্র নয়! এসব কাজ করা ওদের অভ্যাস আছে—আর থাকবেও। নতুন করে ঘর বাঁধতে হবে আর কি! ওরাই বাস্তববাদী আর সত্যের পূজক। আদর্শের ভণ্ডামিগুলো ছাড় দেখি। এখনও সময় আছে। দু-চারটে পারমিট লাইসেন্স এখনও হাতাতে পারবি। নইলে দগ্ধ কদলী ভক্ষণ চলবে সারা জীবন।

পরের কথা তোমার সামনেই হয়েছে, সেকথা লিখবার প্রয়োজন দেখি না।

বিশ বছরের বিশৃঙ্খল ঘটনাগুলো যতটা পারি সামঞ্জস্য রেখে, ছেঁড়া ডায়েরীর পাতা খুঁজে বলে চলেছি। এক-একজনের কথা যখনই মনে হয়, তখনই সে ঘটনার চেয়ে তার মানসিক বিস্তৃতিকে বেশি করে ভেবেছি। ভাবুকতা এসেছে। স্বপ্নের স্বাধীনতাকে বাস্তব রূপে দেখি নি বলে জ্বালা ধরেছে। পার্থিব ধর্মে আমি পরাজিত, আর এ পরাজয় আমার মত সবাইকে আচ্ছন্ন করবে আগামী দিনে। ভারত থেকে হাজার মাইল দূরে বসে, সব সময় একই চিন্তা অভিভূত করে—সুখে-শান্তিতে কি ইহজীবনে ঘর বাঁধতে পারব না ?

পারব না বলেই বিশ্বাস জন্মেছে !

একটা বছর পেরিয়ে গেল। শুভেচ্ছা বিনে কিছু নেই। পরস্পরের এই সম্পদ আর সান্ত্বনা।

আগামী বছর আবার লিখব।

ব্যাঙ্কক—৭।১১।৫১

দুই

উড়োজাহাজ মাটিতে নামতেই কোম্পানীর মোটর ভ্যান এসে সামনে দাঁড়াল। জাহাজ থেকে গাড়ি বোঝাই দিয়ে একেবারে কাস্টমসের হাজতে। চার-পাঁচ ঘণ্টা কানের কাছে ভট্-ভটানি শব্দ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি, এইটেই লাভ। উড়োজাহাজে গতি আছে, সুবিধে আছে, কিন্তু শান্তি নেই। যেমন ভয় কল বিগড়াবার, তেমনি ভয় অসহ্য শব্দের। পেঁটরার মধ্যে মাল বোঝাই দিয়ে যেমন ঢাকনা এঁটে দিই, তেমন ধারা জাহাজের মধ্যে মানুষ বোঝাই দিয়ে ঢাকনা আটকে দেওয়া হল। আকাশ যদি পরিষ্কার তো বহুত আচ্ছা, নয়তো বারোভাজার মত জাহাজের লাফ-ঝাঁপে (Diving) জগাখিচুড়ি হতে হয়।

আজকের জাহাজের যাত্রী কম। তিন-চার হাজার ফুট ওপরে উঠতেই বেশ শীত অনুভব হল। পাশাপাশি দুটো সিট জুড়ে একখানা কম্বল জড়িয়ে শুয়ে পড়লুম। অবশ্য কম্বলখানা আমার নয়; কোম্পানীর। তারাই এই ব্যবস্থা রাখে। শেষরাতের ঘুমটা নষ্ট করে এসেছি, সেজন্য শুতে শুতেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হলুম, ঘুম আসছিল না কেবল ঐ শব্দের জ্বালায়। আকাশপথে একজন অতিথিসেবী অথবা সেবিকা থাকেন। পাকিস্তানের জাহাজে সেবিকা ছিলেন না, সেবক ছিলেন। আমায় ডেকে তুলে, কতকগুলো স্যাণ্ডউইচ্, আর এক কাপ কফি খেতে দিলেন; একটুখানি তুলোও দিলেন কান বন্ধ রাখতে।

কয়েক লক্ষ মাইল ট্রেনে, জাহাজে, মোটরে চলাচল করেছি, আবার উড়োজাহাজেও চলছি। সে সব যাত্রার তুলনায় উড়োজাহাজের যাত্রায় একটু নূতনত্ব আছে।

লাহোর থেকে আসছিলুম ক'বছর আগে, সঙ্গী ছিলেন একজন বাঙালী ভদ্রলোক সপরিবারে। ধীরে ধীরে আলাপ জমিয়ে কানপুর অবধি এক সঙ্গেই এসেছিলুম। তাঁদের দিক থেকে আমার সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপনের যেমন চেষ্টা, তেমন আমার দিক থেকেও। জল নেই, ছুটে জল এনে দিলুম। কোথায় চা, কোথায় খাবার, তার জন্য আমরা উভয় পক্ষই ব্যস্ত। আবার জাহাজেও ঘর-বাড়ি-সংসার পেতে বসতে হয়। পাঁচ দিনের রাস্তা পঁচিশ দিন হতে কতক্ষণ। মামা, মাসি, পিসি, দাদা, দিদি পাতিয়ে রাস্তা চলার অভ্যাস হয়ে গেছে।

কিন্তু উড়োজাহাজে, সবাই যেন নিজের নিজের আভিজাত্য নিয়ে ব্যস্ত। কেউ ঠোঁট খোলে না, এমন কি চেয়েও দেখে না পাশের যাত্রীটিকে। হয়তো ট্রেন-

জাহাজের আত্মীয়তা মাটিতে পা দিলেই শেষ। ক'দিনের আপ্যায়ন, চিঠি লিখবার অনুরোধ—এ সবই মানুষ জমিতে পা দিয়েই ভুলে যায়, কিন্তু ঐ সাময়িক অনাত্মীয়ের সংসার পাতান যেন কত মধুর। হৃদ্যতাটুকু ভোলা যায় না বহুদিন উড়োজাহাজে ওসব বালাই নেই—সবই উড়ো-উড়ো ভাব।

চট্টগ্রামে ক'খানা বিস্কুট আর একপাত্র চা গলাধঃকরণ করে—বাইরের দিকে চেয়ে বসেছিলুম, ওয়েটার এসে জানাল, জাহাজ ছাড়বার সময় হয়েছে।

আবার পেঁটরায় নিজেকে ভর্তি করলুম।

এবার যেন ভট্-ভটানি খানিকটা সয়ে এসেছে। জানালা দিয়ে নীচের দুনিয়াকে দেখতে চেষ্টা করছিলুম। প্রায় সবাইকে দেখলুম, ওপরে উঠে আর নীচের দিকে তাকায় না। সবাই খবরের কাগজ অথবা আমেরিকান চীপ ম্যাগাজিন দেখতে ব্যস্ত। উপরে যারা ওঠে তারা এমনি ধারাই, নীচে তাকাবার অবসর পায় না। দৃষ্টিটা নীচের দিকে থাকলে নীচের তলার লোকদের একটু সুবিধে হয় বই কি!

সেদিন আকাশটা ছিল মেঘভর্তি। কিছুটা পথ গিয়েই জাহাজ লাল আলো জেলে হুঁশিয়ার করে দিল—বেল্ট বাঁধ। আমি বেল্ট না বেঁধে শুয়ে পড়লুম। মেঘের আড়ালে রাস্তা দেখতে না পেয়ে জাহাজ নাচানাচি শুরু করে দিল। সামনে ঠেলে নীচে নাবছে, আবার ঠেলে ওপরে উঠছে। কখনও বা হাজার ফুট কখনও বা ছ হাজার ফুট। ঝাঁকুনির চোটে একজন তো বমি শুরু করে দিল। পেছনে আর র‍্যাকে যেসব মাল ছিল, সেগুলো হুমড়ি খেয়ে গায়ের উপর ছড়িয়ে পড়তে লাগল। একটা সুটকেস পড়ে একজনের তো কপালই কেটে গেল।

আমি আবার উঠে বসলুম। নীচের পৃথিবীতে তখন অজস্রধারায় বৃষ্টি পড়ছে। যখনই জাহাজ নীচে আসে তখনই দেখা যায় গাছপালাগুলো ঝড়ে আর বৃষ্টিতে দুম্ড়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ বাদে বৃষ্টি বন্ধ হলেও ওপরের আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। জাহাজ খুব নীচু দিয়ে চলতে থাকে। মনে হচ্ছিল হাত বাড়ালে বোধহয় নীচের গাছগুলো ধরা যায়।

কিছুক্ষণের মধ্যে আবার রোদ দেখা দিল, বৃষ্টির কোন চিহ্নই নীচের পৃথিবীতে দেখা যায় না। শিলং-এ যেমন দেখেছ রোদ আর মেঘের খেলা, এও তেমনি। যতক্ষণ বৃষ্টি ততক্ষণ দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখ, নয়তো মেঘ ঢুকে সব কিছু ভিজিয়ে দেবে। আবার মেঘ সরে রোদ উঠতেই যেন জলের চিহ্নও দেখা যায় না।

এতক্ষণ জমির ওপর দিয়ে জাহাজ যাচ্ছিল। এবার সমুদ্রের দেখা মিলল। জাহাজ তখন অনেক উঁচুতে। ছেলেদের কাগজের নৌকোর মত সুনীল সমুদ্রের বুকে জাহাজগুলো দেখা যাচ্ছিল। বর্ষার পর জমিতে যেমন ঢেউ খেলানো পলি

পড়ে, তেমন মনে হচ্ছিল সমুদ্রের চেহারাটা। ওপর থেকে সমুদ্রের চেহারায় নীলত্ব বোঝা যায় না, মনে হয়, গঙ্গার জলের মত ঘোলা। অবশ্য তখন বৃষ্টি শুরু হয়েছিল, সে সময় কিনারা থেকে চার-পাঁচ মাইল সমুদ্রের জল ঘোলাটেই থাকে। যেখানে সমুদ্রের গভীরতা বেশি, সেখানে নীল রং এত বেশি যে অনেকটা কালো মনে হয়। যতই জলের রং ফিকে হয়ে আসে, ততই বুঝতে হবে জলের গভীরতা কমে আসছে।

হাজতে এসেও নিষ্কৃতি নেই। ডাক্তার! তাঁর কার্য সই করা। বিদেশ যাবার আগে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে Medical certificate নিতে হয়। সেটি দেখাতে হয় প্রথম। এই সার্টিফিকেটগুলো পৃথিবীর সর্বত্র বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। আবার এগুলো বিক্রি করেন, সভ্যতার অভিজাত শ্রেণী সরকারী ও পৌর প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসকগণ যাদের সার্টিফিকেট বলে তাজা মানুষকেও অনেক সময় মড়া বলে কবর দেওয়া হয়। সমাজ ও দেশসেবী এইসব ব্যক্তি, লোভের বশবর্তী হয়ে নিজেদের মর্যাদাও বিক্রি করে থাকেন। আমিও কলকাতা থেকে কিনেছিলুম এরকম সার্টিফিকেট। সই করলেন ডাক্তার সাহেব।

তারপর পুলিস। এঁদের কাজও সই করা! উপরি হিসাবে বিদেশীর খাতায় নাম লেখা এঁদের কাজ।

তারপর ইমিগ্রেশন, এঁদের কাজও সই করা।

শেষ বেলায় কাস্টমস। এঁরা তল্লাশী করেন। সব জিনিসপত্র, এমন কি স্থানবিশেষেও তল্লাশী করতে কসুর করেন না। এঁদের সারা দেশটায় এই কাস্ট-মাসির তল্লাশী সবচেয়ে মজার ব্যাপার। বাঁ হাতে চোরাই মাল রাখ, আর ডান হাতে দক্ষিণা, ওমনি কাস্ট-মাসি ছাড়পত্র দিলেন। ব্যস্।

এর পর শুরু দাতব্য!

কোথাও চাঁদা, কোথাও চা-পানের খরচা, কোথাও ঘুষ। দিতেই হবে। না হলে তুমি থাকতে পারবে না সে দেশে। অসুবিধা সৃষ্টি হবে পদে পদে। যতদিন রইবে ততদিন মুঠো ভর্তি রাখবে। শুনেছি, ভারতীয় আর চীনাদের ওপরই জুলুম বেশী। বাস্তবক্ষেত্রে যে না দেখেছি, তা নয়।

এর পর শুরু ট্যাক্স। চা খাবে এক কাপ—দাও ট্যাক্স! হোটেলে খাবে—দাও ট্যাক্স। অর্থাৎ বিনা ট্যাক্সে এক পা নড়বার উপায় নেই। দিতে না চাইলে, শুকিয়ে মরবে।

উড়োজাহাজে প্রথম উঠবার যে উত্তেজনা সে দেশের মাটিতে পা দিতে দিতে তা জল হয়ে গেল। দ্বারে দ্বারে দ্বারী দক্ষিণার জন্য হাত বাড়িয়েই রয়েছে।

এই ব্যবস্থা শুধু এই বর্মা দেশে নয়। পৃথিবীর সব দেশেই এই ব্যবস্থা। অবশ্য দেশটা হওয়া চাই ধনতন্ত্রবাদী। ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের অবস্থা এর চেয়েও কম ন্যক্কারজনক নয়। পার্থক্য, ওদেশে সোজা পকেট থেকে পয়সা তুলে নেয়, আর এরা ভয় দেখিয়ে নেয়।

আগে মনে করতুম ভারতবর্ষই বুঝি ঘুষের রাজ্য। সে ধারণা বর্মা, শ্যাম প্রভৃতি দেশে গিয়ে অনেকটা লোপ পেল। তবে ভারতীয় কাস্টমসের ব্যবহার অতি নীচ শ্রেণীর, আর ওদেশে সোজাপথে ঘুষ নেয় বলে ব্যবহারটা তত রূঢ় নয়।

বারান্তরে ভারতীয় কাস্টমসের কথা বলব।

সেবারে তোমায় প্রায় তিন সপ্তাহ কোন পত্র লিখতে পারি নি। তুমি খুব ব্যস্ত হয়ে দুখানা টেলিগ্রাম করে বসেছিলে।

চিঠি না লিখবার কারণ, আমি বর্মায় ছিলুম না।

রাষ্ট্রদূতের অফিস থেকে যখন চীনে যাবার পাসপোর্ট দিলে না, তখন কেমন একটা একগুঁয়েমি পেয়ে বসল, যেমন করে হোক চীনে যেতেই হবে।

শীগ্‌গীর রাস্তাও বের করলুম।

ভামো থেকে সোজাপথে না এসে ধীরে ধীরে পাহাড়-জঙ্গল ভেঙে চীনে প্রবেশ করা যায়। এই ধারটা দক্ষিণা দিয়ে পার হওয়া যায়, মুস্কিল ওধারটায়।

আবার এই ধারটার পাহাড়-জঙ্গলে ভয় বেশী, খুনী আর ডাকাতের আড্ডা চারিদিকে। সারা বর্মায় সাক্ষাৎভাবে কোন সভ্য রাষ্ট্রব্যবস্থা নেই। বর্মার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গভর্নমেণ্ট শুধু কয়েকটি বড় বড় শহরে ফৌজ পরিবৃত হয়ে শাসন চালাচ্ছে। শহরের বাইরে অথবা ছোট ছোট শহরে এই গভর্নমেণ্ট অকেজো। বর্মার দুই-তৃতীয়াংশের অধিক বিদ্রোহীদের হাতে। সেজন্য অসামরিক শাসনব্যবস্থা নেই বললে অত্যুক্তি করা হয় না। শান্তি-রক্ষকরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অশান্তির বাহক। সেই কারণে শাসনব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্লেদ। ইংরেজ আর আমেরিকার সাহায্যপুষ্ট এই শাসকমণ্ডলী জঙ্গী শাসন চালাতে চায়, কিন্তু দরিদ্র জনতা এই সরকারের পৃষ্ঠপোষক নয়। অনেক সময় ছুটকো-ছাটকা দু-একটা খবর যা বাইরে আসে তাতে গুরুত্ব দেবার অনেক কারণ আছে।

যা হোক, চীনে যাবার একটা উন্মাদনা যখন ব্যাকুল করে তুলল, তখন উড়োজাহাজের টিকিট কেটে বসলুম, ভামো পর্যন্ত।

ভামো থেকে কয়েক মাইলের ভেতরই চীনের য়ুনান সীমান্ত।

এই ক'মাইল যাবার সুযোগ খুঁজতে খুঁজতেই দুদিন কেটে গেল। বর্মা সরকারের এমন ক্ষমতা অথবা ব্যবস্থা নেই যে, সীমান্ত বন্ধ রাখে; তবে ভয় কেবল খুনী, ডাকাত আর বন্য জন্তুর।

সেদিন খবর পেলুম, এখানে কয়েক দল লোক আছে, যারা চীনের সঙ্গে চোরা-কারবার চালায়। দলে বর্মী, চীনা, ভারতীয়, সবাই আছে। এই সব বেইমানদের সাহচর্য বিনা যাওয়া অসম্ভব না হলেও, নিরাপদ নয়। ওরা পথঘাট চেনে, সীমান্তের গ্রামে ওদের শক্ত ঘাঁটিও রয়েছে। ওদের দলে ভিড়তে চেষ্টা করলুম, কিন্তু ওরা আমায় বিশ্বাস করলে না। শেষ পর্যন্ত ওদের পেছন পেছন যাওয়ার সিদ্ধান্ত করলুম: মহাজনের পথই আমার পথ।

কয়েক মাইল পাকা রাস্তা চলার পর দোপায়া বনপথে এসে পড়লুম। গহন বন। কোথাও কোথাও সূর্যের আলো পর্যন্ত প্রবেশ করতে পায় না। উঁচু-নীচু পাহাড়ের গা ঘিরে রাস্তা চলেছে সর্পিল গতিতে। নিস্তব্ধতা যেমন ভয়ানক তেমনি রহস্যময়। সবুজ-সবুজ ঝোপ, শুক্‌নো পাতার মচ-মচানি আর পাখিদের কিচ-মিচানি,—এই কেবল দর্শনীয় আর শ্রবণযোগ্য। লাল হলদে সাদা ফুলের ঝোপও আছে আশেপাশে। কোথাও বা ছোট পাহাড়ী ঝরনা তরতর করে বয়ে চলেছে। পায়ের পাতা ভেজানো জল পোরোতে হয় দু-এক মাইল পর পর। বনের রূপ যেন ফেটে পড়েছে। মাঝে মাঝে নিজের পায়ের শব্দে চমকে উঠছিলুম: নয়তো এমন কেউ নেই, যাকে দেখে চমকাতে হয়। যেমন নিঃসঙ্গ, তেমন গম্ভীর নিস্তব্ধতা! বনের পথে চলতে চলতে কিছু দূরে একটা গ্রাম দেখতে পেলুম। ঠিক গ্রাম বলতে আমরা যা বুঝি তা নয়, ছ-সাতখানা ঝুপড়ির সমষ্টি মাত্র। ভামো থেকে বেরিয়ে এই পর্যন্ত দু-তিনখানা গ্রাম মাত্র নজরে পড়েছে। পনেরো ষোলো মাইলে আমাদের দেশে আট-দশখানা গ্রাম দেখাও সম্ভব। বর্মার এই অংশে জনসংখ্যা অত্যধিক কম। ইরাবতীর উপত্যকায় জনসংখ্যার অনুপাত বেশি।

আর একদিন চলতে পারলে চীন সীমান্ত পেরিয়ে যেতে পারি।

আজকের মত এই গ্রামের কাছাকাছি রাত্রিযাপন শ্রেয়ঃ মনে করলুম। বনের অন্ধকার যেন ক্রমশ পাতলা হয়ে এসেছে। গ্রাম থেকে আধ মাইলটেক দূরে শক্ত দেখে একটা সেগুন গাছ ঠিক করলুম, তার ওপর রাত্রিবাস কারাই নিরাপদ। আসবার সময় দুদিনকার মত খাবার নিয়ে এসেছিলুম—একটু জল সংগ্রহ করলেই চলে।

পাশেই যখন গ্রাম, নিশ্চয়ই কোথাও ঝরনা আছে। ধুঁয়ো যেমন আগুনের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে, তেমনি গ্রামও জানায় জলের অস্তিত্ব। আদিম কাল থেকে মানুষ গোষ্ঠী বেঁধে বাস করছে। গোষ্ঠীর সুখ-সুবিধা দেখা তাদের প্রধান কাজ। কোথায় জল, কোথায় চষবার মাঠ, কোথায় জ্বালানি—এ সব সুবিধা দেখেই তারা বাসস্থান নির্দেশ করেছে। সেই বাসস্থানকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে সভ্যতার জন্ম হয়েছে।

তোপচাঁচি থেকে সারা ঝরিয়ায় কয়লার খনিতে জল সরবরাহ করা হচ্ছে। এই পঁচিশ-ত্রিশ মাইলের ব্যবধানকে বিশ্বাস করে আজকের দিনের মানুষ কাজকর্ম করে বেঁচে থাকে, কিন্তু দুশো বছর আগেও লোক দু মাইলের ভরসায় থাকত না। বাঁচবার উপকরণগুলো হাতের কাছে রাখা চাই। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পাতের কাছে যখন বেড়ালের ভীড় হয়, তখন টুকরো পাটশোলা নিয়ে বসে থাকলেই, পাতের মাছ-দুধ রক্ষা করা যায়। তেমনি ধারা আজকের দিনে ঘরে একটি বালতি আর বাইরে জলের নল থাকলেই জীবন রক্ষা করবার দায়িত্ব লাঘব হয়—রক্ষা করাও যায়।

সভ্যতাটা বর্মাদেশের নীচু জমিতে যেভাবে শেকড় গেড়ে বসেছে, সেভাবে পাহাড়ী এলাকায় পারে নি। বর্মীরা অনেকটা প্রগতির সঙ্গে সমানে পা ফেলে চললেও, শান, মন, ছীন, কাছিন—এরা অতটা এগোতে পারে নি। সভ্যতার কুফল বর্মী সমাজে গুটিরোগের মত দেখা দিলেও, পার্বত্য অঞ্চলে এর বিন্দুমাত্র আভাস দেখা যায় না। ছোট ছোট শহর অঞ্চলে, অন্তত 'ফাসাফালা'র এলাকায় (থাকিন্ নু সরকার) যেটুকুও বা আছে,—কমিউনিস্ট এলাকায় তাও নেই। সভ্যতা-রূপ মারণ অস্ত্র, বর্মা কেন, ইরানে, শ্যামে, মালয়ে, যেখানে গেছি, সেখানেই নিজ রাজ্য স্থাপন করেছে। একদিকে যেমন কঠিন দারিদ্র্য, যেমন নৈতিক শিথিলতা, অন্যদিকে তেমন মুষ্টিমেয় ব্যক্তির প্রাচুর্য আর নৈতিক অবনতি। বর্মায় পার্থক্য রয়েছে ফাসাফালা আর কমিউনিস্ট এলাকায়। প্রথমটায় একদিকে ধনীদের পীঠস্থান আর বিলাস ও নীতিহীনতার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ, অপরদিকে দারিদ্র্যের বীভৎস রূপ, সেখানে সবাই পরমুখাপেক্ষী; আর শেষেরটায় দারিদ্র্য থাকলেও নীতিবোধ আর স্বাবলম্বনের উচ্চমান লক্ষ্য করা যায়।

অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয়। সাধারণ অবস্থা যতটুকু জানা যায় সেইটুকু বলছি, স্থানান্তরে বিশদভাবে এদেশের কথা বলব। বর্তমান প্রসঙ্গ চীন।

যে-গাছটায় রাত কাটাব স্থির করেছিলুম, সেটার নিরাপত্তা সম্বন্ধে আমার কোনই সন্দেহ ছিল না। তোমার বোধহয় স্মরণ আছে, যখন গারো পাহাড়ে আস্তানা করেছিলুম, তখন একদিন হাতির উৎপাতে পড়ে জীবন সংশয় হয়েছিল আর কি! যেখানে পাহাড়ের কিনারায় ধানের ক্ষেত, সেখানেই বিপদ বেশি। দল বেঁধে হাতিরা কচি ধান খেতে আসে, খেয়েই তাদের সুখ শেষ হয় না। গড়াগড়ি করে ধানের চারার বারোটা বাজিয়ে দিয়ে যায়। এইজন্য উঁচু শালগাছের মাথায় গারোরা মাচাং বেঁধে বাস করে। এতে নিরাপত্তাও যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে হাতি-খেদানোর সুবিধে। সময় সময় বিপদও ঘটে। কোন সময় বা মাচাং-এর ওপরকার ঝুপড়ি থেকে পাকা আমের মত টুপ করে শিশুরা নীচেও পড়ে যায়। এই ব্যবস্থায় কিন্তু তারা অখুশী নয়।

আমি গ্রাম থেকে এবং চাষের জমি থেকে কিছুটা দূরেই স্থান নির্বাচন করেছিলুম। নিরাপদে রাত কাটলেও, ঘুমুতে পারি নি মশা আর পোকার উৎপাতে।

আবার সকাল বেলায় পথ চলা আরম্ভ হল।

কয়েক মাইল চলবার পর একটা ঝরনার পাশে বসে খেয়ে নিলুম। কাল সারাদিন স্নান হয় নি, শরীরে জ্বলুনি ধরেছে। ঝরনায় স্নান করবার লোভ সামলাতে পারলুম না। আজকের স্নান আরামদায়ক না হলেও, স্নান করবার জন্যই বিপদে পড়তে হল। কাল সারারাত ঘুমুই নি, ভরাপেটে স্নানের আরামে আলস্য বোধ করতে লাগলুম। খোলা একটা জায়গায় সূর্যকে আড়াল দিয়ে বড় একটা পাথরে হেলান দিয়ে বসতে না বসতে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লুম।

দুপুরের শেষ দিকটায়, ধাক্কাধাক্কিতে ঘুম ভেঙে গেল।

দুজন বর্মী পুলিস বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ঠেলা দিচ্ছে। তাদের পোশাক আর বন্দুক তাদের পুলিস বলে জানাতে বিভ্রম ঘটায় নি।

আমি উঠে দাঁড়াতেই তারা তল্লাশী শুরু করলে। তল্লাশীর নামে আমার যা-কিছু ছিল সব হাতিয়ে নিজেদের পকেটে পুরল। তারপর তারা জিজ্ঞেসও করল না, কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি,—সোজা রাস্তায় তারা ফিরে গেল।

একেবারে নিঃস্ব ওরা করতে পারে নি। আগেই জানতুম, চোর-ডাকাতের

উৎপাত বেশি। সেজন্তই শার্টের কলারের নীচে বড় একখানা ভারতীয় নোট সেলাই করে রেখেছিলুম।

বর্মায় বর্মী-টাকার চেয়ে ভারতীয় টাকার দাম ও কদর বেশি। বর্মী-টাকা যদি অচলও হয়, ভারতীয় টাকার মার নেই। অবশ্য সরকারী ভাবে ভারতীয় ও বর্মী টাকার মূল্যমান সমান।

যাক, প্রাণে যে মারে নি—এইটে সৌভাগ্য।

বেলা গড়িয়ে এসেছে, বড় জোর তিন-চার মাইল চলা সম্ভব। সামান্ত ঘুমের জন্ত আজ বর্মা সীমান্তে পৌছাতে তো পারলুমই না, উপরন্তু সুখদণ্ডও দিলুম।

সে রাতটাও গাছে বসে কাটাতে হল।

পরের দিন সকালের প্রথম প্রহরেই বর্মার জমি ছেড়ে চীনের মাটিতে পা দিলুম। আর মাইল ছয়েক গেলেই আসল চীন।

পাহাড়গুলোয় কোন পথ নেই। খানিকটা চলবার পর আবার নীচে নামতে হচ্ছে। খাড়া পাহাড়গুলো পেরোবার কোন উপায় নেই। অনেক ঘুরে ঘুরে যখন সমতলে এলুম, তখন বেলা গড়িয়ে গেছে। সকাল বেলায় ছোট ছোট পাহাড়গুলোর মাথা থেকে নীচের গ্রামগুলো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলুম, অথচ পৌছাতে পারছিলুম না।

বর্মার মত চীন সীমান্ত অরক্ষিত নয়। প্রত্যেক পাঁচ মাইল পর পর ছোট ছোট পাহারাঘাঁটি। সৈন্যরাও ঘুরছে, পিঠে তাদের বেতারযন্ত্র বাঁধা। নতুন কিছু দেখলেই তারা নিকটবর্তী ঘাঁটিতে সংবাদ পাঠায়।

আমি কিছুটা পথ চলবার পরই সৈন্যরা আটক করলে। মনে করলুম, বর্মী পুলিসদের মত কিছু দক্ষিণা নিয়ে এরাও সরে পড়বে। আকার-ইঙ্গিতে ইচ্ছাটা জানাতেই তারা রেগে লাল।

আমার বেকুবির জন্ত আমি দায়ী। কোন উচ্চবাচ্য না করে তাদের নির্দেশে নিকটবর্তী ঘাঁটিতে চলতে বাধ্য হলুম।

অফিসারটি ভদ্রলোক। ইংরেজীনবীশ।

অনেক প্রশ্ন করলেন। সত্যি কথা সবগুলো বললুম।

শেষে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি কোন পার্টি থেকে এসেছেন? বললুম, না।

তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, তবে কি করে বিশ্বাস করব, আপনি গুপ্তচর নন?

—সে তো আপনার ইচ্ছে। অন্তত আমার হাবভাব দেখে—অথবা নজরবন্দী রেখেও দেখতে পারেন।

—এমন তো হতে পারে আপনি ফেরারী—criminal absconder.

আমি নিরুপায় হয়ে বললুম, সন্দেহ যখন থাকে, তখন দৃষ্টিও দুষ্ট কার্য-কারণের পথে চলে। ভালোর চেয়ে মন্দের দিকে চিন্তার গতি চলতে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে নিজের অপরাধকে স্বীকার করে নিয়ে বলছি, যা শাস্তি দেবার দিন, কিন্তু তার আগে আপনাদের দেশের কমপক্ষে দুটো শহর আর দশটা গ্রাম দেখতে দিন। দেশে ফিরে লোককে বলতে পারব, আজকের চীনের অবস্থা।

—দেশে ফিরবার আশা রাখেন ? জানেন, গুপ্তচরের শাস্তি মৃত্যু।

—তাতে আপত্তি নেই, বিপদের ঝুঁকি নিয়েই ত এসেছি। বর্মী ডাকাতদের হাতে প্রাণ না দিয়ে, বিচারালয়ের বিচারে প্রাণ দিলে, মৃত্যুর বিভীষিকা অনেকটা কমবে।

চীনা ভাষায় তারা সবাই যেন কি বলাবলি করলে, তার পর অফিসারটি বললে, স্তালুইন নদীর এপারে চলতে ফিরতে পাবেন, তাও সাতদিন মাত্র। তারপর আপনাকে বর্মা সীমান্তে আমার লোক গিয়ে পৌঁছে দেবে। আর বাইরে যেখানেই যান, আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে আবার এই ঘাঁটিতে ফিরে আসতে হবে।

আজ উনিশশো একান্ন সালের নভেম্বর।

আজ থেকে পনেরো বছর পিছিয়ে তাকিয়ে দেখতে পেলুম, ভোট সীমান্তে বাংলার শেষ কোণায় একটা পুলিস-থানায় বন্দী এক কিশোর।

চারদিকে জঙ্গল—দূরে চা-বাগান—খরস্রোতা পার্বত্য নদীর ত্রিভুজাকার স্থানে বসে কিশোরমনের স্বপ্নভরা দিনগুলো নিঃসঙ্গ আর উপেক্ষিত ভাবে কেটে যাচ্ছে!

সেদিন এমনি গণ্ডীর ভিতর বসে ক্লান্ত মনকে চাঙ্গা করতুম পাশের ছোট খালটায় ছিপ ফেলে ফাতনার দিকে চেয়ে চেয়ে। চারিদিকের দুনিয়ায় পরিবর্তন হত, হত না কেবল কিশোরমনের। থানায় বেশীরভাগ আসত চা-বাগানের ইংরেজ আর কুলীরা। জঙ্গলী গ্রামের মেচ্‌ আর রাভারা কচিৎ কখনও আসত। কখনও কখনও আসত দু-একটা ভুটিয়া।

এদের সঙ্গে কথা কইতে পেতুম না, তবে শুনতুম ওদের কাহিনী। কেউ কেউ আমায় দারোগাবাবুর ছেলে মনে করে কাকুতি-মিনতিও করত।

ম্যালেরিয়া ছিল নিত্যসঙ্গী।

কুইনিন খেতে খেতে হয়রান হয়ে যেতুম। কান, মাথা করত ভোঁ ভোঁ। সামনের সব জিনিসই ফাঁকা ফাঁকা মনে হত।

একদিন এল এক মুণ্ডা সর্দার। ছোটনাগপুরের পাহাড়ী। কয়েক পুরুষ আগে এসেছে। এই দেশটা তার আপনার দেশ।

তার সঙ্গে ছিল বছর কুড়ির একটি মেয়ে—তার সারা কাপড়ে রক্ত মাখা।

মেয়েটির নাম মঞ্জু।

মঞ্জু বলতে থাকে তার কাহিনী।

ছোট সাহেবের ঘরে সে করত কাজ। বেতন পেত মাসে দশ আনা। খাবার পেত হপ্তা হিসেবে চাল আর ডাল।

ছোট সাহেবের মেম সন্তানপ্রসবের জন্য গিয়েছে শিলং পাহাড়ে।

ছোট সাহেব তো আর স্বামীজী নয়। মঞ্জু-র রূপ না থাকলেও যৌবনটাও তো কম নয়! ছোট সাহেবের Temporary গৃহিণী তাকে হতেই হবে।

তার রয়েছে স্বামী,—বাপ তার গুটাই সরদার—ঐ বুড়োটা।

বাপকে বলে, স্বামীকে বলে।

স্বামী চুপ করে থাকে। ছোট সাহেবের নজরে তার বউ যখন পড়েছে, তখন তার সরদার হতে বেশি দিন লাগবে না। বাপ কিন্তু সইতে রাজী নয়। হাজার হোক বাপ, বাপ হয়ে মেয়েকে কুকর্ম করতে বলে কি করে?

তার পর যা হয়। জোর করে সাহেব দখল করে মঞ্জুকে।

গত রাতে চলতে থাকে ধস্তাধস্তি। মেয়েছেলে পারবে কেন?—সাহেবও চালায় চাবুক। মারের চোটে পিঠ তার ফেটে গেছে—রক্ত ঝরতে থাকে তার সারা শরীর বেয়ে। সাহেবও এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। সারারাত তার ওপর চলেছে পাশবিক অত্যাচার। মঞ্জু কাঁদতে থাকে।

দারোগার পা চেপে ধরে সে কেঁদে বলে,—দোরংগাবাবু তোমরা মোক্ বাঁচান।

শিক্ষিত ভদ্র সন্তান দারোগা: এই বর্বরতায় তার মন প্রশ্রয় দেয় না সত্য, কিন্তু ইংরেজের আইনে পাপীকে শাস্তি দেওয়াও দুষ্কর।

তিনি বললেন, দেখ, তোরা সাক্ষী পাবি না, তোদের কেস ফেঁসে যাবে। তার চেয়ে তোরা অন্য বাগানে পালিয়ে যা, না হয় দেশে ফিরে যা।

আমি উত্তেজিত হয়ে বললুম, তা হলে এদের বিচার হবে না?

—হবে, তবে অভিনয় হবে। আপনাকে কোন্ বিচারে এখানে রাখা হয়েছে? যাদের রাজ্য তারা বিচারের নামে অবিচার করছে, আর তাদের বিচার কে করবে! এরা নালিশ করছে। আইন অনুযায়ী এখনই সাহেবকে গ্রেপ্তার করতে হবে। গ্রেপ্তার করেছি কি মরেছি! পুলিস সাহেবের D. O. আর U. O.-র ঠেলায় চাকরি রাখা দায় হবে, চাকরি যদিও থাকে, ঠেলে পাঠাবে তেরাই অঞ্চলে। আর

এই হতভাগাদের নামে কালকেই আসবে চুরির কেস, ফলে এদের আটক করতেই হবে। এদের সপরিবারে না খেয়ে মরতে হবে। তার চেয়ে 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি'—সেইটে কি ভাল নয়!

ভালোমন্দ বিচার করবার অধিকার আমার নেই, যুক্তি দিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার মত মানসিক উৎকর্ষতাও সেদিন ছিল না। অবিচার ও অত্যাচারের যূপকাষ্ঠে অসহায় মানুষকে বলি দিয়ে ক্ষমতাবান মানুষ যে আদর্শ স্থাপন করে চলেছে, তার সমাপ্তি যে দূরে নয়, এ বিশ্বাস নিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। বিশ্বাসটুকু হল সান্ত্বনা, কিন্তু নির্যাতিত পেল বিচারহীন উপেক্ষা। অক্ষমতাকে সম্বল করে উঠে এসে বসলাম নিজের পিঁজরায়। রুদ্ধ আক্রোশে হৃদ্‌পিণ্ড চঞ্চল হয়ে উঠল, অস্থির আবেগ জয় করতে গা এলিয়ে দিলাম সরকার-প্রদত্ত ছেঁড়া কম্বলখানায়।

গুটাই সরদার আর মজু ফিরে গিয়েছিল। হয়তো রাত থেকে পাকাপাকি-ভাবে সে সাহেবের বাংলোয় আশ্রয় পেয়েছে। আবার যখন তার মেমসাহেব আসবে, অথবা ভোগের যোগ্যতা সে হারাবে, তখন লাথি মেরে তাকে দূর করে দেবে।

নজরবন্দী জীবনে দেখবে শুনবে, কথা কইবে না।

সেদিন পাহাড়ের তলায় বসে যে চিত্র দেখতুম, তাতে অত্যাচার আর ব্যভিচার ভিন্ন কিছু ছিল না। চীনের চিত্র ঠিক তার উলটো। সবই দেখবার আর শুনবার অধিকার তারা আমায় দিয়েছিল।

প্রথম দিনই অফিসার আমায় বলেছিল,—যা দেখবেন, যা শুনবেন তার কদর্থ করবেন না। সোজাভাবে ঘটনাগুলোই দেশের লোককে বলবেন।

চীনের সীমান্তবর্তী বর্মার এই প্রদেশ থেকে আমেরিকার বহু মাল চোরাই পথে আসে। বর্মায় থাকতেই একথা শুনেছি ও চোরাকারবারীর দলকেও দেখেছি। চীনের রাষ্ট্রপতিরা এই চোরাই কারবার পরোক্ষে অথবা অপরোক্ষে অনুমোদন করেন কিনা জানবার ইচ্ছে ছিল।

চীনের সাম্যবাদ ও বর্তমান উন্নতি পৃথিবীর কোন দেশের মুখের দিকে চেয়ে থাকবার অবসর দেয় না। চীন স্বাবলম্বী। তা হলে এ মালগুলো আসে কেন, আর কেমন করে? পুলিস ও সামরিক পাহারাকে ফাঁকি দেয় কি করে!

সেদিন শহরে গিয়েছিলুম। পাশেই ছোট তাইপিং নদী। নদী ঠিক নয়, কোন নদীর শাখা। সাদা চকচক করছে জল, নীচের বালুকণাও দেখা যায়।

রাতের বাসে আবার ফিরতে হবে। হোটেল দেখে খেতে গেলুম।

আমার সামনে বসে একজন চীনা ভদ্রলোক খাচ্ছিলেন।

খেতে খেতে মাঝে মাঝে very bad বলে চিৎকার করছিলেন।

ভাবলুম, তিনি ইংরেজী জানেন, তাঁর সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছুক হয়ে উৎসুক ভাবে বললুম, What is very bad ?

কথায় কথা বাড়ে।

গল্প চলতে থাকে।

তিনি বললেন, আমাদের এ জায়গাটা রাজধানী থেকে বহু দূরে। সেজন্য অনেক অসুবিধা। চীনকে ভালোভাবে দেখতে হলে, উত্তর দেশটা বেড়িয়ে আসুন।

—এ দেশটার কি সব রকম উন্নতি হয় নি ?

—হয়েছে, তবে ধনিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোকের সংখ্যা এদিকে খুব বেশী। চিয়াং-এর গুপ্তচরও আছে এদেশে। এই দেখুন না, আমাদের এই স্বাবলম্বী দেশে চোরাই মাল আসছে আমেরিকা থেকে! আমি যা খুঁজছিলুম তাই পেয়ে গেছি। বললুম, কেন আসে ?

—ঐ যে বললুম, এখনও কতকগুলো বদমাস আছে, যারা গরীবকে লুটে খেতে চায়। তারাই বিলাসদ্রব্যের চোরাকারবারীদের স্রষ্টা। ধরাও পড়েছে, দুটো-একটার ফাঁসিও হচ্ছে, তবুও চলছে এই কারবার। তবে কমেছে।

আমি বললুম, মাল আসে কি করে ?

—ওহো, আপনি দেখছি কচি খোকা। পৃথিবীতে চোরের জাত সবচেয়ে বুদ্ধিমান। চোর ধরবার একটা ফাঁদ তৈরি করতে না করতেই তারা আর একট রাস্তা দিয়ে গলিয়ে যায়। ওরা করে কি জানেন, বর্মা সীমানায় ছোট একটা দোকান রাখে, আবার চীন সীমানায় একটা। যেমন সুযোগ পাওয়া, অমনি দু-তিন মাইল পথ মাল হটিয়ে দেয়। শুধু এ-দোকান থেকে ও-দোকান। ব্যস্।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, আপনি এসব জানলেন কি করে ?

—আমি ইনটেলিজেন্স বিভাগের কর্মচারী।

—আপনাদের ইনটেলিজেন্স বিভাগের কি কাজ ?

—সমাজদ্রোহীদের ধরা।

আমি জিজ্ঞেস করলুম উদ্‌গ্রীবভাবে, রাজনৈতিক কিছু ?

এদেশে একটি রাজনীতি আছে, অন্য নীতি মানতে পার কিন্তু দেশের ক্ষতিজনক কিছু করতে পাবে না। সহজ কথায় আমাদের কাজ চোর ধরা —গলাবাজীকে ধরা নয়।

ভদ্রলোকের নাম লুং। কাণ্টনী। য়ুনানে অনেকদিন আছেন। এদেশের ভাষা জানেন। চীনদেশে সবাই কিন্তু একই চীনা ভাষায় কথা বলে না। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, সবদিকেই ভাষার পার্থক্য রয়েছে—ব্যাকরণেরও। সাধারণত, কাণ্টনী ভাষা সবাই কিছু কিছু বোঝে। য়ুনানীদের কাছে মুকদেনী ভাষা অবোধ্য।

রাতের বেলায় সীমান্তে এলুম।

নাংপাং থেকে একজোড়া জুতো কিনলুম সোয়া J. M. T. (চীনের নূতন মুদ্রা) দিয়ে।

কিছুদিন আগেও চীনে একজোড়া জুতোর দাম ছিল হাজার ডলার। যে জুতোর দাম কুওমিণ্টাং রাজত্বকালে ছিল সাড়ে তিন শত টাকা, তার দাম হয়েছে সোয়া তিন টাকা মাত্র! কথাটা শুনে হাসবে। জাপান বর্মা জয় করেই কাগজী টাকা ছাড়ল। টাকা এতই ছোড়াছুড়ি আরম্ভ হল যে, এক বস্তা চালের দাম দাঁড়াল দশ হাজার টাকা, যা ইংরেজের টাকায় কিছুদিন পরেও পঁচিশ থেকে ত্রিশ টাকায় বিকোতে থাকে।

চীনের গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত সবই চরম। সেজন্য জুতো পায়ে দেওয়া সেখানে ফ্যাসান নয়, প্রয়োজন। অথচ সাড়ে তিন শত টাকা দিয়ে জুতো কেনবার মুরোদ ক'জনের থাকে! লোকের দুঃখকষ্ট অসম্ভব বেড়ে গিয়েছিল। বেশির ভাগ লোক তথাগত আর পূর্বপুরুষদের দোহাই দিয়ে ভাগ্য মেনে নিয়েছিল। অত্যাচার ও অবিচার মেনে নিতে হলে পৌরুষকে অস্বীকার করতে হয়, প্রদীপ্ত পৌরুষ প্রতিবাদ জানায়, অত্যাচারী আর অবিচারীর দল তার কণ্ঠরোধ করতে চায় নারকীয় কার্যকলাপ দিয়ে। তাই মানুষ ভণ্ডকে প্রাধান্য দিয়ে বিনা প্রতিবাদে সবল ও অর্থবানদের নির্যাতন সহ্য করে। চীনের সেকালের মানুষও তাই মানতে ও সহ্য করতে বাধ্য হয়েছিল।

লুংলিং ছোট শহর। গত যুদ্ধে শহরটা বিধ্বস্ত হয়েছিল কিছুটা। শহরটা কর্মব্যস্ত। সকাল বেলায় একবাটি ভাত খেয়ে মেয়ে-পুরুষ সবাই কাজে বেরিয়ে পড়ল। কেউ যায় অফিস, কেউ যায় কলে, কেউ যায় ক্ষেতে। কর্মের যেন

স্রোত বয়ে চলেছে। কোথাও ঝগড়া নেই, বিবাদ নেই, আর নেই চোরের ভয়। চোর-ডাকাত বিনা চীনকে চিন্তা করাও যেত না। লাল রাজ্যে লাল ফিতে বাঁধা চোর-ডাকাত সব ক্ষেত-মজুরের কাজে ছুটেছে। বসে থাকলে খেতে পাবে না। সরকারের হিসেব রয়েছে। শিক্ষা সমাপ্ত হলেই, তোমায় কাজে বের হতে হবে। কিন্তু কাজের তাড়নায় নয়, কেমন একটা নেশায় এরা বেরিয়ে যায়, সবাই দেশ গড়তে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী পরিশ্রম করে চলেছে।

শহরের শেষ কোণায় এক ফালি মাঠের ধারে বসে ছিলুম। একজন চাষীকে ডেকে কথা কইবার চেষ্টা করলুম, সে বুঝতে পারলে না, কিন্তু ইঙ্গিতে আমায় বসিয়ে রেখে গেল।

বেলার শেষে সূর্য অস্তগামী, অথচ সেই চাষী ফিরছে না।

ব্যস্ত হয়ে শহরের দিকে চলতে থাকি।

হঠাৎ পেছন থেকে হৈ হৈ শব্দ করতে করতে সেই চাষী এসে আমার সঙ্গ নিলে। আমায় সঙ্গে করে নিয়ে একটা হোটেলে বসাল, তারপর বসতে বলে সে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর একজন পঞ্জাবী শিখকে সঙ্গে করে আমার টেবিলে এসে বসল।

এই শিখ ভদ্রলোকের মাধ্যমে কথা চলতে থাকে।

সুরজিৎ সিং লড়াইয়ের সময় চীনে এসেছে আর দেশে ফেরে নি।

চাষী ভদ্রলোক ভারতের কথা জিজ্ঞেস করে, আমিও চীনের কথা জিজ্ঞেস করি।

সে বললে, আমার দেশে প্রতি একর জমিতে তিন হাজার কুটির ওপর ধান পাওয়া যায়। আগে দেড় থেকে দুহাজার কুটি পেতাম (এক কুটিতে সোয়া পাউণ্ড হয়)।

জিজ্ঞেস করলুম, হঠাৎ এত বেশি ধান কি করে বাড়ল ?

—আমরা একসঙ্গে দু-তিন হাজার একর জমি চষি, খরচা কম, জমির ছাঁট থাকে না, সার ও জলের ব্যবস্থা করে গভর্নমেণ্ট। প্রচুর ফসল হয়, তাও বছরে দুবার। ফসল ওঠবার সময় নিজের ভাগ মেপে নিয়ে ঘরের খাবার রেখে বাকিটা সরকারী গুদামে তুলে দেই। যখন ফসলের দাম বাড়ে, তখন চিট দেখিয়ে দাম নিই। আজকে ধানের দাম কম বলে মহাজন পাইকারদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হই না। সরকারী গুদামে জমা রইল, দাম বাড়লে বেশি পাব, নয়তো সরকারী ন্যায্য মূল্য পাব। জমির মালিক আমরা সবাই। ভূমিহীন

লোক সারা চীনে একজনও পাবেন না। যে চাষী, সেই জমির মালিক। যার পোষ্য বেশী, তার জমিও বেশী।

সমবায় প্রথায় চাষ ও বাজারের রক্ষা-ব্যবস্থা চীনের সর্বত্র। যদিও সীমান্তবর্তী সামান্য একটি জেলা দেখেছি, তবুও আবছা আবছা যে ধারণা সৃষ্টি হয়েছে, তা আমার এই সিদ্ধান্তের পরিপোষক।

চীনাদের আজ অভাব নেই—নেই কোন অভিযোগ। তারা আজ সুখী।

বাসের সময় হওয়ায় তাদের কাছে বিদায় চাইলুম।

তারা এসে আমায় বাসে তুলে দিয়ে গেল।

অনেক রাতে অফিসারটির বাসায় ফিরলুম।

তাঁব স্ত্রী খাবার নিয়ে বসে ছিলেন। টো (অফিসার) এসে টেবিলে বসল। তিনজনে খেতে খেতে গল্প করতে থাকি।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, তোমাদের দেশ থেকে চোর-ডাকাত গেল কোথায় ?

সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে বললে, ঐ মাঠে। আজকে বসে খেতে কেউ পাবে না। কাজ করতেই হবে।

—কাজ সবাই পায় কি করে ?

—কৃষি আর শিল্প কাজ দেয়! আমাদের দেশের সম্পদ কৃষি। আগেকার ভূমি-ব্যবস্থা বদলে এখন চাষীকে দেওয়া হচ্ছে জমির অধিকার: বড় বড় শিল্প-গুলো সরকার চালাচ্ছে, নয়তো সরকারের পরিদর্শনায় চলছে। কাজ পাবার অভাব কি, এত কাজ আছে কিন্তু লোক কোথায় ?

কদিন ওদের সঙ্গে বাস করায় ওরা একটু বিশ্বাস করেছে আমায়, সেই সাহসে আজ খাবার টেবিলে অনেক কথাই জিজ্ঞেস করতে থাকি।

—তোমাদের দেশে শুনছি মাসে বিশ-একুশ হাজার বিবাহ-বিচ্ছেদ হচ্ছে ?

—লোকসংখ্যার তুলনায় ও-সংখ্যাটা কিছুই নয়। পঞ্চাশ কোটি লোকের মধ্যে বছরে আড়াই-তিন লক্ষ বিবাহ-বিচ্ছেদ নগণ্য। সংখ্যা দেখেই ঘাবড়াবেন না, প্রথম দু-তিন বছর যে হারে বিবাহ-বিচ্ছেদ হচ্ছে, পরে তা হবে না। আমাদের দেশের ধনবান যারা ছিল, তাদের বহু-পত্নীত্ব অনিবার্য ছিল। মনে করুন, একজনের পাঁচটা স্ত্রী, এই পাঁচজনের চারজনই স্বামীর ঘর করতে চায় না, পয়সা দিয়ে কেনা মেয়েগুলোর কোন সামাজিক মর্যাদা তো ছিলই না,

উপরন্তু তারা ছিল মধ্যযুগীয় বাঁদী। আজ আইন করে পুরুষ-মেয়ের মর্যাদা স্বীকার করা হয়েছে সমান ভিত্তিতে। এইসব লাঞ্ছিত মেয়েরা এগিয়ে আসছে মুক্তি-আকাঙ্ক্ষায়। তাই বিবাহ-বিচ্ছেদের অঙ্কটা বড় হলেও, বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় এটা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

—মেয়েদের পোশাকে পুরুষের ভাব বেশী। মেয়েদের তাদের সহজাত বৃত্তি-গুলো নষ্ট করতে কেন দেওয়া হয়?

টৌ গিন্নী উত্তর দিলেন, মেয়ে-পুরুষের পোশাক একই রকম হওয়ার কারণ অর্থ নৈতিক। এমন কি, কাপড়ের রংটাও আমাদের ইচ্ছে মতন করবার উপায় নেই। দু-তিন রকমের যা রং, তাই আমরা ব্যবহার করি। আমাদের কাপড়ের খরচা কম, নানাভাবে রং-বেরং করে অনর্থক মজুর খরচ ও আভিজাত্য জাহির করা বন্ধ। কেরিয়ার যুদ্ধে আমাদের কত কাপড় দরকার। সে কাপড় তো বাইরের দুনিয়া দিচ্ছে না। আমাদের কলে যা হচ্ছে, তাই দিয়ে যুদ্ধ আর জনতা দুয়েরই চাহিদা মেটাতে হচ্ছে। আজকের দিনে চীনের প্রতিটি পুরুষ আর মেয়ে দুখানা পাত্‌লুন আর দুখানা কামিজ পাচ্ছে। কিছুদিন আগেও চীনের শতকরা নব্বই জন ছিল অর্ধ-উলঙ্গ।

টৌ গিন্নীর কথা শেষ হতে না হতেই টৌ বলতে থাকে, মেয়ে-পুরুষদের আমাদের দেশে এক সঙ্গে কাজ করতে হয়। এই ধরুন, বর্মীদের মত পোশাক পরে মেয়েরা যদি পুরুষদের পাশে দাঁড়ায়, তাতে কোনই কাজ হবে না, বরং ওতে যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি পাবে, সব কাজ পণ্ড হবে। স্বচ্ছন্দে চলবার ফেরবার মত যদি পোশাক-আশাক না থাকে, তাতে কর্মশক্তি নষ্ট হয়, যৌন লালসা বৃদ্ধি পায়। জাতীয় দুর্বলতা সৃষ্টি হয়।

আজ তাইপিং নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেদিন চকচকে ঝকঝকে দেখেছি, তাই আবার আজ নদীর ধারে গিয়ে বসলুম। সঙ্গি আমার ফুন্‌। ফুন্‌ বহুকাল আগে কলকাতায় ছিল। জুতোর কারখানায় কাজ করত। ক'বছর হল দেশে ফিরেছে। কলকাতা যাবার তার ইচ্ছা নেই। সে বললে, বাইরের অনেক চীনা অতি ইতর শ্রেণীর। তারা ঘরেরও না, বাইরেরও না। কলকাতার চীনারা সবাই যদি কলকাত্তাইয়া হত, তা হলে মানাতো। তারা না পারে বাঙালীদের সঙ্গে মিশতে, না পারে চীনাদের সঙ্গে মিশতে।

ফুন্‌ কিছু বাংলা জানে, বাটলারী ইংরেজীও জানে। ফৌজী সিগনালার।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, বর্মার সাম্যবাদীদের তোমরা সাহায্য কেন কর না? সে বললে, অতশত জানি না, মনে হয়, আমাদের সরকার অন্যের কাজে মাথা গলায় না

তবে কোন দিন যদি বর্মীরা ইংরেজ আর আমেরিকার কাছে দেশটা বিকিয়ে দেয়, তখন অবশ্য অন্য ব্যবস্থা হতে পারে। সাদা চামড়ার ঘাঁটি হলে, এশিয়া আর শান্তি, দুটোই বিপন্ন হবে।

আমি ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, জওহরলাল সম্বন্ধে তোমরা কি জান?

—Oh ! he is much respected !

—কেন? সে তো ধনতন্ত্রবাদী, পরোক্ষে আমেরিকার তাঁবেদার।

—তবুও স্বাধীনতা আর এশিয়ার শান্তির জন্য সে সম্মানিত।

—পাকিস্তান সম্বন্ধে কি জান?

—আমরা ও নিয়ে মাথা ঘামাই না। আমাদের দেশে কিছু লোক হয়তো পাকিস্তানের নাম শুনেছে মাত্র। কোথায় সে দেশ তাও হয়তো জানে না।

ফিরবার পথে ভাবতে ভাবতে আসছিলুম চীনদেশের উন্নতির কথা। আমাদের দেশের মেয়েদের কাপড় দরকার বছরে পঞ্চাশ গজ। ধনীর ঘরে পাওয়া যায় হাজার গজ; আর চীনের মেয়েদের পোশাক-কাপড় দরকার পঁচিশ গজ, ধনী বলে বেশি কিনবার অধিকার তোমার নেই। বেশি নিয়ে গরীবকে নিরাশ করেছ কি মরেছ।

কিছুটা পথ পায়ে হেঁটে আসছি—ফুন্‌কে বললুম, চল ঐ গ্রামটা দেখে আসি। ওমাং। পঞ্চাশ-ষাট ঘর বাসিন্দা। গ্রামের বাইরে কবরখানা। কবরখানাটা পাশ কাটিয়ে গ্রামে ঢুকলুম।

আমাদের উপস্থিতিটা কেউ লক্ষ্য করলে না।

পাঠশালায় মাদুর পেতে শিশুরা তুলি ধরে অক্ষর টানছে। ছোট একফালি তক্তায় সাদা রং মাখান, তার ওপর ভূষো কালিতে তারা লিখছে। মাস্টারমশাই উত্তর দেশের লোক। বসতে দিলেন।

ফুন্‌-এর মাধ্যমে কথাবার্তা জিজ্ঞেস করতে থাকি।

পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। দিনের বেলায় শিশুরা পড়ে, রাত্রে আসে বয়স্করা। পড়ান হয় সাহিত্য, ব্যাকরণ, ভূগোল, গণিত, প্রাথমিক বিজ্ঞান আর ইতিহাস। প্রথম দুবছর সাহিত্য-ব্যাকরণ পড়ান হয়, পরের দুবছর সাহিত্যের সঙ্গে ভূগোল আর গণিত। একবছর সাহিত্যের সঙ্গে ইতিহাস আর বিজ্ঞান। দুজন শিক্ষক রয়েছেন। তাঁরাই সব পড়ান। নীচের শ্রেণীর ছাত্র উঁচু শ্রেণীতে উঠলে তাদের বইগুলো নূতন ছাত্রদের দেওয়া হয়, তবে বেশীর ভাগ বই দেয় গভর্নমেণ্ট। বেতন কাউকে দিতে হয় না। শিক্ষকদের বেতন সরকার থেকে দেওয়া হয়। আগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দুবেলা পেটভরে খেতে

পেত না, আজ তারা তিনবেলা পেটপুরে সবাই মিলে খেতে পায়। কাপড়-জামার দুঃখও নেই।

সবগুলো শিশুই নীল রং-এর পাত্‌লুন আর কামিজ পরে আছে। সবচেয়ে ছোট ছেলের বয়স সাত বছরের কম হবে বলে মনে হয় না। মাস্টারমশাই বসতে বলে, বাইরে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে দুবাটি দুধ এনে আমাদের খেতে দিলেন। এ দুধ বিদ্যালয়ের সব ছাত্রকেই প্রত্যহ দেওয়া হয়। তারই একটা অংশ দিয়ে আমাদের আপ্যায়িত করলেন তিনি।

প্রতি দুটো গ্রামে একটা করে এমনিধারা পাঠশালা।

পাঠশালা ঘরটা বাঁশের তৈরী, টালির ছাউনি—আড়ম্বরবিহীন।

ওখান থেকে বেরিয়ে কিছুদূর গিয়ে রাস্তার বাঁ পাশে একটা বড় দোচালা ঘরের সঙ্গে মস্ত বড় সাইনবোর্ড দেখে ফুন্‌কে জিজ্ঞেস করলুম, এটা কি ? সাইনবোর্ডটা পড়ে সে অর্থ করে দিল—

> যাঁরা গর্ভবতী, তাঁরা গর্ভসঞ্চারের চতুর্থ মাস থেকে
> সপ্তাহে একবার এখানে আসবেন। ঔষধ, পথ্য আর
> অন্যান্য উপকরণ এখান থেকে বিনামূল্যে দেওয়া
> হবে। প্রসবকালীন ব্যবস্থা যাঁরা করতে পারবেন না,
> তাঁরা খবর দেওয়া মাত্র ধাত্রী পাঠান হবে ;
> অথবা তাঁরা এই প্রসবাগারে আসবেন। এর জন্য
> কোন মূল্য দিতে হবে না। —এলাকা ওমাং আর
> টংলিং। দুটো গ্রাম।

পুরুষদের ভেতরে প্রবেশ নিষেধ। বাইরে থেকে যতটা দেখা যায়, দেখে মনে হল অন্তত পনরো-ষোলো জন রুগিণী এখানে আছে।

আমি বললুম, যদি রুগিণী না আসে ?

—তা হলে বাড়ির মালিকের জেল হবে দুবছর। যদি শিশু মারা যায়, তা হলে সাত বছর।

—এখানেও তো শিশু মরে !

—মরে, তবে সংখ্যা অতি কম। হয়তো হাজারে আড়াইজন। কিন্তু কুসংস্কারের মধ্যে মারা যায় হাজারে আড়াইশ জন। শিশু আমাদের জাতীয় সম্পদ।

সন্ধ্যেবেলায় ফিরতেই টো বললে, আপনার—কাল—কাল সকালেই বর্মায় ফিরতে হবে। আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, আমার যে অনেক দেখার আর শেখার বাকি।

—উপায় নেই। কুওমিন্‌টাং-এর সৈন্য বর্মার পথে এদিকে এগিয়ে আসছে। বর্মার এমন সাধ্য নেই যে, তাদের তাড়িয়ে দেয়। আর সাধ্য থাকলেও, তারা পরোক্ষে আমেরিকার তাঁবেদার, আসতে না দিয়ে তাদের উপায়ও নেই। বাইরে একটু হৈ চৈ করবে—কিন্তু আসলে ফক্কা। এ সুযোগে তারা বর্মার গণতন্ত্রীদেরও শেষ করতে পারবে, এই তাদের ইচ্ছা।

অগত্যা প্রস্তুত হলুম।

রাতের বেলায় খাবার-দাবার যোগাড় টৌ-গিন্নী ভালোই করেছিলেন। বললুম, তীর্থযাত্রা অসমাপ্ত রেখেই ফিরছি।

টৌ-গিন্নী হেসে বললেন, দেশে গিয়ে গাল দেবেন না।

—গাল দেবার থাকলে দেব বই কি।

টৌ-গিন্নী ঠোঁট উলটে বললেন, তা বেশ! কিছুক্ষণ বাদে তিনি বললেন, এই বিপদ মাথায় করে যে বেরিয়েছেন, আপনার ঘরে কি কেউ নেই?

সেই পুরাতন প্রশ্ন। প্রভাও এই প্রশ্ন করেছিল। টৌ-গিন্নীও ঐ প্রশ্ন করলেন। আমি হেসে বললুম, আজ যে সীমান্তে বসে আছেন, এতে কি বিপদ নেই? এই বিপদকে ভয় করে কি মিঃ টৌ পালাবেন?

—এ তো দেশের কাজ, আপনার কোন্ কাজটা আছে?

আমার কাজও দেশের কাজ! আমাদের দেশ থেকে যেসব লোক চীন দেখতে আসে, তারা বড়লোক, তারা বড় বড় কথা কয়। দেশের সাধারণ লোকের সঙ্গে তারা মেশে না। আমি সাধারণের সঙ্গে মিশে সত্য ঘটনা লোককে বলতে পারব। এটাও কি দেশের কাজ নয়। বড়লোকদের প্রতারণা থেকে লোকদের বাঁচতে সাহায্য করা কি দেশের কাজ নয়?

আবার সেই জংলী পাহাড়ী পথ।

এবার অন্য রাস্তায় এসেছি। একজন ফৌজী লোক সীমান্ত পার করে বনের পথে তুলে দিয়ে গেল।

অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিলুম, কি আত্মবিশ্বাসী জাত এই চীনারা। ঘুমন্ত সিংহ আজ জেগেছে। পৃথিবীকে এরা পথ দেখাবেই দেখাবে। আনবে ওরা সাম্য আর শান্তি। জাপানী New order-এর দম্ভ নেই, হিটলারের জর্মন রক্তের গোঁড়ামি নেই, এরা জানে এরাও যেমন মানুষ, তেমনি মানুষ পৃথিবীর শৃঙ্খলিত জাতির প্রতিটি জন। কত ত্যাগ, কত সহনশীলতা, কত সংযম এদের জীবনযাত্রায়। অথচ আমাদের দেশে এদের কত না নিন্দে!!

বর্মা এলাকার দশ মাইল পথ পেরিয়ে এসেছি।

টো গিন্নীর দেওয়া কখানা পিঠে নিয়ে একটা ঝরনার ধারে গিয়ে বসলুম।

এমনি সময়ে নিকটবর্তী জঙ্গলে শিশুর আর্তনাদ শুনতে পেলুম।

শিশুর ক্রন্দনে খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। ঝরনার ধারে বাঘের ভয়। হয়তো কোন কাঠুরিয়ার ঘর থেকে বাঘে শিশু ধরে এনেছে। অত চিন্তার অবসর ছিল না। নিকটবর্তী একটা জংলা গাছে উঠে পড়লুম। সেই গাছটা থেকে পঁচিশ-ত্রিশ গজ দূরে কতকগুলো ঝোপ নড়ছে, মটমট শব্দে ছোট গাছগুলো ভাঙছে, মচমচ শব্দে শুক্‌নো পাতাগুলো গুঁড়ো হচ্ছে।

শিশু। চার-পাঁচ বছরের একটা শিশু সেই ঝোপটার দিকে চেয়ে আকুলভাবে কাঁদছে!

দুতিন মিনিট লক্ষ্য করতেই দেখতে পেলুম আদিম যুগের বর্বরতা।

দুটো গুণ্ডাগোছের লোক একটা মেয়েকে কাবু করবার কসরত করছে। মেয়েটাও হাত-পা ছুড়ছে বাঁচবার জন্য। কিন্তু এমন ভাবে তারা ধরেছে যে, সে টুঁ শব্দও করতে পারছে না। ধস্তাধস্তিতে লুঙ্গি খুলে গেছে।

একজন লোক ছুটে এসে ছেলেটাকে একটা লাথি কসে দিল। ছেলেটা গোঁ গোঁ করতে করতে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে গেল।

কি করি!—নামলুম গাছ থেকে। হাতে কোন অস্ত্রও নেই যে, তাদের বাধা দেব। হঠাৎ সামনে একটা শুক্‌নো গাছের ডাল দেখে বাঁ হাতে সেটা তুলে নিয়ে সামনের ঝোপে আছড়াতে লাগলুম আর ডান হাতে কতকগুলি টুকরো পাথর নিয়ে ছুঁড়তে লাগলুম ঐ ঝোপটার দিকে। মুখেও বিকৃত শব্দ করতে লাগলুম। উদ্দেশ্য, লোকজনের আগমন বুঝে ওরা যদি পালায়।

উদ্দেশ্য সফল হল। কিছুক্ষণের মধ্যে মেয়েটার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, সেও চীৎকার করছে আপ্রাণ, দুহাতে পাথর ছুঁড়ছে।

আমি এগিয়ে এলুম।

সে মনে করেছিল তাদের গ্রামের হয়তো বা কতকগুলো কাঠুরিয়া এসেছে তাকে বাঁচাতে। একা আমি, তাও অস্ত্রহীন দেখে সে আশ্চার্য হয়ে গেল।

উলঙ্গ নারীর সামনে দাঁড়িয়ে নিজেই লজ্জা অনুভব করছিলুম। শিশুটাকে কোলে তুলে নিতেই মেয়েটা সংবিত ফিরে পেল, সে খুঁজতে লাগলো তার লুঙ্গি।

লুঙ্গি পরে যখন ঝরনার ধারে এসে ছেলেটার চোখে-মুখে জল দিচ্ছিল, তখন মেয়েটার দিকে চেয়ে দেখলুম।

গুণ্ডারা তার মুখ চোখ আঁচড়ে-কামড়ে কিছু রাখে নি—গায়ের গেঞ্জিটাও ছিঁড়ে খানখান হয়ে গেছে।

বয়স বাইশ-তেইশ হবে। বর্মী চেহারা নয়, মনে হল শান্।

ছেলেটাকে বুকের সঙ্গে চেপে সে আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। নিস্তব্ধ বনে দু-চারটে বাঁদরের কচকচানি, বন-মোরগের কঁক্ কঁক্ শব্দ আর দূরে কাঠুরিয়াদের কাঠ কাটার শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। গ্রামের সামনে এসে তাকে ইশারায় জানালুম, আমি আমার পথে যাচ্ছি।

সে বর্মী ভাষায় বললে, মাতোয়াবু। লাবা। (যাবেন না, আসুন) ওদের ভাষায় বিশেষ বিদ্যাবুদ্ধি সংগ্রহ করতে পারি নি, নিরুপায়ের মত তার পেছন পেছন তাদের বাড়িতে গিয়ে উঠলুম। বারান্দায় বসিয়ে সে ভেতরে গেল।

কিছুক্ষণ মাত্র!

তারপর শুরু হোল কোলাহল। গ্রামের প্রত্যেক ঘর থেকে জোয়ান মরদের দল বেরিয়ে এল। কারুর হাতে দা, কারুর হাতে লাঠি, কারুর হাতে টাঙ্গি, কারুর হাতে বন্দুক। বন্দুকের সংখ্যাও কম নয়। গোটা চারেক হবে।

সবাই আমায় ঘিরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকে।

আমার বিদ্যাবুদ্ধি মত উত্তর দিচ্ছিলুম। ইতিমধ্যে হিন্দী জানা একজন এগিয়ে এসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে থাকে সব কথা।

দশ মিনিটের মধ্যে তারা দুটো ভাগ হয়ে জঙ্গলের দিকে রওনা হয়ে গেল।

এরা চলে যাবার পর, গ্রামের মেয়েরা আমায় নিয়ে পড়ল। তারা কত কথাই কয়, কিন্তু বাক্‌শক্তি থাকা সত্ত্বেও আমি বোবা হয়ে গেছি।

আমার বিদ্যাবুদ্ধি সব শেষ হয়ে গেছে।

রাতের খাবার পর শোবার ব্যবস্থা করে দিল মেয়েরা।

দুজন পাখা নিয়ে বসল বাতাস করতে।

তোয়াবা, তোয়াবা করে তাদের হটিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লুম।

মাঝরাতে চীৎকার আর হৈচৈ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল।

পাকড়াও করেছে লোক দুটোকে। তাদের পরনে পুলিসের উর্দী—রাইফেল দুটো এরা কেড়ে নিয়েছে। পিছমোড়া করে হাত বাঁধা।

এতক্ষণ লোক দুটোর সাহস ছিল। মনে হচ্ছিল, তারা তাদের নির্দোষিতা

জানাচ্ছে। ইতিমধ্যে মশাল জ্বালানো হল, ডাকা হল সেই মেয়েটাকে সনাক্ত করতে। আমাকেও ডাকল।

মেয়েটাকে দেখে ওদের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

যথাযথ সনাক্ত হল।

আমি একজনকে জিজ্ঞেস করলুম, এদের পেলে কি করে?

—পাশের গ্রামে খবর করে জানলুম, দুটো সাইকেল-পুলিস ওদের গ্রামে এসেছে খবর সংগ্রহ করতে। আজ দুপুরে সাদা পোশাকে ওরা বেরিয়েছিল। আমরা অপেক্ষা করতে লাগলুম, কখন ওরা ঘুমায়। তা না হলে রাইফেল চালাবে। ঘুমানোমাত্র পাকড়াও করে এনেছি। শালা ফাসাফালার জ্বালায় আর বৌ-ছেলে নিয়ে ঘর করা যাবে না!

গ্রামের থাজি (প্রধান) বললে, গণতন্ত্রী সরকারের আদালতে পাঠাও। গ্রামের লোকেরা বললে,—আমরাই এর বিচার করব। তর্কাতর্কির পর সবাই মিলে বিচারে বসল। শাস্তি শুনে দেখবার ইচ্ছে আর রইল না, কলমের মুখে শাস্তিটা লেখাও যায় না।

অবশ্য এসব শাস্তির পর—তাদের শাস্তি ঘটনাস্থলে মৃত্যু!

সারারাত ঘুম হল না। বারান্দায় বসে সেই মেয়েটা আর তার স্বামী আলোচনা করছিল। কি বলছিল বুঝতে পারি নি। তবে মাঝে মাঝে 'হোটে হোটে' শব্দ পাচ্ছিলুম।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে হৈ-হৈ শুরু হয়ে গেল। রক্তাক্ত কলেবর দুটি নপুংসককে নিয়ে চলল মৃত্যুদণ্ড দিতে।

আমিও সেই অবসরে বেরিয়ে পড়লুম ভামোর পথে। মেয়েটি এসে অশ্রুসজল নেত্রে বিদায় দিল। তার স্বামী আমার ঠিকানা লিখে রাখল, যদি কোন দিন 'ইয়াংগু' (রেঙ্গুন) যায়, তবে আমার সঙ্গে দেখা করবে। আমার ঋণ তারা জীবনে ভুলবে না—আরও কত কি।

আমার ঋণ! ঝড়ে বক মরেছে, ফকিরের কেরামত বেড়েছে!

ভামো পৌছুতে প্রায় তিনটে বেজে গেল। উড়োজাহাজের টিকিট মিলল না। সেদিন জাহাজ নেই। পুরানো ঘাঁটিতে এসে বসলুম।

খবর পেলুম, আজ শেষ রাতে একখানা লরী মাল নিয়ে রেঙ্গুনে যাবে।

বর্মায় যানবাহনের বড়ই কষ্ট। রেলপথ থেকেও সেই, জলপথ আরও বিপদ-সংকুল, মোটরে মাল চলাচল করে, তাও ভারতীয়দের প্রচেষ্টায়। একমাত্র নিরাপদ

যান উড়োজাহাজ। বর্মার বড় বড় শহরগুলো ইংরেজ-আমলে রেলপথ, জলপথ, ও আকাশপথে সংযুক্ত ছিল। বর্তমানে আকাশপথই একমাত্র পথ। মাঝে মাঝে উড়োজাহাজও নির্দিষ্ট স্থানে নামানো যায় না। জাহাজ জমির দিকে এগিয়ে এলেই অনেক সময় ঝোপঝাড় থেকে গুলী চলতে থাকে।

সোনার দেশ বর্মা! সে দেশে প্রাণটা মর্টগেজ দিয়ে চলতে হয়। মানুষ আর পিঁপড়ে—সবাই সমান মূল্যের, মহানির্বাণের পথে উভয়েই ছুটে চলেছে সমান বেগে।

মালটানা লরী মোটেই নিরাপদ নয়, তবুও বর্মা দেশটা আগাগোড়া দেখতে পাব, এই বিশ্বাসে লরীর যাত্রী হতে রাজী হলুম।

লরীচালক রামসিং, পঞ্জাবী শিখ। আগে আসামে ছিল। লড়াইয়ের পর এদেশে এসেছে। আসামী ভাষা চোস্ত জানে। বাংলা জানা তার পক্ষে অসম্ভব নয়।

শেষ রাতে মাল বোঝাই গাড়ি রওনা হল।

গতির বেগ পনেরো থেকে বিশ। রাস্তা ভালো থাকলে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মাইলও চলছিল।

রাস্তাঘাট নষ্ট হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট পুলগুলো ভাঙা। তার ওপর বাঁশ কাঠ দিয়ে রাস্তাকে চালু রাখা হয়েছে। কোথাও কোথাও রাস্তা রেলপথের সমান্তরাল চলেছে। লাইনগুলো কোথাও আছে, কোথাও নেই। যেখানে আছে সেখানেও মরচে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। রেলের প্রায় সেতুই ভাঙা। কোথাও বা ফৌজ খাড়া হয়ে মেরামত হচ্ছে।

পাহাড়ের কোল বেয়ে উঁচু নীচু রাস্তা সর্পিল গতিতে চলেছে। ঢালুতে নামবার সময় পেট্রোল বন্ধ করে দিচ্ছিল। ওপরে উঠতে গিয়ে গ্যাসেও চাপ দিচ্ছিল। এমনি ভাবে জনমানবহীন রাস্তায় আমরা চলেছি। আগে পেছনে অন্য কোন গাড়ির চিহ্নও নেই।

রামসিং সজ্জন ভদ্র। সারা রাস্তায় তার বর্মা-জীবনের কথা বলে আসছে। আমিও বলছি চীনের কথা। লুংলিং থেকে স্যালুইন নদীর ধার বেয়ে চীনা গ্রামগুলোর কথা বললুম। নামপাং-এর পাশ বেয়ে ছোট তাইপিং নদীর কিনার বেয়ে চীন প্রবেশের কথা শুনে রামসিং আশ্চর্য হয়ে গেল।

সে বলবে, পঞ্জাবীরা জঙ্গীজাত হয়েও সাহস পায় না, আপনি বাঙালী হয়ে কি করে সাহস করলেন? এমন আর করবেন না। পিতৃ-পুরুষের সৌভাগ্য, আপনি প্রাণে বেঁচে এসেছেন।

আমি কোন উত্তর না দিয়ে হাসলুম।

রামসিং একটু উত্তেজিত হয়ে বললে, আপনি হাসছেন, জানেন না তাই। আমাদের সরদারী সিংকে জানেন বোধ হয়। লড়াইয়ের সময় ইণ্ডিয়া থেকে চোরাই সিগ্রেট আসত মান্দালয়। পাঁচ আনা দামের সিগ্রেট মান্দালয়ে তখন দেড় টাকা। সেই সিগ্রেট সে চালান দিত চীনে। তখন চীনে সিগ্রেটের দাম আড়াই টাকা। লাভ আর লোভে দুটোতে সরদারী ফেঁসে গেল। শেষ পর্যন্ত বাইশ হাজার টাকার গাড়িখানা খুইয়ে প্রাণ নিয়ে বর্মায় এল আর রেখে এল তার কান দুটো। আজ চার-পাঁচ বছর এদেশে আছি—দূর-দূরান্তে ঘুরছি, আমি জানি এদের স্বভাব।

আমি বললুম, লাভ আর লোভ এই দুটো আমার ছিল না, তাই প্রাণও এসেছে, কানও এসেছে।

—তা বটে। বলে রামসিং হাসতে লাগল।

শোয়েবো জেলার একটা গ্রামে গাড়ি থামিয়ে রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করলুম। রামসিং বললে, এখন আমরা কমিউনিস্ট এলাকা দিয়ে চলেছি। মান্দালয় পার হলেই পিন্‌মিনা পর্যন্ত লড়াইয়ের মাঠ—সেটুকু বড়ই বিপদজ্জনক। রাস্তাতে বাঁকও বেশী, কখন কোন্ বাঁকে গাড়ি লুটে নেয় তার কি ঠিক আছে?

আমি বললুম, প্রাণে মারে না তো?

—ইণ্ডিয়ানদের মারে না। গভর্নমেণ্ট তরফে জুলুম বেশী হলেও, জনসাধারণ জুলুম করে না। রসদ সংগ্রহ, টাকা পয়সা নেওয়াই এদের কাজ। নেহাত তিগরমবাজী করলে প্রাণে মারতে কসুর করে না। যদি সরকারী লোক হয়, তার বাঁচবার কোন সম্ভাবনা নেই।

সকাল বেলায় আবার গাড়ি ছুটল।

পঞ্চাশ-ষাট মাইল আসবার পর একটা বাঁকের মুখে আট-দশটি বর্মী বন্দুক নিয়ে গাড়ি থামাল।

আমি মালের উপর শুয়ে ছিলুম। সকাল বেলায় হামলা পড়তেই একটু ঘাবড়ে গেলুম। একজন আমার পা ধরে টানতে টানতে নীচে নামাল।

তারপর চলল তল্লাশী। টাকা-পয়সা সবগুলো কেড়ে নিয়ে রামসিং-এর সঙ্গে কি নিয়ে তর্কাতর্কি শুরু করলে। বিনয়সহকারে, হাতজোড় করে রামসিং কত কি বোঝাচ্ছে, ওরা বুঝতে চাইছে না।

শেষ পর্যন্ত গাড়ি ঘুরে সদর রাস্তা থেকে মেঠো পথ ধরে চলল। প্রায় বিশ মাইল যাবার পর একটা জঙ্গলের সামনে গাড়ি থামল।

বাইরে থেকে জঙ্গল মনে হলেও, আসলে সেটা একটা দুর্গবিশেষ।

আমাদের দুজনকে গাড়ি থেকে নামিয়ে একটা ঘরে আটক করলে।

রামসিং-এর সহকারীকে একটা গাছের সঙ্গে পিছমোড়া করে বেঁধে রাখল।

সারাদিন অনাহার, পিপাসায় বুক ফেটে যাচ্ছে! বের হবার কোন রাস্তা নেই, জল জল করে চীৎকার করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছি!

রামসিং বললে, আর চীৎকার করে লাভ নেই, ওরা জল দেবে না।

ক্রমে রাতের অন্ধকার নেমে আসে।

আমরা দুজনেই ঝিমিয়ে পড়লুম। রামসিং ডাকলে, ঘুমুলেন নাকি?

উত্তর দিলুম, কেন?

—ওরা কি বলছে জানেন, ওরা বলছে, প্রায় তিন মাস আগে আমি নাকি ওদের একজন লেকেকে গাড়ি চাপা দিয়ে মেরেছি। আমি বলছি—তোমাদের ভুল হয়েছে, কিন্তু তারা গাড়ির নম্বর রেখেছে, আমার গাড়ির নম্বর আর ঐ নম্বর এক।

—তা হলে উপায়।

আমার ভীত কণ্ঠস্বরে রামসিং আরও ঘাবড়ে গেল। অনেকক্ষণ ভেবে সে বললে, উপায় নেই তবে ফুঙ্গীরা (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী) যখন আসবে, তখন তাদের যদি বুঝিয়ে ইংরেজীতে বলতে পারেন, তা হলে বোধহয় বাঁচা যাবে। নয়তো, মৃত্যু অবধারিত।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, সত্যি সত্যি আপনি চাপা দিয়েছিলেন কি?

—দুমাস আগে এ গাড়ি আমার ছিল না। আমি হালে কিনেছি। আগে কিছু হয়ে থাকবে।

—একথা বললেন না কেন?

—বলেছি, বিশ্বাস করলে না। Blue book দেখালাম, তাও মানলে না।

আর অনর্থক বাক্য-ব্যয় করে কি লাভ। রামসিং 'ওয়া গুরুকা ফতে' চিন্তায় মগ্ন আর আমি ভাবছি, মরণটা সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলে বাঁচতুম, মরণের চিন্তা বড়ই ক্লেশদায়ক। Nervous breakdown এসে যায়।

সারারাত্রি অনিদ্রায় ক্ষুৎপিপাসায় কেটে গেল।

কখন সকাল হবে, কখন হবে বিচার—তারই প্রতীক্ষায় থাকতে থাকতে ঝিমিয়ে পড়লুম।

সকালে দুটো বিচারসভায় দুজনকে নিয়ে গেল!

আমায় যেখানে আনলো, সেখানে তিনজন ফুঙ্গী বসে, হাঁটুগেড়ে তিন-চারটে

মেয়ে দরজার আড়ালে কি যেন করছিল। কালান্তক যম-সদৃশ আরও তিন-চারজন বর্মীপুরুষ বন্দুক হাতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল।

প্রথম প্রশ্ন : দাড়িআলা তোমরা কোন্ হ্যায় ?

উত্তর : কোই নেহি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : তম্ কাহে আয়া—?

উত্তর : বর্মা দেখনে।

তৃতীয় প্রশ্ন : কিধার যায়েগা ?

উত্তর : রেঙ্গুন।

চতুর্থ প্রশ্ন : চাটগাঁইয়া ?

উত্তর : নেহি—কলকাত্তাআলা।

—I see, বললে। তারা কি সব পরামর্শ করে আমায় নিয়ে গেল রামসিং-এর কাছে।

আমায় দেখে রামসিং একটু ভরসা পেল, জিজ্ঞেস করলে, আপনার কি হল ?

—জানি না।

—ওদের একটু বুঝিয়ে বলুন।

—তাই তো মনে করছি।

আমি ধীরে ধীরে ইংরেজীতে রামসিং-এর নির্দোষিতার ওকালতী শুরু করলুম। যখন বললুম, If your communism is for the improvement of the poor, it is no use to kill a poor man like Ramsingh on mere suspicion.

আমার কথায় যেন চিড়ে ভিজল।

আমি বলতে থাকি, তোমরা বৌদ্ধ, আমরা হিন্দু, রামসিং শিখ—আমরা সবাই একই ধর্মের বিভিন্ন শাখা, একই সভ্যতা ও কৃষ্টির বাহক। আজ যদি নিরপরাধ রামসিংকে শাস্তি দাও, তা হলে অধর্ম হবে। ভগবান তথাগত বলেছেন, ক্ষমাই পরম ধর্ম। তোমরা বোধহয় এ ধর্ম পালন করবে। সামান্য সন্দেহবশে নিরপরাধকে শাস্তি দিও না।

একজন ফুঙ্গী চীৎকার করে উঠল, well, well, you can go.

শেষ পর্যন্ত দেখবার আমার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কালান্তক দুটো যম আমায় টেনে নিয়ে চলল!

একটা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ির সামনে আমায় দাঁড় করিয়ে ওরা হাঁকডাক

শুরু করলে। ভেতর থেকে একজন যুবতী বেরিয়ে এসে ওদের সঙ্গে কি যেন বলাবলি করল। ওরাও আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল।

যুবতী আমায় বললেন, আসুন।

স্পষ্ট বাংলা ভাষায় 'আসুন' শব্দ কানে যেতে চমকে উঠলুম। তার মুখের দিকে একবার ভালো করে চেয়ে দেখলুম। না, বাঙালী তো নয়!

ঘরের দাওয়ায় বসেই বললুম, জল।

তাড়াতাড়ি তিনি জল নিয়ে এলেন—তারপর এল খাবার—আরও কত কি!

নিজেকে সুস্থ মনে করতেই রামসিং-এর কথা মনে পড়ল। তাঁকে জিজ্ঞেস করলুম রামসিং-এর কথা।

তিনি কোন খবর রাখেন না। 'মা-মে' বলে ডাকতেই আর একজন মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তাকে পাঠাল খবর আনতে।

কিছুক্ষণের মধ্যে সে এসে জানাল, রামসিং-কে কয়েদ রাখা হয়েছে। তার সহকারিকে রেঙ্গুন পাঠান হয়েছে, আসল খুনির বাড়িঘরের খোঁজ আনতে। সে ফিরে সঠিক সংবাদ দিলে রামসিং-এর মুক্তি।

আমি বললুম, ও নির্দোষ। ওকে বাঁচাতে পারেন না?

—পারি, কিন্তু আমার স্বামী ফিরে না এলে নয়। ওগুলো আমার এলাকা নয়। আপনি ভয় পাবেন না, ওর মুক্তি অবশ্য মিলবে।

দুপুর বেলায় পরিতোষ করে খাওয়ালেন। তারপর আমায় নিয়ে বারান্দায় এসে ঢাকে কাঠি দিয়ে দুম্‌দাম্‌ শব্দ করতে লাগলেন। শব্দ হওয়া মাত্র কোথা থেকে পিলপিল করে লোক আসতে লাগল। সবার হাতে একটুকরো কলাপাতা। ধামা ভর্তি ভাত এল, আর এল ফুলকপি আর মাংস সেদ্ধ। সবাই লাইন দিয়ে এক-একজন করে এগিয়ে খাবার নিয়ে খেতে খেতে যে পথে এসেছিল সেই পথেই ফিরে গেল।

সবাই যখন চলে গেল, সে আর সেই মেয়েটা সেই ভাত-তরকারি খেতে বসে গেল। বঙ্কিমবাবুর দেবীচৌধুরানী পড়েছি, আজ যেন সত্যিকারের দেবীচৌধুর'নী দেখলুম।

আমি বললুম, আমার জন্য আলাদা খাবার কেন?

—শোনেন নি বুঝি, বর্মীরা অতিথি-বৎসল, বলে তিনি হেসে উঠলেন। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, এটি আমার বোন। অক্সফোর্ড

থেকে বি. এ. পাস করে এসেছে কমাস আগে। আমার বড় ভাই আছেন তিনি কলকাতা থেকে এম. এ. পাস করে বর্তমান ফাসাফালার মস্ত বড় চাকুরে।

—আর আপনি?

—আমি কলকাতায় লেখাপড়া শিখেছি, খুব বেশী নয়, সামান্য। বাবা আমাদের বাঙালী। তিনি ছিলেন পেগুতে উকীল। আমাদের সবাইকে কলকাতায় রেখে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। ইচ্ছে ছিল পুরো বাঙালী তৈরি করার, কিন্তু প্রথম তিনি বাধা পেলেন দাদার বিয়ে দিতে। তাঁর স্বজাতের কেউ মেয়ে দিল না।

—তারপর!

—আমরা ফিরে এলুম বর্মায়। দাদা পেলেন সরকারী চাকরি, বিয়ে করলেন এক বাঙালী কাবীয়া (বর্মী মা ও বিদেশী বাপের সন্তান)। আধাপথে আমার লেখাপড়া বন্ধ হল। আমিও বিয়ে করলুম বাঙালী কাবীয়া। বাবার দাওয়া নামটা বদলে পুরো বর্মী হয়ে গেলুম ধীরে ধীরে। মা-মে, যার আগের নাম ছিল শান্তিলতা, তাকে দাদা পাঠালেন বিলেতে! মা-মে পাস করে এসেছে কমাস আগে!

—সুন্দর!

—কি সুন্দর? আমাদের জন্ম-বৃত্তান্ত? সুন্দর অন্যের কাছে নয়, আমাদের কাছে। বাংলার মেয়ে বাংলায় স্থান না পেয়ে সুন্দর হয়েছে বৈ কি!

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। আমি বললুম, আপনার বাবা তো ছিলেন হিন্দু, আর আপনি?

—আমি বৌদ্ধ। আমার স্বামীর বাবা ছিলেন চট্টগ্রামের মুসলমান। কিন্তু আমার স্বামী বৌদ্ধ। ধর্মের বেলায় আমাদের স্বাধীন মতকে মেনে চলে সবাই। বাপ-মায়ের ধর্ম তো আমার গায়ে ছাপ দেয়া নেই। ধর্ম সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার।

আমি বললুম, কিন্তু এইভাবে তৈরী হয়েছে একটা অর্ধজাতি শ্রেণী আর বর্মী মুসলমান শ্রেণী।

—অর্ধ-জাতিরা সবাই হিন্দুর সন্তান। হিন্দু পিতা সন্তানের অধিকার স্বীকার তো করেই না, বরং তাদের সমাজে কোন স্থান দিতে চায় না। বাঙালী হিন্দুরা এ বিষয়ে অনেকটা উদার। কিন্তু অন্য হিন্দুরা তাদের সন্তানদের সমাজের নীচের স্তরে নিয়ে যায়। তাই বর্মী হিন্দু সৃষ্টি না হয়ে হয়েছে অর্ধ-জাতির সৃষ্টি। আর

মুসলমানরা তাদের সন্তানদের সামাজিক মর্যাদা দেয় বলেই বর্মী মুসলমান সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু বিদেশীকে বিয়ে আপনাদের সমাজে প্রচলিত হল কি করে?

—কারণ রয়েছে অনেক। তারমধ্যে অভাবই প্রধান।

মা-মে এতক্ষণ কথা বলে নি। সে মাঝপথে বাধা দিয়ে বললে, এ অবস্থার সৃষ্টি করেছে বিদেশী শাসন। তাও বা যা ছিল, জাপানী রাজত্বে বর্মার সমাজ-জীবন একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে। তারপর এল সমাজতন্ত্রী নামধারী কতকগুলো অসৎ লোক। ইংরেজদের কাছ থেকে শাসনক্ষমতা পেয়েই ওরা সারা দেশটায় বীভৎসতা সৃষ্টি করেছে আরও বেশী করে।

আমি বললুম, খাওয়া বন্ধ করে গল্প করে কি হবে? খাবার পর গল্প করা যাবে।

গল্পও চলুক, খাওয়াও চলুক—বলে মা-মে বলতে থাকে, বর্মায় শিক্ষিতের সংখ্যা এশিয়ার যে-কোন দেশ থেকে বেশী, অথচ এই শিক্ষা এখন কুশিক্ষায় পরিণত হয়েছে।

—কেন? আমি জিজ্ঞেস করলুম।

দেবীচৌধুরানী বললেন, আমাদের শিক্ষার কেন্দ্র ফুঙ্গীচং (সন্ন্যাসীর আশ্রম), সেখানে ত্রিপিটক আর জাতক পড়িয়ে, লোককে আলস্যের পথে নিয়ে যায়। সারা বর্মায় লক্ষাধিক শুধু ফুঙ্গী রয়েছে, যাদের বৃত্তি কেবল ভিক্ষা। অথচ কার্যকরীভাবে এ ব্যবস্থা বন্ধ করবার উপায় নেই। সন্ন্যাসী যখন গৃহী হয়, তখন সন্ন্যাসের অকর্মণ্যতা তাদের নিস্তেজ করে দেয়।

ইতিমধ্যে সবার খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল।

সবাই উঠে ঘরের ভেতর বসলুম।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, আমাদের যারা গ্রেপ্তার করে এনেছে, এরা কারা?

—গণতন্ত্রী ফৌজ, মা-মে উত্তর দেয়।

—এটা কি আপনাদের Head Quarter?

পাশের ঘরে টুনটুন করে শব্দ হতেই দেবীচৌধুরানী উঠে গেলেন।

মা-মে বললে, না, watching fort. এখানে আমরা transmitter-এ খবর লেনদেন করি। আমাদের কেন্দ্রগুলো সবই দুর্গম পাহাড়ে। আমরা শুধু সামনের একশো মাইলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করি।

আপনাদের লরী সোয়েবো ছাড়তেই আমাদের কাছে খবর এসে গেছে। ঐ

যে গাছগুলো দেখছেন, ওগুলো এক-একটা সৈনিক, ওরাই আজ চার-পাঁচ বছর ধরে লড়াই চালাচ্ছে।

আমি হেসে বললুম, ওরা যে সৈনিক তা বুঝেছি যখনই পিলপিল করে লোকে খেতে এল! যাক্, এখন বলুন, আপনাদের এলাকায় লোকে আছে কেমন?

—আমি বললেই কি বিশ্বাস করবেন। বরং মা-টুন্-মেঁ-কে জিজ্ঞেস করবেন।

—বিশ্বাস করি আর নাই করি, তাতে কি এসে যায়। আমার জানা নিয়ে কথা। মা-মে বলতে থাকে, আমরা জমি কেড়ে নিয়েছি বড় বড় জমির মালিকদের। ফসল উঠেছেও যথেষ্ট। আমাদের এখানে এক ব্যাগ (তুমণী বস্তা) চালের দাম সাত থেকে আট টাকা, আর ফাসাফালা এলাকায় তার দাম ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ। সামরিক শক্তিতে আমরা দুর্বল, জনতার নৈতিক বলই আমাদের বল। সেটুকু সম্বল করে আমরা এগিয়ে চলেছি। অনেক সময় একই এলাকা হাত বদল হচ্ছে বিশ-পঁচিশবার। সেজন্য দৈনন্দিন জীবন অনেকটা অশান্তিকর হয়েছে। আমরা সে-সব এলাকার লোকেদের আমাদের এলাকায় নিয়ে আসছি। আবার ফাসাফালা এসে কতকগুলোকে তাদের এলাকায় নিয়ে যাচ্ছে। এতে ঐসব এলাকার চাষীর সংখ্যা কমছে, চাষের জমিও পড়ে থাকছে।

—এই ছেঁড়-যুদ্ধ চলবে আর কত কাল?

—আরও চার-পাঁচ বছর। ইন্‌সিন পর্যন্ত দখল করেছিলুম কিন্তু রাখতে পারি নি। সামান্য কিছু অস্ত্র সাহায্য পেলেই আমরা রেঙ্গুনে প্রবেশ করতে পারতুম। কিন্তু ইংরেজ আর আমেরিকার সাহায্যপুষ্ট ফাসাফালাকে রুখতে পারি নি। পিছিয়ে পড়তেই হল, কিন্তু এখন দেখছি, শুধু অস্ত্রের সাহায্যে এদের জয় করতে হবে অনেক সময়ের প্রয়োজন। সেজন্য অর্থনৈতিক লড়াই অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দিয়েছে। আমাদের কারখানায় যা অস্ত্র তৈরী হয়, তা দিয়ে গেরিলা যুদ্ধ চলতে পারে, বিরাট কিছু সাফল্যলাভ অসম্ভব। জাপানিদের ফেলে-যাওয়া অস্ত্রই আমাদের সম্বল। তার আবার কিছু অংশ গিয়ে পড়েছে চোর-ডাকাতের হাতে। এসব নানা অসুবিধেতে সাফল্য বিলম্বিত হচ্ছে।

—এতদিন জনতার মনোবল থাকবে কি?

—যে এলাকা আমাদের দখলে আছে, সেখানে ফাসাফালার আসতে, এমন কি, সাধারণ সহজ ভাবেও দশ বৎসর প্রয়োজন। আমাদের সাফল্য নিশ্চিত এবং জনতার মনোবলও অক্ষুণ্ণ থাকবে। অবশ্য এটা আমার বিশ্বাস।

—কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওদের সঙ্গে লড়বেন কি করে?

—আমরা ফাসাফালা সরকারের টাকা ছেপে ওদের এলাকায় ছাড়ছি, তার বদলে আমরা সংগ্রহ করছি সোনা। ওদের বাজারে মুদ্রাস্ফীতি ঘটছে, আমাদের এখানে সঞ্চিত হচ্ছে সোনা। সোনার বিনিময়ে আমরা নেব অস্ত্র, আর কাগজী টাকার বিনিময়ে ওদের মুদ্রামান যাবে ধসে। বিশ্বের বাজারে চড়া দামে মাল কিনে ওরা দেউলে হয়ে যাবে। এর মধ্যে বহু লোক আমাদের এলাকায় আসছে। অন্তত খেয়ে বাঁচবে এরা। বড়লোকরা পালাচ্ছে ওদের এলাকায়। সঞ্চিত অর্থ ওদের নিঃশেষ হয়ে যাবে অতি সত্বর। ফলাফল শীগ্গীরই দেখতে পাবেন।

—আপনারা ওদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ কেন করেন না, কেনই বা এত দল—KNDO—MNDO—PVO, কত কি ? সবাই একটা সর্বসম্মত ফরমুলা নিলেই কি ভালো হয় না ? এই লড়াইয়ে কষ্ট পাচ্ছে কারা ? দেশের দরিদ্র জনসাধারণ, তাদের জীবন অথবা সম্পত্তির কোনই যে নিরাপত্তা নেই !

—এটাও আমরা চিন্তা করেছি। বৃহত্তর স্বার্থের কাছে ক্ষুদ্রতর ত্যাগ কিছুই নয়। এক সময় মিলেমিশে কাজ করতে এগিয়েছিলুম। কিন্তু ভূমি-সংক্রান্ত মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা ওরা বদল করতে চায় না। বিদেশী মূলধনকে ওরা নিয়োগ করতে চায় জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। বর্মার রূপো, হীরে, তেল, সীসা, চুনি, পান্না, উলফ্রাম, রবার—এ সবই ওরা পয়সার লোভে বিকোতে চায় ইংরেজ আর আমেরিকার কাছে। আমরা তাতে রাজী নই। এই কারণেই সবার আগে আমরা নষ্ট করে দিয়েছি বিদেশী মূলধন প্রয়োগের কেন্দ্রগুলো। তারপর এগুচ্ছি একটার পর একটা গ্রামকে মুক্ত করতে।

—আরাকানের মুসলমান হাঙ্গামাটা কি ?

—এ হাঙ্গামার পিছনে রয়েছে ইংরেজ-মার্কিনী ইঙ্গিত। যেমন, ফাসাফালা, তেমনি পাকিস্তান—দুই-ই সাম্রাজ্যবাদের হাতের পুতুল। ও আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

মা-টুন্-মে (দেবীচৌধুরানী) এসে জানিয়ে গেলেন, তাঁর স্বামী উ-টুন্-পে আজকেই আসবেন।

আমি নিশ্চিন্ত হলুম, কালকেই রামসিংকে নিয়ে রওনা হতে পারব।

মা-মে'কে জিজ্ঞেস করলুম, রেঙ্গুনের কাগজে রোজই দেখি বহু কমিউনিস্ট যুদ্ধে মারা যাচ্ছে, এটা কি সত্য ?

—সত্য সংবাদ ওরা দেয় না। আমাদের রেডিও সংবাদ শুনবেন, তাতেই জানতে পারবেন প্রকৃত অবস্থা। মনে করুন, একটা গ্রামে লড়াই হচ্ছে। সেখানে ফাসাফালার শক্তি বেশী। আমরা কভারিং ফায়ার করতে করতে সরে এলে, ওরা

গ্রামে ঢোকে গুলী করতে করতে, সেই গুলীর আঘাতে মরে কতকগুলো নিরীহ গ্রামবাসী। তাদের কমিউনিস্ট বলে ওরা প্রচার করে। ওদের ভয়ে, যখনই আমরা সাবধান করে দেই, তখনই গ্রামবাসীরাও পেছনে সরে আসে, অন্তত মেয়েদের আর শিশুদের সরানো দরকার হয় সর্বপ্রথম! দখল করা এলাকায় ঢুকেই ওরা সর্বাগ্রে শুরু করে মেয়েদের উপর পাশব অত্যাচার। ওদের অত্যাচারে বহু মেয়ে মারাও গেছে। শিশুদের দায়ের কোপে কেটে বিজয় ঝাণ্ডা ওড়ায়। আবার যেখানে আমাদের শক্তি বেশি, সেখানে ওরা উর্দী ফেলে আমাদের দলে এসে জমায়েত হয়। হাত তুলে বন্দীত্ব স্বীকার করে। গ্রামের লোকেরা মুক্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে।

—শুনেছি কোন এক বাঙালী ভদ্রলোক নাকি আপনাদের নেতা।

—নেতা নয়, নেতৃস্থানীয় এবং প্রধান পরামর্শদাতা।

—তাঁকে দেখেছেন কখনও?

—বহুবার, তবে তাঁর গতিবিধি কেউ জানে না। অনেক সময় তিনি রেঙ্গুনেও থাকেন।

আশ্চর্য হয়ে বললুম, বলেন কি?

—অনেক কিছু আশ্চর্য জিনিস রয়েছে এই পৃথিবীতে, যা বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা করা যায় না, তার মধ্যে এ-ও একটা।—হেসে ঠাট্টার সুরে সে জবাব দেয়।

বিকেলে উ-টুন্-পে এলেন। তিনি এসেই আমার সঙ্গে আলাপ জমালেন, অনুরোধ করলেন, দু-একদিন আরো থেকে যেতে। রামসিংকে তখুনি মুক্তি দেওয়া হল।

আমার ইচ্ছা রামসিং-এর সঙ্গেই ফিরি, কিন্তু তা আর হল না। গাড়ি করে আমায় রেঙ্গুন পৌছানোর দায়িত্ব ওঁরা নিলেন।

আরও দুদিন কাটালুম ওদের দেশে।

গ্রামে গ্রামে ঘুরেফিরে দেখলুম। মনে হল, মন্দ কি! চীনের মত না হলেও, এরাও এগুচ্ছে।

ওরা পাঁচটা গ্রামকে একটা করে ইউনিট করেছে।

কলের লাঙলের অভাবে দেশী প্রথায় চাষ করছে—চাষের জমি সবার নিজস্ব, ফসল তুলতেও তারা কার্পণ্য করে না। একটা ইউনিটে একটা করে স্কুল বসিয়েছে। পানীয় জলের অভাবের জন্য একটা করে টিউবওয়েল দিয়েছে প্রতিটি গ্রামে। প্রত্যেক ইউনিটে প্রসূতি-সদনও রয়েছে একটা করে। ডাক্তার আর

ঔষধের অভাব, তবুও যতদূর সম্ভব পাস-করা কপাউণ্ডার দিয়ে আর কিছু কিছু ওষুধ দিয়ে সাধারণ ভাবে ঔষধ বিতরণ-কেন্দ্রও করেছে এখানে-ওখানে। অবশ্য সংখ্যায় খুবই কম।

মামলা-মকদ্দমা নেই। যদি কখনও কোন অশান্তি হয়, পাঁচটা গ্রাম থেকে একজন করে বিচারক নিয়ে সালিশী বিচারের ব্যবস্থাও হয়েছে। কাপড়ের বড় অভাব। বাগানে কার্পাস গাছ লাগিয়ে, বাড়ির তাঁতে নিজেদের প্রয়োজনমত বস্ত্র বয়ন করে চলেছে গ্রামের মেয়েরা। শখানেক বই নিয়ে ছোট একটা পাঠাগারও স্থাপন করেছে অনেক গ্রামে। গ্রামের স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছে।

ত্বদিনই মা-মে আমায় নিয়ে ক'টা গ্রামে ঘুরে বেড়াল।

এ যেন জমিতে ধান, বাগানে শাক-সবজি, গোয়ালে গরু, তাঁতে কাপড়, পুকুরে মাছ! সবই নিজস্ব। অভাব কোথায়? ট্যাক্স-খাজনা নেই, শুধু উদ্বৃত্ত ফসল দিয়ে ন্যায্য মূল্য পেলেই ওরা খুশী।

মন্দ নয়!

মা-মে বললে, গণতন্ত্রী বর্মা দেখলেন তো, এবার ফাসাফালার বর্মা দেখে বিচার করুন কে সুখে আছে। কারা শাসনক্ষমতা পাবার যোগ্য?

আমি অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিলুম, এই দাঙ্গা-হাঙ্গামায় এরা বেশ সুস্থ জীবন যাপন করছে তো?

আমায় চুপ করে থাকতে দেখে মা-মে জিজ্ঞেস করে, কি ভাবছেন?

—ভাবছি, চমৎকার!

রেঙ্গুনে পৌছেছি।

আসবার আগে, মা-টুন্-মে আমার ঠিকানা রেখে বললেন, রেঙ্গুন গেলে আপনার অতিথি হব কিন্তু!

বললাম, যেতে যদি পারেন তা হলে আতিথ্য গ্রহণ করলে সৌভাগ্য মনে করব।

—সেখানে আমাদের নাম বদলে থাকতে হবে। কি নামে হাজির হব, তা পরে জানাব।

রেঙ্গুন এসে নিজের কাজে মন দিতে গিয়ে দেখলুম, পায়ের তলায় মাটি সরে গেছে। পতন অবশ্যম্ভাবী। তার ফলে কঠিন দারিদ্র্য। অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে শিউরে উঠলুম। আমি আজ পথের ভিখারী হতে বসেছি।

হলও তাই। ভারত, বর্মা, শ্যাম—সব জায়গায় লোকসান দিয়ে কোমর ভেঙে গেছে। এই ভয় ছিল আগাগোড়া, আভাসও পেয়েছিলুম বহু পূর্বে। এবার চিরবিদায় নিতে হবে বর্মা থেকে।

সেদিন বিকেলে পুলিস ইনস্‌পেকটর দত্তের সঙ্গে বসে গল্প করছিলুম, বলছিলুম বাঙালীর ব্যবসায় নষ্ট হবার কারণ কি, এমন সময় চাকর একটা কার্ড এনে আমার হাতে দিল! 'Miss Ri Win Jones.'

আমি ইতস্তত করে দত্তমহাশয়ের হাতে কার্ডখানা দিলুম। তিনি বললেন, এ্যাংলো-বর্মান। চাকরকে ডাকতে বললুম।

অতি পরিচিত মুখ! চিনতে পেরেছি!!

সে বললে, I think I am speaking to Mr.…

আমি দেখলুম সমূহ বিপদ, দত্তের পরিচয়টা দেওয়া প্রয়োজন, নয়তো বেফাঁস কথা বলতে কতক্ষণ। বললুম, Yes, I am, please and he is Mr. Dutt, Inspector of Police, Special Branch.

Miss Ri Win ভ্রূ কুঁচকালেন মাত্র। তারপর হাতব্যাগ খুলতে খুলতে বললেন, আমি শুনলুম আপনি নাকি জীবনবীমা করবেন—নর্থ বৃটিশ থেকে।

বললুম, হাঁ, কিন্তু আপনি দশ-পনেরো মিনিট পরে আসবেন, নয়তো পাশের ঘরে বসুন, আমার দরকারী কথা রয়েছে এঁর সঙ্গে, কিছুক্ষণ আপনার দেরী করতে হবে।

দত্ত সাহেবের চোখ পড়েছে সুন্দরী মেয়েটার ওপর, তিনি বললেন, এমন সুন্দর বর্মিনী তো দেখি নি কখনও!

—মাকাল ফল। সাহেব কোম্পানীর এজেন্ট, বুঝতেই তো পারছেন।

—কোন্ কোম্পানীর? নর্থ বৃটিশ?

বললুম, হাঁ! তাই তো বললে।

দত্তমশায় বললেন, আমার একটা পলিসি lapse করেছে, জিজ্ঞেস করবেন তো মাগীটাকে, revive করা যায় কি না?—আচ্ছা আসি, যদি revive করা যায়, আমার অফিসে একবার আসতে বলবেন। তবে চললুম।

পাশের ঘরে নজর দিতে দিতে দত্তসাহেব নীচে নেমে গেলেন।

বাইরের দরজাটা বন্ধ করে বললুম, তাঁরপর মিস্ শান্তিলতা কবে থেকে ইনসিওরের এজেন্সী নিয়েছেন?

—মিনিট পাঁচেক আগে। বলেই সে হেসে ফেললে।

আমি হাসতে হাসতে বললুম, আজ যদি ধরিয়ে দিতুম।

—শাস্তি দিতে পারত না! দাদাকে ডেকে সনাক্ত করা বিনে উপায় ছিল না। দাদার খবর জানেও না কেউ!

—ধন্য সাহস আপনাদের!

—এটুকু সাহস না থাকলে, দেশের মুক্তিযুদ্ধে আসতে পারতুম কি?

অনেক কথাই হল।

শেষে সে বললে, আজকের রাতে এখানেই আমাকে থাকতে হবে।

—বেশ, আমি হোটেলে যাচ্ছি!

—না, দুজনকেই থাকতে হবে। ভয় নেই, অক্সফোর্ডের গ্রাজুয়েট, প্রেম-বিদ্যালয়ের ছাত্রী নই।

যেন কত পরিচিত এমনি ভাবে সে বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এসে বললে—চা আনান। তারপর আমাদের দেশটা দেখলেন কেমন?

—সব তো দেখা হয় নি, উদাসভাবে উত্তর দিলুম।

হিটারের প্লাগ দিতেই সে বললে, হয়েছে, হয়েছে, ও আমি করে নিতে পারব। তার চেয়ে বলুন, রেঙ্গুনে ভালো-মন্দ কি দেখলেন?

—ভালোটা দেখতে হলে স্ট্রাণ্ড রোডের বস্তীগুলোতে যেতে হয়, আর মন্দটা দেখতে হলে হোটেলে বারে ঢুকতে হয়।

—আপনার দেশে এত মদের দোকান আছে কি?

—আছে, তবে যতগুলি রেঙ্গুন শহরে আছে তার অর্ধেকও আমরা কলকাতায় দেখি নি। থাকলেও প্রকাশ্যে এভাবে মদের ব্যবসায় চলে না। ভারতের মেয়েরা মদের দোকানে বসে মদ খাবে, এটা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। সেদিন এক বন্ধু নিয়ে গিয়েছিল একটা বড় হোটেলে, সেখানে প্যারিসের এক নর্তকীর নাচ দেখতে।—আমি অস্বীকার করলুম, কিন্তু চার-পাঁচজন ধরে বসলে, যদি ভালো না লাগে তা হলে চলে আসবেন।

—তা হলে রেঙ্গুনের স্বর্গ দেখেছেন; ক্লাবগুলোতে যান নি বুঝি?

—যাবার মত পয়সা কোথায়? বিনা মূল্যে ফরাসী নাচ দেখতে পেয়েছিলুম বলে কি সব জায়গায় মাগনা হয়। তার ওপর, পুরুষ আর মেয়ের অর্ধোলঙ্গ নাচ, অত্যধিক মদ্যপানজনিত অশ্লীল ভাষা ব্যবহার, তার ওপর বিশ্রামকালে জোড়া ধরে কোণায় কোণায় ঘোরা—অন্যের ভালো লাগলেও আমার ভালো লাগে নি। আচ্ছা বলুন তো, আপনিও তো বিলেতে ছিলেন, সেখানে কি মেয়ে-পুরুষে এমনই নির্লজ্জভাবে নাচতে নাচতে জড়াজড়ি করে কার্পেটের ওপর লোটাতে থাকে!

আমাদের দেশ তো বিলেত নয়, আর ভারত আর বর্মা এপাড়া-সেপাড়া। এখানে এইগুলো কি বরদাস্ত করা যায়। মা-মে গুম্ হয়ে বসে চা তৈরি করছিল, আমার কথার জবাব না দিয়ে শুধু মুখ তুলে আমার দিকে চাইল।

—কই জবাব দিন!

—জবাব দেব বই কি! এই অশ্লীল দৃশ্য আপনি দেখেছেন বলেই কি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন? বর্মায় নোংরামি সৃষ্টি করেছে ইংরেজ। কিন্তু ইংরেজের দেশের ইংরেজ আর প্রবাসের ইংরেজে কত যে পার্থক্য, তা না দেখলে মুখের ভাষায় বলা যায় না। ইংরেজের ডিনার টেবিলে মদ থাকে, মদে চুমুক দিয়েই তারা বিশ্ব রাজনীতি চালায়। তারা জীবনকে উপভোগ করতে জানে, আবার জীবনকে উৎসর্গ করতেও জানে, কিন্তু নিজের দেশে তাদের সমাজ-জীবন নোংরা নয়। হয়তো কোথাও ইতর লোকদের মধ্যে নোংরামি আছে, কিন্তু অতি সাধারণ সমাজেও কত হিসেব করে তারা চলে! আমাদের দেশে এই বীভৎস ভোগ রয়েছে বলেই আজ ফাসাফালা রাজ্য চলেছে!

চা খেয়ে বললুম, চলুন বেড়িয়ে আসি।

—কোথায়?

—নদীর ধারে।

কি যেন ভেবে সে বললে, আপনার বাঙালী কোন বন্ধু সপরিবারে কাছে কোথাও থাকেন কি?

আমি বললুম কেন?

—একখানা শাড়ি আর একখানা ব্লাউজ আনতে পারেন তাদের কাছ থেকে?

—পারি, কিন্তু তাতে নানা রকম প্রশ্ন উঠবে। তার চেয়ে আপনি বসুন, আমি একখানা শাড়ি আর ব্লাউজ কিনে আনছি।

—বেশ তাই ভালো।

আমি বাজারে বেরিয়ে পড়লুম।

কিছুক্ষণ পরে শাড়ি আর ব্লাউজ নিয়ে এসে দেখি, আমার ঘর-দুয়ার পরিষ্কার তকতকে করে শ্রীমতী রান্নাঘর নিয়ে ব্যস্ত।

হেসে জিজ্ঞেস করলুম, এ কি হচ্ছে?

—মেয়েছেলে কি বসে থাকতে পারে? কি নোংরা যে আপনি?

আমার উত্তর দেবার সামর্থ্য কোথায়!!

যেন ঘরের পরিবার নিয়ে বেরিয়েছি।

দুজনে এসে জেটিতে বসলুম। মা-মে'কে দেখে কারুর বলবার উপায় নেই, সে বাঙালী ঘরের মেয়ে নয়। রাস্তায় সে আমার ইতস্তত পদক্ষেপ লক্ষ্য করে বললে, বড়ই ঘাবড়ে গেছেন দেখছি। ঐ দেখুন না কেমন বর্মিনী নিয়ে মাদ্রাজী ভদ্রলোকটি চলেছেন। ওদের বর্মিনী নিয়ে বেড়াতে সংকোচ নেই, আর আপনি বাঙালী বউটা নিয়ে চলতে লজ্জা পাচ্ছেন!

—আমার বৌ হলে?

—অন্তত আজকের বেড়ানোর আনন্দটা নষ্ট করবেন না। পাঁচ মিনিটের জন্য যদি ইনসিওর এজেন্ট হতে পারি, এক ঘণ্টার জন্য কি আপনার বউ সাজতে পারব না! দেখুন তো মাথার সিঁদুরটা ঠিক হয়েছে তো? লিপ্‌স্টিকের সিঁদুর! বলে সে হাসল।

—ঠিক তো হয়েছে, কিন্তু শাঁখাটা নেই তাই ফাঁকা ফাঁকা মনে হচ্ছে।

—আজকের যুগে শাঁখা অচল।

বাদাম ভাজা কিনে দুজনে চিবুতে থাকি।

দেখতে দেখ্‌তে সন্ধ্যে গড়িয়ে অনেক রাত হয়ে গেল।

বললুম, চলুন ফেরা যাক্‌।

—বসুন না আর একটু, লণ্ডনে থাকতে টেমসের কিনারায় গিয়ে রোজ বসতুম। নদীর স্রোতের সঙ্গে আমার মনও ভেসে চলত—বড় একটা সমুদ্রের সঙ্গে মিশতে। দশ বছর আগে এই জেটিটায় বসবার স্থান মিলত না, রাত বারোটা অবধি কত লোক করত আনাগোনা—আর আজ দেখুন, লোকজন সন্ধ্যে লাগতেই ভেগে পড়েছে। এখানে কেন, অফিস-আদালত সাড়ে চারটের মধ্যে বন্ধ করে যে যার মতন ঘরে ছুটে চলে—সবারই চোখে ভয় আর সবাই উদ্বিগ্ন। অতি দরকারী টেলিগ্রামগুলোও পাঁচটার পর বিলি হয় না। আমি শুনে চলেছি তার কথা। ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীত শীত করছিল, বললুম, চলুন যাই অনেক রাত হয়েছে। হোটেলে খেয়ে বাড়ি ফেরা যাক।

—ভয় পাবেন না। আমার কাছে যথেষ্ট শক্তি আছে, কেউ কোন বিপদ ঘটাতে চাইলেও পারবে না। বলে শাড়ির তলা থেকে দুটো পিস্তল বের করে আমায় দেখাল। তারপর আবার বলতে থাকে, হোটেলে খেতে আমার ঘেন্না লাগে। বাড়িতেই আলুসেদ্ধ ভাত করে নেব।

—কিন্তু করবে কে?

—আমি করব। সে চিন্তাও করবেন না, বিলেতে থেকে পাস করে এসেছি বলে কি, ঘর-গেরস্থালীর কাজ ভুলে গেছি? বরং চলুন সুলেফয়া বৌদ্ধ মন্দির দেখে আসি।

—তাই চলুন।

রাস্তায় উঠে তার কলকণ্ঠ বন্ধ হয়ে গেল।

আমায় চুপি চুপি বললে, পেছনে দেখুন তো, কে আমাদের অনুসরণ করছে না?

তাকিয়ে বললুম, তাই তো মনে হচ্ছে।

—এই পাশের গলিটায় আসুন, আপনি এগিয়ে যাবেন, আমি ওকে ধরব। আমার গলার শব্দ পাওয়া মাত্র ফিরে আসবেন কিন্তু।

পাশের গলিটায় সে আত্মগোপন করলে একটা বোমা-বিধ্বস্ত ঘরের কোণায়, আমি এগিয়ে চললুম।

হঠাৎ গলার শব্দ এল, হাত ওঠাও।

পেছনে শব্দ শুনে আমিও প্রতিশ্রুতিমত ফিরলুম।

বেশি এগোতে আর হল না, দুজনেই আমার কাছে এসে গেছে।

মা-মে বললে, চিনতে পারেন এঁকে?

লাইট পোস্টের তলায় একটা বর্মী কুলির মত লোকের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখতে থাকি, কিন্তু চিনতে পারলুম না। বললুম, না তো!

—ও ভগবান, এ যে উ-টুন্-পে!

—তাও ভালো।

সুলেফয়া ঘুরে এসে বন্দুলা বাগানে বসলুম।

উ-টুন্-পে'কে জিজ্ঞেস করলুম—এই শহরে আপনাদের কত লোক আছে?

—তা ষোলো হাজারের উপর।

তারা থাকে কোথায়?

—কেউ সরকারী কর্মচারী, কেউ রিক্‌সাওয়ালা; অর্থাৎ ছোটবড সব কাজেই ওরা আছে। হয়তো বা বি-এ পাস করে রিক্‌সা বইছে। সবই তো ঠিক ছিল, কিন্তু নেই আমাদের প্রয়োজনমত অস্ত্র আর রসদ।

অনেক রাতে তিনজন খাওয়া-দাওয়া শেষ করে শুতে গেলুম।

মা-মে তার বিছানা থেকেই জিজ্ঞেস করে, আপনি যে আমাদের আশ্রয় দিলেন, কোন দিন ধরা পড়লে আপনার দুর্দশার একশেষ হবে।

—আমি তো এদেশে রইব না, আর আসবও না কখনও। তার ওপর আমি রাজনীতি করি না, আমার আবার ভয় কি ? যেকালে রাজনীতি করতুম, সেকালেই কোন ভয় ছিল না।

মা-মে উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞেস করেন, আসবেন না কেন ?

—আমার ব্যবসায় শুধু নষ্ট হয় নি, ঋণও হয়েছে যথেষ্ট, সব বিক্রি করে দেশের ছেলে দেশে ফিরে যাব।

উ-টুন্-পে উঠে বসে বললে, চলুন আমাদের এলাকায়, কোন কষ্টই হবে না।

—বৌ ছেলে ?

—তাদেরও আনিয়ে নেব, মা-মে উত্তর দেয়।

আর বিশেষ কথা হল না। আমি নীরবে ঘুমোবার চেষ্টা করলুম।

পরদিন সকালে দুজনে উঠেই পুরোদস্তুর বাঙালী হয়ে গেলেন।

দেখলে মনে হবে, নবদম্পতি মধুযামিনী উৎসবে রেঙ্গুন এসেছে।

চা ও খাবার খাইয়ে আর খেয়ে, ওরা বেরিয়ে গেল। কখন আসবে তাও বলে গেল না।

আমি খবরের কাগজ নিয়ে পাতা উলটে চলেছি ; এমন সময় এল সুন্দররাজ। আমার ব্যবসায় আরম্ভ করবার সময় উনি ছিলেন কর্মাধ্যক্ষ।

—আপনি কলকাতা যাচ্ছেন শুনলুম ! সে জিজ্ঞেস করলে।

বললুম, হ্যাঁ।

—ব্যবসায় কাকে দিয়ে যাচ্ছেন ?

—বন্ধ করে যাচ্ছি।

—বন্ধ করে ! আশ্চর্য হয়ে সে জিজ্ঞেস করলে।

—হ্যাঁ, রাখতে পারলুম না। দে মহাশয়ের নষ্টামির জন্যই এই সর্বনাশটা হল। টাকার অভাবে সময়মত মাল খালাস করতে না পেরে এই গোলমাল। ধার করলুম যখন, তখন বাজারে সাতচল্লিশ পারসেণ্ট দাম পড়ে গেছে।

সুন্দররাজ মনঃক্ষুন্ন হয়ে চলে গেল।

ঘরের অবস্থা অসহ্য। বের হলুম রাস্তায়। একটা 'সাইকা' (সাইকেল রিক্সার মত, যাত্রীর আসন চালকের পাশে থাকে) চেপে বের হলুম। ভবঘুরের মত ঘুরছি।

ইংরেজ আর আমেরিকার বোমায় এশিয়ার সবচেয়ে সুন্দর শহর রেঙ্গুন প্রায় জায়গাতেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। চারতলা পাঁচতলা বাড়িগুলোর ছাদ কোথাও

ধসে গেছে, দেয়ালগুলো খাড়া রয়েছে, তার মধ্যে ঝুপড়ি বেঁধে বাস করছে বর্মী আর ভারতীয় শ্রমিকের দল। স্থানে স্থানে বাড়িঘরের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। ইট বালি স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে। সভ্যতাকে ব্যঙ্গ করছে ধ্বংসলীলা।

দু-একজন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হচ্ছিল, হাত তুলে নমস্কার করে অন্যমনস্ক ভাবে চলছি। তারা সবাই 'জয়হিন্দ' বলে অভিনন্দনও জানাচ্ছে।

বর্মার আপামর ভারতীয় জনসাধারণের মুখে ঐ এক ধ্বনি—জয়হিন্দ্। নেতাজী বলতে তারা অজ্ঞান। দাসত্ব মোচনের অভিযানে ওদের দান শত শত জওহরলালের চেয়েও বেশী। কারো বংশ নির্বংশ হয়েছে, কেউ লক্ষ টাকার সম্পদ বিলিয়ে দিয়েছে আজাদী ফৌজের জন্য। আজও তারা হাসে, আজও তারা জয়হিন্দ্ বলে গর্বে বুক ফুলিয়ে চলে। দূরে বসে ভারতের মঙ্গল কামনা করে। নেতাজীর নামে আজও তারা প্রাণ দিতে প্রস্তুত। কেউ বিশ্বাস করে না, নেতাজী মরতে পারে। তারা বলে, নেতাজী বলছেন, আবার তিনি আসবেন। নেতাজীর কথা কখনও মিথ্যা হতে পারে না। তাদের কাছে নেতাজী অজর—অমর।

বাসায় এসেও উ-টুন্-পে আর মা-মে'র দেখা পেলুম না।

অবশেষে রান্না চড়ালুম।

এমন সময় এক টুকরো কাগজ নিয়ে একটা বর্মী এসে হাজির হল।

তাতে পরিষ্কার বাংলায় লেখা :

"আমরা ফিরে চললুম। নমস্কার।"

বিকেলে এলেন দত্তবাবু।

এসেই বললেন, সে মাগীটা তো যায় নি ?

বললুম, দত্তমশায়, চকচক করলেই কি সোনা হয় ?

—তবে কি !

—ওরা এসেছিল কমিউনিস্ট এলাকা থেকে, ফিরেও গেছে।

উত্তেজিত ভাবে দত্তবাবু বললেন, কালকে বললেন না কেন ?

—বলে কি লাভ ! আপনার চাকরির মেয়াদ তো একত্রিশে মার্চ পর্যন্ত। তার জন্য অনর্থক এদেশের রাজনীতিতে মাথা ঢুকিয়ে লাভ ?

—তবুও যত দিন আছি ততদিন তো বিশ্বস্ততা দেখানো উচিত।

—পুলিস কখনও বিশ্বস্ত হয় ? পুলিস আর হাকিমের সঙ্গে বন্ধুত্বও যেমন ভয়াবহ—তেমনি ভয়াবহ তাদের বিশ্বস্ততা। ক'লাখ কামিয়েছেন এই কবছরে ?

দত্তবাবু অসন্তুষ্ট হলেন, আমার সাফ সাফ কথা তাঁর ভালো লাগে নি। অবস্থা লক্ষ্য করে বললুম—তার চেয়ে আমায় আটক করুন না কেন?

চিন্তিত ভাবে তিনি বললেন, পাগোল!

সেদিন বিকেল বেলায় পার্লামেন্টের পেছন দিকটায় দাঁড়িয়ে বাসের প্রতীক্ষা করছিলুম, ইচ্ছে ছিল হনুমানজীর মন্দিরে যাব। এমন সময় দেখা হল বিশ্বাস সাহেবের সঙ্গে। অনেকদিন আগের সামান্য পরিচয়।

বিশ্বাস সাহেব ঢাকা জেলার লোক। জাতিতে মুসলমান। থাকেন তিনান্‌জোন্‌। তাঁর বাড়িতে একদিন গিয়েছিলুম। ইনি নেতাজীর সহকর্মী ছিলেন। ওঁরই জমিতে বর্মায় ভারতীয় ফৌজের মস্ত ঘাঁটি ছিল। তাঁর কাছে অনেক গল্প শুনেছিলুম নেতাজী সম্বন্ধে। হাসিখুশি সদালাপী ভদ্রলোক।

প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে বর্মায় এসেছিলেন একটি হিন্দু মহিলাকে নিয়ে। মহিলাটির নাম 'কৃষ্ণভামিনী'—পবিত্র ইসলামী মতে বিয়েও করেছিলেন।

অপুত্রক বিশ্বাস সাহেব সাধারণ্যে 'দাদু' বলে পরিচিত। সারাজীবনে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছেন, তার মধ্যে এগারো-বারো লক্ষ টাকা আজাদী ফণ্ডে দানও করেছেন। বর্তমানে যে সম্পত্তি ওঁর আছে, তার মূল্য সত্তর-আশী হাজার টাকা।

বিশ্বাস সাহেবের পরিচয়টা এত করে দেবার কারণ এ নয় যে, তিনি বিরাট ব্যক্তি। তবে, গল্প শুনেছি মানসিংহের পিসী, জাহাঙ্গীর বাদশাহের মাতা, আকবরের যোধপুরী বেগম নাকি ফতেপুরের হারেমে বসে শিব পূজো করতেন। গল্পটা গল্পই। কিন্তু, বিশ্বাস সাহেবের বাড়িতে গিয়ে দেখলুম, গল্পও অনেক সময় সত্য হয়। শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী বিশ্বাস ঘরের কোণায় লক্ষ্মী পূজো করেন, পালপার্বণ তাঁর বাদ যায় না। আর বিশ্বাস সাহেব নমাজ, আর রোজা করে দিন কাটান।

প্রতিবেশীর কাছে শুনেছি দুজনের মিল মহব্বৎ যথেষ্ট। বিশ্বাস সাহেবের সব সম্পত্তি তাঁর স্ত্রীর নামে। বিশ্বাস সাহেবের বিশ্বস্ততার ন্যাস-রক্ষক বললে অত্যুক্তি করা হবে না।

আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, বিশ্বাস সাহেবের স্ত্রীর একবার কাশী যাবার ইচ্ছে হল। রাষ্ট্রদূত অফিসে পাসপোর্ট চাওয়া মাত্র তাঁকে ভারতীয় পাসপোর্ট দেওয়া হল, কিন্তু গোলমাল হল বিশ্বাস সাহেবকে নিয়ে। তিনি ঢাকা জেলার লোক, তায় মুসমলান, অতএব খাস পাকিস্তানী। তাঁকে পাসপোর্ট দেওয়া হল না।

তিনিও নাছোড়বান্দা. তিনি বললেন, আমি ভারতায়, আমি পাকিস্তানী নই। আমরা ভারতীয় হিসেবেই জন্মেছি, তোমরা জোর করে পাকিস্তান বানিয়েছ বলেই কি আমি পাকিস্তানী? মুসলমান হলেই পাকিস্তানী হতে হবে, এ কোন্ দেশী বিচার!

তবুও পাসপোর্ট মেলে না! তিনি সরকারী চাকরি করতেন, তার রেকর্ড এনে দেখালেন যে তিনি ভারতীয়, কিন্তু ভবি আর ভোলে না।

অবশেষে খাস রাষ্ট্রদূতকে গিয়ে বললেন, যদি তোমরা আমায় ভারতীয় বলে স্বীকার না কর, তা হলে দাও আমার বারো লাখ টাকা। এ টাকা আমি দিয়েছিলুম ভারতের স্বাধীনতার জন্য, পাকিস্তান তৈরীর জন্য নয়! যদি আমি ভারতীয় না হই তা হলে আমার টাকা আমায় ফেরত দিতে হবে। আজাদ হিন্দ সরকারের রসিদ তুলে ধরলেন রাষ্ট্রদূতের সামনে।

অবশেষে খবর গেল দিল্লীতে। তাইতো, সমস্যা গুরুতর।

পেলেন উনি ভারতীয় নাগরিক অধিকার।

জানি না, কতটা সত্য, তবে পাসপোর্টটা তাঁর আমি দেখেছি।

সেই বিশ্বাস সাহেবের সঙ্গে দেখা।

বললুম, শীগ্‌গীর চলে যাচ্ছি দেশে। তিনি নেমন্তন্ন করলেন, বললেন, আমার ওখানে আসবেন যাবার আগে অন্তত একবার।

যাওয়া আর হয় নি।

মালয় হয়ে দেশে ফিরবার দু-একদিন বাকি।

এমন সময় একদিন এলেন এক শিখ ভদ্রলোক।

আমার হাতে একখানা চিঠি দিলেন, পড়েই বললুম, বহুৎ শুক্‌রিয়া, অব মের অ্যায়সা কোই কাম নেহি, জিসকো লিয়ে আপকো মদদ্ লে সক্‌তা।

শিখ ভদ্রলোকটি বাংলায় বললেন, যদি দরকার হয় খবর দেবেন, আমি গুরুদ্বারে আছি।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। কিন্তু আপনি এমন সুন্দর বাংলা শিখলেন কোথা থেকে?

—বাংলায় জন্মেছি, বড় হয়েছি। বলে হাসতে হাসতে তিনি নেমে গেলেন।

মনটা বড়ই অস্থির। কোন কাজেই স্থির হতে পারছি না। অর্থনৈতিক দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে। ভেতরে ভেতরে শিউরে উঠছি। ফিরতে হবে মালয়ের পথে।

বর্মার কথা লিখে শেষ করতে পারি নি। মালয় দেশে গিয়ে তোমায় আবার লিখব।

এবারকার চিঠির শেষ কথা বলে, নিজের মূর্খামিকে ব্যঙ্গ করতে পারব মনে করে, একটা ঘটনা লিখছি।

মালয়গামী প্লেনের টিকিট কিনবার অপেক্ষায় বসে আছি। এমন সময় একজন বর্মা মজুর এসে আমায় একখানা চিঠি দিয়ে গেল।

> 'আপনার অপেক্ষায় কদিন গুরুদ্বারে বসে ছিলুম। আপনি না আসায়, বুঝলুম আপনার প্রয়োজন নেই। সেইজন্য আজ ফিরছি। আপনার যাত্রাপথ নিরাপদ হোক।—ঘোষাল'

ঘোষাল! আমার সম্মুখে যদি পৃথিবী ওলোট-পালোট হত, তাতেও এত আশ্চর্য হতুম না, যত আশ্চর্য হলুম শিখকে ঘোষাল ভাবতে।

কোন দিন যদি দেখাও হয়, তাকে চিনতে পারব না নিশ্চয়।

দুনিয়াটা যেন কেমন ঘোলাটে হয়ে উঠল। নিজের ভারসাম্য বোধহয় রাখতে পারছি না।

মাথার মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল—ঘোষাল! ঘোষাল!!

তবে কি!!!

তামউইয়ে

—রেঙ্গুন, ৬ই নভেম্বর, ১৯৫১

তিন

প্রবাদ আছে: Man proposes and God disposes. মালয়ের টিকিট কেনা হল না।

যদি মানুষ তার ইচ্ছামত কাজ করে চলতে পারত, তা হলে হয় পৃথিবীটা স্বর্গে পরিণত হত, না হয় নরকে। ঈশ্বর বিফলতা এনে দেয় কিনা, সে বিষয়ে তর্ক করবার নেই, তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা মানুষকে নিষ্ফল হতে বাধ্য করে, এটা বিশ্বাস করি। সেজন্য কোন ঘটনাকে অপ্রত্যাশিত বলে মনে করতে পারি না, পারি না দুর্ভাগ্য বলে স্বীকার করতে। খুনী যখন খালাস পেয়ে আসে তখন যে অবস্থা, তেমনি নির্দোষের ফাঁসি হওয়া। কোথাও কিছু নূতনত্ব নেই; বরং মনে হয় বড়ই আটপৌরে।

মা-মে আর উ-টুন্-পে'র আসাটাও যেমন নাটকীয়, তেমনি তাদের যাওয়াটা। তাদের কর্মতালিকায় আমার কোন স্থান নেই বলেই নিশ্চিন্ত না হলেও সোয়াস্তি পেলুম।

যাই হোক, ঘটনাচক্রে মালয়ের টিকিট পেলুম না।

অযাচিত ভাবে এলেন চক্কোত্তি মশায়।

চক্কোত্তি পুলিসের ছোটখাটো অফিসার। বর্মার ন্যাশনালিটি নিয়েছেন অর্থাৎ বর্মী। আমার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে হঠাৎ।

রেঙ্গুনের দু-চারজন বাঙালীর সঙ্গে পরিচয় করতে বাধ্য হয়েছিলুম, তার মধ্যে একজন ছিলেন আমার সমব্যবসায়ী। যুদ্ধের পরে তিনি একটি পার্শী রমণীকে নিয়ে বর্মায় এসেছিলেন, অবশ্য তাঁর পূর্ব স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও। তিনি বেশ জাঁকিয়ে বসেছিলেন, এমন সময় আমার আবির্ভাব উনি সুচক্ষে দেখেন নি। তার ওপর কথায়-বার্তায় যখন বুঝলেন যে, ওঁর আত্মীয়-স্বজন দু-চার জনের সঙ্গে আমার জানাশোনা রয়েছে, তখন উনি ভাবলেন, হাটে হাঁড়ি আমি ভাঙতে পারি। এইটে হল তাঁর চক্ষুশূল আর মনঃপীড়ার কারণ।

এটা যে শুধু এঁর পক্ষেই প্রযোজ্য তা নয়, বর্মায় অলিতে-গলিতে এরকম সুমতিসম্পন্ন অনেক বাঙালীকে কিন্তু খুঁজে পেতে দেরী হয় না।

তবুও উনি আমায় সুচক্ষে দেখলেন না, বেনামীতে চিঠি ছাড়লেন, একজন বাঙালী কমিউনিস্ট এসে লুকিয়ে আছেন—নং রাস্তায়।

তার খোঁজ নিতে এসেছিলেন চক্কোত্তিবাবু। এই থেকেই পরিচয়। আর চক্কোত্তিবাবুর সূত্রেই আবার দত্ত মশায়ের সঙ্গে পরিচয়।

বিনা ভূমিকায় চক্কোত্তিবাবু বললেন, দত্ত সাহেবের সঙ্গে আপনার কোন কথা হয়েছে কি ?

আমি বললুম, অনেক কথাই হয়েছে। কেন ?

—আপনার নামে 'ইন্‌কোয়ারী স্লিপ' যাচ্ছে ইণ্ডিয়া আর পাকিস্তানে। হেসে বললুম, লাভ কি ? এদেশ থেকে বের করে দেওয়া তো ?

—শুধু দেওয়া নয়, আসতেও না দেওয়া। চক্কোত্তি গম্ভীরভাবে আবার বললেন, আপনাকে কতবার বলেছি, চৌধুরীর সঙ্গে ওর খুব আলাপ, ও একবার আপনাকে খোঁচা না দিয়ে ছাড়বে না ! যাক্‌, কবে যাচ্ছেন ?

—যাবার চেষ্টায় ছিলুম, কিন্তু টিকিট পেলুম না।

—কলকাতার টিকিট পেলেন না ! I. N. A.-তে জায়গা না থাকলেও, Orient রয়েছে, U. B. A. রয়েছে, B. O. A. C. রয়েছে, যে কোনটার একটায় নিশ্চয় পেতেন।

—পেতুম ও পাবই, তবে সময় নেবে। সাময়িকভাবে যারা আসে, তাদের এদেশের টাকায় টিকিট দেয় না। যে দেশ থেকে এসেছি, সে দেশের টাকা না হলে টিকিট দেওয়া বে-আইনী। তাই আমার দরকার ভারতীয় টাকার। কিন্তু ভারতীয় টাকা আমার নেই, আমি বর্মায় এসে Imperial Bank-এর মারফত বর্মার টাকা পেয়েছি—এটুকু মাত্র অসুবিধা।

—Imperial Bank থেকে একটা নিদর্শন পত্র নিয়ে আসুন না কেন।

—তারাও দশটাকা মেহনতী চায়, বলে আমি হাসলুম।

—কুকের অফিসে কমিশন দিলে টাকা বদল হয়, সেখানে চেষ্টা করেছেন ?

আমি বললুম, কাজটা যতটা হালকা মনে হচ্ছে, অতটা হালকা নয়। যাই হোক, মালয় যাবার ইচ্ছে রয়েছে, তার ব্যবস্থা করতে পারেন ?

প্লেনের কথা বলতে পারি না, তবে কালকে একখানা জাহাজ পেনাং সিঙ্গাপুর হয়ে জাপান যাচ্ছে, সেইটেতে জায়গা দেখলে মন্দ হয় না। দিন টাকা আর কাগজপত্র ; দেখি কি করা যায়।

পুলিসে চাকরি করলে কিন্তু সব সময় অসৎ হবে এ মনে করা ভুল।

হাজারে দু-একজন খুবই ভালো থাকেন, যাঁদের কার্যকলাপ কিন্তু মোটেই পুলিসী নয়।

চক্রোত্তিবাবুকে মাঝে মাঝে বলতুম, আপনি কি করে পুলিসে চাকরি পেলেন ? আপনার মনোবৃত্তির সঙ্গে এ পেশা খাপ খায় না।

'সিরধানা'—আট হাজার টনী জাহাজ, কলকাতা থেকে জাপান যাচ্ছে।

জাহাজের মালিক ইংরেজ, পরিচালক ইংরেজ, ব্যবস্থা ইংরেজী।

ইংরেজী ব্যবস্থার বিধিতে নিজেদের থাকে প্রচুর সুখ-সুবিধার বন্দোবস্ত আর অন্যের জন্য মজুদ রাখে প্রচুর কষ্ট ও অসুবিধা।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যবস্থা নেই। কেবিন শ্বেতচর্মাচ্ছাদিত।

মধ্যম শ্রেণীতে ইংরেজের মালয় শাসনের যন্ত্র গোর্খা সৈন্য।

অতএব ডেক নামক একশো এগারো নম্বরের ব্যবস্থা।

'শ্রীকান্ত' পুস্তকে ডেকের বর্ণনা পড়েছিলুম, কিন্তু ডেকের বাস্তব ব্যবস্থা আরও ভয়াবহ। আমাদের ভাগ্যবিধাতারা রেলের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুবিধা দিতে চেষ্টা করছেন, শুনেছি। কোন কোন কামরায় বিজলী পাখারও বন্দোবস্ত করেছেন, কিন্তু জাহাজের দিকে নজর দেবার অবসর তাঁরা পান নি। জাহাজের অন্ধকার খোলে বায়ুর স্বচ্ছতা যেমন মহার্ঘ, তেমনি ভ্যাপসা গরমে দম বন্ধ হয়ে আসে। অবশ্য মাঝদরিয়াতে অত কষ্ট হয় না। গরু-ছাগলের খোঁয়াড়ের ওপরটা তাও খোলা থাকে, কিন্তু এটা যেন সার্কাসের বাঘের খাঁচা। দরকার হলে সবদিকই বন্ধ করা যায়।

অনেককেই বিদায় অভিনন্দন জানাতে এসেছে তাদের আত্মীয়স্বজন। ওপাশের জেটি থেকে একজন বর্মিনী রুমাল ওড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে সেই রুমালে চোখও মুছছে। ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে এক মাদ্রাজী পুঙ্গব রুমাল উড়িয়ে তাকে বিদায় জানাচ্ছে। মাদ্রাজীটিরও চোখে জল।

আমাকে বিদায় জানাতে কেউ আসে নি। আমি দর্শক ও শ্রোতা মাত্র।

বিরহিণী বর্মিনীর কথা ভাবতে চেষ্টা করছিলুম, এমন সময় সেই মাদ্রাজীটি এসে আমার পাশে দাঁড়াল।

কথায় কথায় তার অনুরাগের কথা বললে, বললে আরও কত কি। ভাঙাভাঙা হিন্দীটা তার মুখ থেকে শুনতে সুন্দর লাগছিল। কথ্য বিষয়ের চেয়ে ভাষ্যটা যেন বেশি আকর্ষণ করছিল।

বর্মিনীটি তার স্ত্রী, দেশেও তার আছে এক মাদ্রাজী পত্নী। দু দেশটায় ভাগ করে যেমন তাকে থাকতে হয়, তেমনি ভাগ করতে হয় ভালোবাসাকে।

অবশ্য তার গভীরতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে। পরে বলব এসব কথা।

ডেকে দাঁড়িয়ে, পেছনে ফেলে-আসা জাহাজঘাটার দিকে চেয়ে ছিলুম। ধীরে ধীরে জাহাজ সমুদ্রের দিকে এগোতে থাকে, কিন্তু সামনের ব্রীজে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিলুম, বর্মিনীটির ছাতা। জাহাজ যতক্ষণ দেখা যাচ্ছিল, ততক্ষণ বর্মিনীটি নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে ছিল।

ব্রীজের ও-কোণাটায় খালাসীরা জল মাপছিল—ছয় বাঁও-এক হাত কম আট বাঁও।

তাদের চিৎকার শুনে কাপ্তেনও জাহাজের পথ ও গতি ঠিক করছিল। আমি গায়ে পড়ে খালাসীদের জিজ্ঞাসা করলুম, সমুদ্রে পৌঁছাতে কত সময় লাগবে?

—খ্‌ইতাম ফারতাম্ না, জবাব দেয় তাদের একজন। আবার বলে, ফানির মাপ ঠিক থাইলে বারোটা নাগাদ জাহাজ দরিয়ায় যাইত।

অপরজন আমাদের কথা শুনছিল।

দুজনেই চট্টগ্রামী। বাংলায় কথা বলছিল। দ্বিতীয়জন জলমাপা সেরে উদগ্রীব হয়ে বললে, কোথায় যাবেন বাবুমশা' ?

আমি উত্তর দিলুম, সিঙ্গাপুর।

—আর কেউ আছে আপনার সঙ্গে ?

—আমি একা।

সে একটু মুরুব্বী চালেই বললে, সিঙ্গাপুরে বাঙালীরা আর আজকাল বেশী যায় না। গোটা জাহাজটায় আর একজন বাঙালী পাবেন কিনা সন্দেহ।

তারা রওনা হচ্ছিল, শেষের জন অবশেষে বললে, যাবেন আমাদের কেবিনে, একা একা কি সময় কাটবে ?

—কোথায় আপনাদের কেবিন ?

—পেছনের ব্রীজে, যে কোন খালাসীকে বলবেন সুলতানের কথা, তা হলেই আপনাকে কেবিনে নিয়ে যাবে।

এই আমার প্রথম সমুদ্রযাত্রা। জাহাজেও এই প্রথম ওঠা। সেজন্য জাহাজে চলবার ফিরবার পথঘাট আমি জানতুম না, তাই সুলতানের অনুরোধ রক্ষা করবার ইচ্ছা থাকলেও রক্ষা করতে সে বেলা আর পারলুম না।

নদীর ঘোলা জল পার হয়ে, যখন সমুদ্রের বুকে জাহাজ এল, তখন বেলা দুটো হবে মনে হয়, এমন সময় সুলতানের সঙ্গে দেখা।

আমায় বললে, কৈ আমাদের ওখানে এলেন না তো?

নিজের অজ্ঞতার কথা অকপটে তাকে বললুম। সে জিজ্ঞেস করলে, তা হলে এই বুঝি প্রথম সমুদ্রে আসা হল?

—হাঁ।

—আগে রেঙ্গুনে এসেছিলেন কি করে?

—উড়ো জাহাজে।

সে আমায় তার পেছন পেছন নিয়ে চলল তাদের আস্তানায়।

যেখানটায় জাহাজের শেষ, সেখানটায় একটা ছোট দরজা দিয়ে সে আমাকে নিয়ে জাহাজের খোলের অতল গহ্বরে একটা ছোট কামরায় বসালে।

সে নানাভাবে আমার কুশল সংবাদ নিল, সারাদিন স্নান হয় নি বলে আমায় তাদের গোসলখানায় স্নান করতে বললে—গরমপানি, ঠাণ্ডাপানি সবই আছে নিজের সুবিধেমত গোসল করতে পারবেন।

আমি তার কথায় লক্ষ্য না রেখে দেখছিলুম সেই কামরাটার অবস্থা। ছ'হাত চওড়া, আর আট হাত লম্বা—বোধ হয় এটাও বেশি বলছি, যাই হোক এমনিধারা, উঁচুতে পাঁচ হাত হতে পারে। খাবারের দোকানে যেমন আলমারিতে থাক থাক করে খাবার সাজানো থাকে, এদের শয্যাব্যবস্থাও তেমনি। লোহার মাচাং, তার ওপর মাচাং। এমনি ভাবে আটজনের বাসস্থান। তিনজন লোক স্বচ্ছন্দে যে কামরায় শুতে পারে না, সে কামরায় আটজন বসবাস, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, উঃ, কল্পনাও করা যায় না। মুর্গীর খাঁচায় মুর্গীভতি দেওয়া হয়েছে যেন। কলকাতার বস্তি অথবা সরকারী আশ্রয়প্রার্থী-শিবিরে বোধহয় সময় সময় ওপরের আকাশ দেখা যায়, দেখা যায় সকালের সূর্য। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানীর সভ্য ব্যবস্থায়, ভারতীয় আর পাকিস্তানী খালাসীদের বস্তি আর সাহায্য-শিবিরের চেয়েও ভীতিপ্রদ অবস্থায় বাস করতে হয় এই সব দূরগামী জাহাজে।

তবুও ছিল বাঁচোয়া, কিন্তু এটুকু খাঁচায় বসে দুজনে হুঁকাও টানছে আরামে আর কজন একজোট হয়ে তাসের জুয়াও খেলছে। কেউ আবার মাছ ধরবার জাল বুনছে। হয়তো দুবছর পর সে ফিরবে বাড়িতে, সেখান সে বেকার থাকতে পারে না, জাপানে সস্তায় হয়তো কিনেছে সুতো, অবসর সময়ে তারই সদ্ব্যবহার করছে। ছুটির দিনে No work, no pay.

বাঙালীরা নাবিক জাত। ভারত আর পাকিস্তানের অধিবাসীরা একচেটিয়া খালাসীর কাজ করছে একশো বছরের ওপর থেকে। এদের আবার বৃহত্তর অংশই আসে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি আর বরিশাল থেকে। কিছুটা আসে মুর্শিদাবাদ আর

চব্বিশ পরগনা থেকে। তারা সবাই মুসলমান। কঙ্কনের মারাঠীও দেখা যায়—তাদের বেশির ভাগ খৃস্টান। কোন কোন জাহাজে গোয়ানীজও আছে।

শুনেছি বাঙালী হিন্দুর ছেলে মোটেই একাজে আসে না। কলকাতার ফুটপাথে তো বেকারের ভিড় কম নয়। অথচ ভারতে রেজেস্টারি করা জাহাজে তারা কাজ নেয় না কেন—এটা বুঝে উঠতে পারি না।

সমুদ্রের জীবন অতি আনন্দের। অনেক সময় একঘেয়ে হয়। কিন্তু ভালো করে দেখেশুনে থাকলে, এর চেয়ে বেশি আনন্দ পাওয়া দুষ্কর। ঘর-সংসার পেতে চলেছে অনেকেই। রান্নাবান্নাও করছে, বউ-ছেলে নিয়ে দিব্যি পথশ্রম বিনোদনও চলছে।

সুলতান আনল চা।

অনিচ্ছা জ্ঞাপন করতেই সে বললে, জাত যাবে না, চায়ে দোষ নেই।

কিছুক্ষণ আগেই নীচের ডেকে দেখে এসেছি দুটো মাদ্রাজী পরিবার কলহ শুরু করেছে ছোঁয়াছুয়ির অজুহাতে—বাক্স-ডেক্স দিয়ে ঘেরা এলাকায় কোনরকমে তাঁতির একটা ছেলে এসে জলের কুঁজোটা ছুঁয়েছে মাত্র, অমনি শুরু তাণ্ডব, কেননা বাক্স-ডেক্সের অন্তরালে বাস করছিলেন এক ব্রাহ্মণদম্পতি। আর যায় কোথায়!

আমি সুলতানের চায়ের গেলাসটা তুলে নিয়ে বললুম, সুলতান মিঞা, বাঙালী যেখানেই থাক, সে বাঙালী—তার কোন জাত নেই, ধর্ম নেই।

সুলতান কথাটা বুঝতে পারল না। হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। আমি বললুম, সেসব যাক, আপনার কথা বলুন।

সুলতান বলতে থাকে তার সমুদ্রজীবনের কথা।

জাপানের শীতে জাহাজের রশি টানতে কেমন করে হাত ফেটে যায়, কেমন করে হংকং-এর জাহাজঘাটায় চীনা মজুররা পরিশ্রম করে, কেমন করে তারা সমুদ্রে মাছ ধরে—এসব পুরানো কথা তার নতুন করে বলা। তা বাদেও চল্লিশ মাইল এপার-ওপারে দরিয়ার জল যে বিশ ফুট উঁচু-নীচু হতে পারে, সেইটে তার কাছে তাজমহলের মত আশ্চর্য মনে হয়েছে। পানামা খালের এই উঁচু-নীচু জলকে কি করে দরজা আটকে জাহাজগুলো প্রশান্ত মহাসাগর আর আটলান্টিক মহাসাগরে পারাপার করে তা বলতে বলতে সে থমকে যায়।

—বাবুমশা', একে বলে আল্লার কুদরত। একই দরিয়ার পানি উঁচু-নীচু, না দেখলে প্রত্যয় হবে না। আমার তো মনে হল, জাহাজ বুঝি গড়িয়ে ঝপাং করে নীচে পড়ে যাবে।

আমায় শ্রোতা হিসেবে ভালো পেয়েছিল। এতক্ষণ সারা-বিশ্বের কাহিনী বলতে বলতে হঠাৎ নিজের কথায় এসে গেল।

—তুনিয়ার সব দেশই দেখেছি বাবুমশা'। কোথায় বিলেত, কোথায় জারমানী, কোথায় রুশিয়া—যা দেখতে লোকে পারে না, যা দেখবার পয়সা লোকের থাকে না, তাই দেখে এসেছি। খোদা মেহেরবান—বহুৎ জুলুমের হাত থেকেও বেঁচেছি। হায়াত আর মৌত কেবল তগদীর। না তো আমরা কি করে বেঁচে আছি? কোথায় চীনা দরিয়ায় ঝড় আর কড়কড়ে পানি, আর কোথায় আমেরিকার ঠাণ্ডা। পেটটা আমাদের নিয়ে চলে কোথায় তা আমরা জানি না।

—একবার তে বটিভা (বটিভিয়া, বর্তমান জাকার্তা) ছেড়ে কেবল ছঘণ্টার পথ এসেছি, উঠল তুফান। সেকি ছাইকোল! বাবা! আজও দিল্ চমকে ওঠে! বুকের খুন পানি হয়ে যায়! যেমন তুফান, তেমনি জলের পাহাড়!

—কাপ্তেন তো অত শক্ত, সেও গেল ঘাবড়ে। জাহাজের শেকল ছিঁড়ল, ছিঁড়ল জাহাজের হাল; কলঘর ঠাণ্ডা। আমরা তো বদর বদর করে পিঠের সঙ্গে শোলার প্যাকিং বেঁধে রইলুম। মেম সায়েবরা কেঁদেই একশা। জাহাজের সাত-শিটি বাজছে তো বাজছেই। ডেকের দরজা সব বন্ধ। ভেতরে ছাগল-গরুর মত লুটোপুটি খাচ্ছে ডেকের যাত্রীরা। কেউ করছে বমি, কেউ করছে পায়খানা। বাক্স-ডেক্স সব গড়াগড়ি দিচ্ছে—তার সঙ্গে গড়াচ্ছে মানুষগুলো! আট ঘণ্টা বাদে তুফান কমল, কিন্তু জাহাজ আর ঠিক রাখা যায় না। আল্লার মরজির ওপর ছেড়ে দিয়ে সেদিন সে রাত অমনি কেটে গেল। শুধু কম্পাস দেখে সাহেব বললে, জাহাজ যাচ্ছে উত্তরে।

—পরের দিন দেখা গেল একটা ছোট জাহাজ, অনেক অনেক দূরে। হাওয়াই তারে খবর পেয়ে 'অকৃজুলী' (অগ্নিদারী) জাহাজ এল, চেন বেঁধে টেনে নিয়ে গেল হিন্দুস্থানেব চীনে (ইন্দোচীনে)। সেখানে তুমাস বসে জাহাজ মেরামত হল।

সুলতানের বক্তব্য যেন গ্রামোফোনের রেকর্ড, শুরু হলে শেষ হতে চায় না। এমন ধৈর্যশীল শ্রোতাও বোধহয় তার জীবনে কমই পেয়েছে, তাই কখনও ভীতি, কখনও আনন্দ, কখনও উল্লাস জ্ঞাপন করে সে বলে চলেছিল তার জীবনের ঘটনা-বহুল অভিজ্ঞতা। অনেক রাত হয়েছে দেখে আমি বিদায় নিয়ে ব্রীজে এলুম, সঙ্গে সঙ্গে সুলতানও ওপরে এল, অনুরোধ জানাল আবার যেন কালকে আসি।

হোটেলে খেয়ে এসে বসলুম জাহাজের সামনের ব্রীজে।

হু-হু করে হাওয়া বইছে। চারিদিক উন্মুক্ত, আকাশ পরিষ্কার; ফিকে জ্যোৎস্নার পোঁচ্ রয়েছে আকাশের গায়ে।

বিধাতার সৃষ্টিকে স্তব করে, বিধাতাকে নাকি সবাই ভুলে যায়। পুত্র নাকি পিতার পরিচয় দিতে লজ্জিত হয়। দিগন্তপ্রসারিত এই সমুদ্রের বুকে বসে মনে হল, যদি থেকেও থাকে কোন বিধাতা, তাকে ভুলবার মতই তার সৃষ্টি। কেউ যদি ফিকে জ্যোৎস্নার ঢেউ সমুদ্রের বুকে দেখে এই সৌন্দর্যের স্রষ্টাকে ভুলে যায়, সে অপরাধী নয়, অপরাধী স্রষ্টা, যে এত সৌন্দর্য বিলিয়ে দিয়েছে পৃথিবীর কোণায় কোণায়। জাহাজের সামনের অংশ জলের বুক কেটে সাদা ফেনার গলিত রৌপ্য যেন চারধারে বিছিয়ে দিচ্ছিল। এক-একটা জলকণা যেন এক-এক টুকরো সাদা মোতি, সেগুলো পুঞ্জীভূত হয়ে নীল সাগরের বুকে মোতির মালা পরিয়ে দিচ্ছিল। সারা বিকেলটায় যতক্ষণ সমুদ্রের কিনারা দিয়ে জাহাজ চলছিল, ততক্ষণ সাদা চিলগুলো আহার্যের আশায় জাহাজের পেছনে পেছনে উড়ে আসছিল। ধবধবে উভচর এই চিলগুলো মাঝে মাঝে দল বেঁধে বেলফুলের মালার মত সমুদ্রের বুকে এসে বসছিল, মনে হচ্ছিল—নীল আকাশের বুকে ক্ষীণ এক টুকরা সাদা মেঘ যেন বাতাসের বেগে ভেসে বেড়াচ্ছে। দিনের সৌন্দর্যকে হার মানিয়েছে রাতের সৌন্দর্য। দেখবার কিছু নেই—জল আর জল, অথচ তার বুকে রূপোর খেলা। মাঝে মাঝে উড়ুক্কু মাছগুলো জাহাজের গা ঘেঁষে ছিটকে বের হচ্ছিল,—জলের সঙ্গে হাত দুয়েকের দূরত্ব রেখে উড়তে উড়তে কিছু দূর গিয়ে আবার জলের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল। এই সৌন্দের্যের বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। বনের রূপ আছে, আকাশের রূপ আছে, মাটির উপরকার সবারই রূপ আছে, কিন্তু যার ওপর কিছু নেই, তার যে কি রূপ তা উপলব্ধি করা যায়, কলমের খোঁচায় তাকে সৃষ্টি করা যায় না।

আমি নির্বাক বিস্ময়ে বসে দেখছিলুম—রাতও বেড়ে চলেছে, সেদিকে আমার খেয়াল নেই, হঠাৎ মনে হল, কে যেন আমার পাশে এসে বসেছে।

একটা নেপালী ফৌজী সেপাই।

তার সঙ্গে বাক্যালাপ শুরু করলুম।

বললুম, কোথায় যাচ্ছ?

—সিঙ্গাপুর।

—বাড়ি কোথায় ?

—নেপাল, পুব তিন নম্বর জিলা। বিরাটনগর থেকে পাহাড়ী পথে দুদিন যেতে হয়।

—ঘরে কে আছে ?

—মা, বাবা, বহিন, ভাই।

—সিঙ্গাপুরে যাচ্ছ কেন ?

—না গিয়ে উপায় কি ? দেশে খাবার কৈ ?

নেপালী সৈন্যটা সত্য কথাই বলেছে, অথচ খাবার সে দেশে যথেষ্ট আছে, খেতে পায় না জনসাধারণ। আমাদের দেশেও এমনি—খাবার থেকেও দুর্দশা।

আজকে নেপাল মস্ত আলোচ্য বিষয়।

দুনিয়া-ধরে সবারই চোখ এসে পড়েছে ক্ষুদ্র এই পার্বত্য দেশটার ওপর।

তবু কতটুকু জানি আমরা এ দেশটার ! আমরা জানি রানাদের অত্যাচার আর সামন্ততন্ত্র—এইসব খবর। এগুলোতেই সভ্য জগৎ আঁতকে উঠছে, আসল খবর রয়ে গেছে কালো পর্দার অন্তরালে। এগুলো জানে শুধু নেপালীরা।

নেপাল দেশের বাসিন্দা নেপালী, তারা হল বিজিত জাত, আর সেই দেশের বাসিন্দা গোর্খা, তারা হল রাজার জাত—শাসকশ্রেণী। গোর্খারা নেপালে বিদেশী। গোর্খা ছাড়াও সেখানে রয়েছে আরও বহু জাতি। তাদের সবাইকে এক কথায় বলা হয় নেপালী। ভিন্ন কৃষ্টি আর ঐতিহ্য। হিন্দু রাজ্য। কিন্তু সেখানে বাস করে হিন্দু, বৌদ্ধ, জড়বাদী আর দু-চার ঘর মুসলমান এবং খৃস্টান। অর্থাৎ সেটাও বহুধর্মাবলম্বীর সম্মিলিত দেশ।

রক্সৌল স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ালেই ও-পাশটায় দেখা যায় ছোট ছোট গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওটাই নেপাল রাজ্যের রেলগাড়ি। রক্সৌল থেকে আমলেকগঞ্জ পর্যন্ত এর গতিপথ। রক্সৌল ভারতীয় সীমানায়।

সেখান থেকে অশ্বতরবাহিত টমটম করে যাচ্ছিলুম বীরগঞ্জে, সেখান থেকে পারমিট নিয়ে যাব কাটমণ্ডু।

ছোট একটা খাল। নেপাল-ভারতের সীমানা নির্দেশক। এ-পাশটায় কতকগুলো বড় বড় ধানের কল, ও-পাশটায় দু মাইল গেলে, নেপালের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী বীরগঞ্জ। খালের মুখের পোলটায় ভারতীয় পেয়াদা বসে তত্ত্বাবধান করে থাকে। আমার টমটম পরীক্ষা করে দেখবার প্রচেষ্টা না করছিল এমন নয়, তবে টমটমওয়ালা কিভাবে বোঝাল, বাবু চোর নয়, কলকত্তা থেকে আসছে, ইত্যাদি যেজন্য আমি সহজেই নিষ্কৃতি পেলুম।

বীরগঞ্জ ছোট শহর। তার প্রধান রাস্তায় রয়েছে ফুটপাত, আছে জলের কল বিজলী বাতি। আজকের দিনের ছোটখাটো শহর। সমাজের অন্যান্য প্রয়োজন মেটাবার সবই আছে এখানে; ডাকঘর, তার-অফিস, এক্সচেঞ্জ—সবই আছে ছোটখাটো পর্যায়ের।

একবার চোখ বুলিয়ে নিলে বোঝা যায় না বাংলা ছেড়ে নেপালে এসেছি। কিন্তু চোখ মেলে তাকালেই দেখা যায়, আমরা বিংশ শতাব্দী থেকে একবারে সপ্তদশ শতাব্দীতে এসে গেছি।

অসামরিক শাসনব্যবস্থা সেদিন নেপালে ছিল অজ্ঞাত।

জেলায় জেলায় হাকিম থাকে—তারাই সবাই কাজের মালিক। আবার দুটো জেলার ওপর থাকেন বড়হাকিম, যাকে সহজ কথায় বলে গভর্নর। তিনিই হলেন সর্ব কার্যের বিধাতা। তাঁর পদমর্যাদা কমপক্ষে মেজর জেনারেল হতে হবে। থানার দারোগারাই তো কাপ্তেন।

গভর্নর যে ফিল্ড মার্শাল নয়, এইটেই আশ্চর্য।

খুঁজছিলুম একটা হোটেল।

দিল্লীর ধর্মশালা আর কোয়েটার হোটেল, এই দুটো জিনিস আমায় সজাগ রাখত পথ চলতে। তাই হোটেল খুঁজবার দায়িত্ব স্বয়ং নিলুম। কতকগুলো চালাঘর রেল লাইনের পাশ ঘেঁষে। তারই বুকে বিচিত্র ভঙ্গিতে কতকগুলো সাইনবোর্ড ঝুলছে, প্রত্যেকটাই মিলিটারী হোটেল।

ইংরেজের ভাড়াটিয়া নেপালী সৈন্যরা এপথে দেশে আসে ছুটিতে; তাদের পথক্লেশ অপনোদনার্থই এসব হোটেল, দেহের ও মনের ক্লেশ সমানভাবে অপনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে, চাই সামান্য কিছু ইংরেজী নোট।

অতিথি হলুম একটায়, বাঁশের মাচাং-এ বসবামাত্র নেপালী ওয়েটারনী এল—দিল চা, দিল রুটি; মূল্য নেপালী মুদ্রায় ছ আনা আর ভারতীয় মুদ্রায় সাড়ে পাঁচ আনা।

দশ টাকার একখানা নোট বের করে দিলুম। সেটা হাতে নিয়ে নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করল; তারপর ভাঙানি এনে ফেরত দিল।

এল মালিক স্বয়ং। অভিনব বিনয়সহকারে জানতে চাইল আমার বীরগঞ্জে স্থিতিকাল, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বললুম, কদিন থাকব তা তো ঠিক নেই, আজ যদি পাস তৈরী হয়, আজই রাতের ট্রেনে চলে যাব, নইলে রইতে হবে কদিন কে জানে!

সে পূর্ববৎ বিনয়সহকারে বললে, যদি পাস না হয়, এখানেই থাকবেন। ঘর ভাড়া মাত্র চার আনা—খাবার খরচ একটাকা দু আনা প্রত্যহ।

বিছানাপত্র তার জিম্মায় রেখে গেলুম হুজুর দরবারে।

পাস বের করতে অনেক সময় লাগলে। জেনারেল সাহেব সেদিন তিনটের অফিসে এলেন। সেলাম ও সেলামী দিয়ে আবেদন পাঠালুম।

তিনি ডেকে বললেন, Well, I am afraid of your disappointment.

আমি সেলাম দিয়ে বললুম, সাহেব, সে তো পরের কথা, দেখি কি হয়।

একটা কাগজে মোহর দিয়ে হুকুমনামা আমার হাতে দিতে দিতে বললেন, আমাদের এখানে একটা হুজুগ চলছে, তাতে যেন মাথা দেবেন না তা হলে বড়ই লজ্জায় পড়তে হবে আমাকে।

আমি মাথা নেড়ে অসম্মতি অথবা সম্মতি জানিয়ে হুকুমনামা নিয়ে পথে বের হলুম।

ইচ্ছে ছিল সন্ধ্যার গাড়িতে বের হব, কিন্তু পুরো সাড়ে তিনদিন কলকাতা থেকে এটুকু পথ আসতে খুব ক্লান্ত করে ফেলেছে, সেজন্যই পরের দিন সকালে যাওয়া স্থির করে, হোটেলে খেয়েদেয়ে দিলুম ঘুম।

হোটেলেই সঙ্গী মিলল রমেশ শ্রেস্ত।

রাস্তায় চলতে চলতে সে বলতে থাকে নেপালের কথা। বয়স তার পঁচিশ-ছাব্বিশ, ক'বছর আগে সীতামারী স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেছে। নিজের জাত ব্যবসায় করছে কাটমারোতে (কাটমণ্ডু)।

—আমরা হুকমিরাজ চাই না, আমরা চাই ন্যায় মোতাবেক দেশ শাসন। কেবল গোর্খারা কাজ পাবে, জমি পাবে, আর আমরা আমাদের দেশে ভিক্ষা করব, এ আমরা মানতে রাজী নই।

সে বলতে থাকে তার দেশের কথা—জমির মালিক গোর্খারা, চাষীর খাবার না রেখেই ফসল উঠিয়ে নেয় তারা, কলামুলোটা লাগানোর সঙ্গে সঙ্গেই ভাগ নেবার বন্দোবস্ত করে গোর্খার পেয়াদারা, নেপালীরা একটা হাতিয়ার পর্যন্ত রাখতে পারে না, পারে না বনের একটা শুয়োর মারতে, পারে না সুন্দরী বউ নিয়ে ঘর করতে। নেপাল আর নেপালী, সব সম্পদ যেন গোর্খাদের ভোগের জন্য। তাদের ছিবড়ে চুষে আমরা রয়েছি বেঁচে থাকতে।

আমি বললুম, নেপালের নৈতিক মান এত নীচু!

—নেপালের নয়, শাসকদের। আজ নেপালের জঙ্গলে, ঘরে-বাইরে, পাহাড়-পর্বতে সর্বত্র তাই একই আওয়াজ আসছে, 'হুকমিরাজ তোড় দো।' আজ আর কেউ জুলুমবাজি সইব না।

—হুকমিরাজ কেন? এখানে লিখিত আইন কি কিছু নেই?

—আছে। ইংরেজের কায়দায় অনেক কিছু আছে, কিন্তু এই লিখিত আইনের চেয়ে ভয়ঙ্কর এই দেশের অ-লিখিত আইন, মহারাজার আদেশ! মহারাজার ইচ্ছাই আইন!!

—আর রাজা? তিনি দেখেন না?

—দেখবার সামর্থ্য কোথায়? আমাদের দেশের রাজা কায়কোবাদের মত রাজা। মহারাজার (প্রধান মন্ত্রীর) দয়ায় তাঁকে বাঁচতে হয়, হয়তো মেরেও ফেলত কোন দিন, পারে না কেবল প্রজাদের ভয়ে। প্রজারা জানে রাজা ভগবানপুত্র, তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে মূর্খ ও অন্ধবিশ্বাসী প্রজারা বিদ্রোহ করতেও পারে। তাই রাজার জন্য ব্যবস্থা রয়েছে কয়েকশত সুন্দরী আর পেয়ালা, অথচ অত্যাচার চলেছে রাজার নামেই। শোনা যায় বর্তমান রাজা নাকি সুন্দরী আর পেয়ালা চায় না, চায় তার দেশকে।

—এটা তো ভালো লক্ষণ!

রমেশ হেসে বললে, সেটাও ভয়ের কারণ। রাজা আর মহারাজায় চলতে থাকবে বিবাদ, ফলে প্রজাদের দুঃখ আরও বাড়বে।

জেনারল সাহেব আমায় হুজুগী লোকদের সঙ্গে মিশতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর অনুরোধ রক্ষা করতে পারছি কৈ? স্বভাব আমাদের এমনি হয়ে গেছে যে, রাজনীতির গন্ধ পেলেই আমরা মৌমাছির মত জড়ো হই।

গাড়ি চলছে তো চলছেই। গতিবেগ দশ-পনেরো মাইল হওয়া সম্ভব। গাড়ির যাত্রী সবাই নেপালী অথবা গোর্খা।

মেয়েরা স্বল্পমূল্যের সিগারেট টানছে, পুরুষরা তিনকাঁটার উলের সোয়েটার বুনছে, নয়তো ঝাঁকিয়ে গল্প করছে।

ছোট ছোট স্টেশন। বীরগঞ্জের চেয়ে বড় স্টেশন আর নেই। আমলেকগঞ্জ অনেকটা মানানসই।

একটা স্টেশনে এসে গাড়ি দাঁড়াল। পার্বনীপুর।

ছোট ছোট নেপালী ছেলেরা ঝুড়িতে করে কলা আর ন্যাসপাতি বিক্রি করছিল। আমি নীচে গিয়ে কিনে আনলুম কিছু, কেনাটা উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য শিশুদের অবস্থা লক্ষ্য করা।

নগ্নপদ, শতছিন্ন কামিজ, কোমরের ঘুনসীতে বস্ত্রখণ্ডমাত্র পোশাক।

উনিশটা কলার মূল্য চারপয়সা—তাও নাকি বেশি দিয়েছি, রমেশ বললে। ন্যাসপাতি একপয়সায় আটটা।

এও শিশু। যে শিশু কোলে নিয়ে মিসেস্ ট্রুমান মাতৃত্বের দাবি করে, রাজা জর্জ তাঁর ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করে, আবার রামচরণ আর করিম মিঞা সারাদিনের কর্মের ক্লান্তি ভুলে যায়। সেই শিশুরই একটি সংস্করণ এরা। কারুর বয়সই ছয়-এর বেশি নয়।

অথচ এদের মূল্য নেই জগতে। রুগ্নতা-অনাহার-বস্ত্রহীনতা এদের নিত্যকার সহচর। পিতার কর্মের সঙ্গী—মাতার নয়নের মণি, তবুও এদের বাঁচবার অধিকার স্বীকার করে না কেউ। শিশুর রূপেই ভগবানের বিরাট বিশ্বরূপ, অথচ কোথাও নেই তার বিকাশ, নেই তার সহজ আর সুস্থ অভিব্যক্তি। এ যেন জমিতে সরষে ছিটানো হয়েছে, কতকগুলো পাখিতে খাবে, কতকগুলো পিঁপড়েতে, কতকগুলো পায়ের চাপে গুঁড়ো হবে, যারা বাঁচবে তারাও নিষ্পেষিত হবে ঘাইনে, রস নিঙড়ে তাদের ছাড়া হবে। তখন তাদের থাকবে না রূপ, পরিচয় আর কোন বর্ণ।

এই চলছে পৃথিবীর ধারা!

যেদিন এরূপ দেখেছি, সেদিনকার চোখ আজ নেই—প্রাক-স্বাধীনতা যুগের কথা। সেদিনও বাংলার, তথা ভারতের এ রকম কোটি কোটি শিশুকে দেখে মনে হয়েছিল, স্বাধীন ভারতে এদের বিনাশ হবে না, সৃষ্টি হবে একজাতি, যারা দধীচির মত শক্ত হাড় দিয়ে গড়বে নতুন ভারত। তা হয় নি, তা হয় না, কেন না যারা শাসক, তাদের দৃষ্টি যেখানে, সেখানে শিশুর বিশ্বরূপ দেখবার মত অবসর কোথায়? কোথায় সে ভাবুক মনের বাস্তব স্বীকৃতি।

ভীমপদি থেকে দুজনেই ঘোড়ায় চললুম।

কিছুদূর যাবার পর আমিই বললুম, হেঁটেই চলুন, ঘোড়ায় গেলে রাস্তাটা তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবে, আমি একদিনের রাস্তা দুদিনে চলতে চাই।

—মানুষ চায় তাড়াতাড়ি চলতে, তার জন্যই মোটর-রেল-হাওয়াই জাহাজ আর আপনার দেখছি অদ্ভুত শখ।

আমি বললুম, শ্রেস্তজী, তাড়াতাড়ি যাওয়াতে উত্তেজনা আর আনন্দ দুটোই আছে সত্য, কিন্তু যাদের গতি বেশি, তাদের পিছনে যারা পড়ে থাকে তাদের দেখবার অবসর পায় না, থাকে না বলিষ্ঠ মন দিয়ে তাদের বিচার করবার ধৈর্য। তার ওপর গতির আঘাতে যারা ধরাশায়ী, তাদের কথাও তারা ভাবতে পারে না।

শ্রেস্ত ঘোড়া থেকে নেমে বললে, সেই ভালো, আসুন আমরা দেখতে থাকি—যারা পেছনে পড়ে থাকে, তারা কেমন করে থাকে ; থাকে না, থাকতে বাধ্য হয়।

—তা হলে সদর রাস্তা ছেড়ে পাহাড়ীপথে গ্রামগুলো দেখতে দেখতে যাই। দোপায়া রাস্তায় চড়াই ধরলুম, বৃষ্টিতে রাস্তা পিচ্ছিল হয়েছে, ছাতাটা লাঠির মত করে দেহের ভারসাম্য রাখতে রাখতে চলছিলুম। দুজনেই নির্বাক। দুজনেরই চোখ পড়েছে দূরের পাহাড়ের ওপর মেঘের খেলায়। ওরা যেন লুকোচুরি খেলছে! মাঝে মাঝে মেঘের ফাঁকে এক ঝলক রোদ ছিটকে পড়ছে। প্রচুর দোপাটি জাতীয় ফুল পাহাড়ের গায়ে মৌমাছির চাকের মত থোকায় থোকায় ফুটে রয়েছে, কেউ বা লাল, কেউ বা সাদা, কেউ বা বেগুনী। রংএর যেন তুফান—তার ওপর বাতাসের ঢেউ এসে ধাক্কা দিতেই হকচকিয়ে একে অন্যকে যেন আঁকড়ে ধরছে। বিরহের উত্তর পর্ব!

রাস্তায় হাঁটুর ওপর পর্যন্ত এক টুকরা কাপড় লুঙ্গীর মত করে পরা, মোটা ছেঁড়া কোট গায়ে এক পাহাড়ী, হাতে বল্লম নিয়ে আসছিল। কোমরে তার কুরকী। দূরে থাকতেই বললুম, ও লোকটা কে?

—নেপালের গ্রামের পুলিস।

—আমি ভেবেছিলুম চোর-ডাকাত কেউ হবে।

—তার চেয়েও নিম্নপদের কিছু! এদের সারা বছরের বেতন ছ টাকা। ছমাস তাদের অবশ্য কাজ করতে হবে পুলিসে বাকী ছমাস গ্রামে গিয়ে এরা চাষবাস করে। ঘর থেকে খাবার এনে এদের কাজ করতে হয়। যাবার বেলায় ছটাকা সম্বল করে ঘরে ফেরে। তাও সব সময় মেলে না। বড় সাহেবের তহুরী দিয়ে থাকে তিন-চার টাকা। এমনি করে ছমাস পর পর আসতে হয়—একজন ছমাস, আর একজন ছমাস, এই ভাবে চাকা ঘুরতে থাকে—ওদের হাড়মাংসও গুঁড়ো হয়ে যায়। তাও কি আছে রাস্তাঘাট, আসতে হয় দূর পাহাড়ের কোণা থেকে, অনেক সময়ই তো বাঘ-ভাল্লুকের হাতে পড়তে হয় —দু-একটা যে না মরে এমন নয়।

—এই আট আনা বেতনে এরা চাকরি করে কেন?

—না করে উপায় কি? জোর করে টানতে টানতে নিয়ে যাবে, কয়েদ করবে। বেইজ্জত হবে ঘরের বউ-মেয়ে। তাই এরাও ছুটে পালায় ইংরেজের ফৌজে, দেশে খাবার থাকলে কি হবে, এরা না পায় খেতে, না পায় খাবার কেনবার পয়সা। তাইতো ওরা লড়াইয়ের ময়দানে ছোটে, জানে 'এক গুলীকা জান', যে কদিন বাঁচবে, সে কদিন যতটা পারে অত্যাচারের হাত থেকে বেঁচে জীবনকে ভোগ করতে চায়।

—এরা কি লেখাপড়া শিখতে পায় না।

—এরাই শুধু পায় না এমন নয়, পায় না হাজারো জন। সারা নেপালে পাঠশালা খুঁজলে পঁচিশটা পাবেন না, তুহাজারে সাতজন যে দেশে লেখাপড়া নামমাত্র জানে, সে দেশে এরা পাবে পড়বার সুবিধে? যাদের কিছু সঙ্গতি আছে, তারা তাদের ছেলেমেয়েকে পাঠায় জয়নগর, সীতামারী, দ্বারভাঙ্গায়, কেউ কেউ কলকাতাতেও পাঠায়। এই হল শিক্ষিত আর শিক্ষার নমুনা।

আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে চলছিলুম। শ্রেণ্ড বললে, কি ভাবছেন, নেপালটা কি মজার দেশ নয়?

—ভাবছি, এসব গ্রামের সঙ্গে রাজধানীর সংযোগ কি করে রক্ষা হয়।

—জনরবে। লোকের মুখের কথায় কথায় সংবাদ ছড়ায়। ডাকঘরও আছে কোথাও কোথাও। সাধারণত জেলার প্রধান ঘাঁটিতে। সেখান থেকে মাসে একদিন করে গ্রামে গ্রামে ডাক বিলি হয়। তাতেও লোকের দুঃখের সীমা নেই। কেউ হয়তো গেছে ফৌজে চাকরি করতে, সেখান থেকে এল দুঃসংবাদ। গ্রামে চিঠি এল তুমাস পরে, চিঠি নিয়ে এসে পেয়াদা বলল—দাও চার আনা, নয়তো চিঠি পাবে না। চার আনা দিয়ে চিঠি পেলেন, কিন্তু পড়ার কি ব্যবস্থা! পিয়নকে আরও কিছু দক্ষিণা, দিলে হয়তো সে পড়ে দেয়, নয় তো ছুটুন দশমাইল, মুন্‌শীকে দিন দক্ষিণা সেও হয়তো রাম পড়তে রাবণ পড়ে দিল। এই তো অবস্থা!

আমি বললুম চমৎকার! ইংরেজের অবস্থা এর চেয়ে মনে হয় ভালো।

—নেপালের চেয়ে ভালো হলেও সত্যিই ভালো নয়। তাই আপনারা সন্তুষ্ট নন।

আমি বললুম, রক্সৌল থেকে মোটর-রাস্তা কিন্তু করা চলে, এরা করে নি কেন?

—দেশরক্ষার অজুহাতে। এইটেই নাকি কাটমণ্ডু উপত্যকার দুর্ভেদ্য স্থান। রাস্তা করলে শত্রু যে ঘরে ঢুকবে! এখানে মোটর নেই, তবে কাটমারোতে

মোটর দেখতে পাবেন। কিন্তু খবরদার—যখন কোন মোটরের শব্দ পাবেন, অমনি রাস্তা ছেড়ে উলটোমুখ হয়ে দাঁড়াবেন। নয়তো ফ্যাসাদ অনিবার্য। রাস্তায় দাঁড়িয়ে শাসকের মুখ দেখবেন? অসম্ভব!

আমি বললুম, এও কি সম্ভব!

—অন্য কোথাও সম্ভব নয়, নেপালে সম্ভব।

তার কথা আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না, কিন্তু প্রতিবাদও জানাতে সাহস হল না। হয়তো বা রানাশাহী-ব্যবস্থা এরকম কিছু হবেই হবে। অবশ্য পরে বুঝেছি, শ্রেস্ত মিথ্যাবাদী নয়, তবে আলঙ্কারিক।

একটা গ্রাম পেরিয়ে আরেকটা গ্রামের দিকে চলছি, এবার শুধু চড়াই নয়, উতরাইও।

কিছুটা রাস্তা এসে আমি জিজ্ঞেস করলুম, এভাবে চললে কাটমণ্ডু কবে পৌছাব?

—আজও সম্ভব, কালকে হলে ভালো হয়।

—কিন্তু!

—কিন্তু কি? থাকবার ব্যবস্থা? তা করব। বিকেল বেলায় কোথাও আপনার সব ব্যবস্থা করে আমি রওনা হব, আজ রাতেই আমায় কাটমারো পৌছুতে হবে। আমি সব ব্যবস্থা করে দিয়ে যাব—আপনার কোন কষ্ট হবে না। এখান থেকে ভাটগাঁওয়ের পথে কাটমারো যেতে পারবেন।

—কালকের রাতটা ভালোই গেছে। হোটেলটা নোংরা হলেও অন্য কোন অসুবিধা ছিল না।

—ওইটে আপনার ভুল। নূতন দেশে এসেছেন, দেখেশুনে তবে মতামত দেবেন। এখানে কে যে কি, তা আমরাই বলতে পারি না, তো আপনি! ওসব হোটেল বেশ্যালয়ের ছদ্মবেশ মাত্র। ওরা যুক্তি করেছিল, রাতে আপনার কাছে দু-তিনটে মেয়ে পাঠিয়ে টাকা-পয়সা হস্তগত করবে। আমায় দেখে ওদের প্ল্যান ভেস্তে গেছে। সেবার ঐ নিয়েই পাশের হোটেলটায় দাঙ্গা করেছিলুম বলে ওরা ভয় খেয়ে গেল। সেও কি কম হাঙ্গামা! চুরি করলে ওরা, বাঁচাতে গেলুম আমি, ফলে আমার হল চার মাসের জেল।

—ওদের শাস্তি না দিয়ে দিল আপনাকে! উকিলগুলো কি কিছুই জানে না? তারা কেন সওয়াল করল না?

শ্রেস্ত হেসে বললে, এদেশে উকিল-মোক্তার নেই বাবুজী। আসামী ফরিয়াদি ডেকে শুনানি হবার পর, হাকিম যার কথা বিশ্বাস করবে, সেই অনুযায়ী হবে

বিচারফল। এদেশের এই হচ্ছে আইন-কানুন। আবার জেলের যা অবস্থা, এর চেয়ে যদি গুলী করে মারত, তাও ছিল ভালো। সারাদিন ভাঙতে হত পাথর, বিশ্রাম নিতে গেলেই পড়ত সপাং করে চাবুক। খাবার না দিয়ে দিত তিন আনার কাঁচা র‍্যাশান, সারাদিনের খাটুনির পর তাও খেতে হবে রেঁধে। একটা মাটির হাঁড়ি আর একটা মাটির সানকি—তাও ভাঙলে ডাণ্ডাবেড়ী। মাটির ওপর শুয়ে কাটত রাত। মশা আর জোক—উঃ! ভাবতেও আপনারা পারবেন না! যেতেন যদি নেপালের জেলে।

গত রাত্রে ভাবছিলুম, যাই হোক, একটা স্বাধীন হিন্দুর দেশ তো পৃথিবীর মানচিত্রে রয়েছে এখনও! আজ ভাবছি এমন স্বাধীন দেশ না থাকলেও ছিল ভালো!

আমি বললুম, কালকে একটা পানের দোকানে পান কিনলুম, কিন্তু সে আলগোছে আমার হাতে পান ফেলে দিল কেন?

—মনে হচ্ছে আপনি কোন বামুনের দোকানে গিয়েছিলেন। এদেশে গো-ব্রাহ্মণ আর স্ত্রীলোক অতি উচ্চস্তরের, অবশ্য রাজা-মহারাজাদের কাছে নয়। একটা গরুর ঠ্যাং কেটেছেন কি আপনার ঠ্যাং কাটা গেছে। মেয়েদের অসম্মতিতে যদি তার গায়ে হাত দিয়েছেন, সে হাতটাও রেখে যেতে হবে এদেশে। মুলো হয়ে দেশে ফিরতে হবে।—বলে শ্রেস্ত হো হো করে হেসে উঠল। সারাটা পথ সে 'NUMBER 10' সিগারেটের দুটো কৌটো খালি করে আবার তিন নম্বরের কৌটো বের করে আমায় একটা সিগারেট দিল।

আমি বললুম, এদেশে মুসলমানও তো আছে।

—আছে, তবে ওরা নেপালের নয়, বিহারের। জুতো বিক্রি ওদের কাজ। ওরাও কি কম? পেটের দায়ে করছে ওরা হনুমানজীর পূজো। নয়তো থাকতে পাবে না যে! স্বাধীন দেশ বলে আপনার হয়তো শ্রদ্ধা রয়েছে, কিন্তু দূর থেকে যাকে সুন্দর মনে হয়, কাছে এলে সে সৌন্দর্য কর্পূরের মত উবে যায়। শুনলেন তো, এবার দেখতে থাকুন দেশটাকে। তারপর দেশে গিয়ে লোককে বলবেন, নেপালটা কেমন সোনার দেশ!

বর্ষাকাল। আকাশে মেঘ, রাস্তায় জল, ট্রেনে ভিড়, জমি কাদতে—এই নিয়েই রওনা হয়েছিলুম। সেজন্য বৃষ্টিটা অনিবার্য, ফাউ শুধু আছাড় খাওয়া। যতই পাহাড়ের ওপরে উঠছি, ততই শীত অনুভব করছি। পেছনের ডাণ্ডিওয়ালা বিছানা-সুটকেস নিয়ে দিব্যি আসছিল, আমাদেরই যা কিছু কষ্ট হচ্ছিল।

সামনের গ্রামটায় এসে শ্রেস্ত গেল আমার জন্য ডেরা খুঁজতে। আমি ডাণ্ডিওয়ালাকে নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি।

অনেকক্ষণ পরে শ্রেস্ত এসে বললে, আজকের মত নিরাপদ জায়গা পাওয়া গেছে। বাড়িওয়ালা আর তার স্ত্রী রয়েছে। ওপরে-নীচে দুখানা ঘর—ওপরের খানা আপনাকে ছেড়ে দেবে। আজকের মত টাকাখানেক খরচ করলে চলে যাবে। বাড়ির মালিক গেছে শহরে, সে এলে গল্পে গল্পে আপনার সময়ও কাটবে। আমি আপনাকে ডেরায় তুলে দিয়েই চলব, কালকে আমার ওখানে আপনার সব ব্যবস্থা রাখব। আমার ইচ্ছে ছিল শ্রেস্তের সঙ্গে যাই, তাই বললুম, আপনিও থাকুন না কেন, না হয় আমিও আপনার সঙ্গে যাব।

—আপনি ভয় পাবেন না, আমার থাকবার উপায় নেই, নয়তো বলতে হত না। আর, আজ আমার সঙ্গে আপনি যেতে পারবেন না। এখনও ছ-সাত ঘণ্টা চলতে হবে, পাহাড়ী পথে পাহাড়ীরা বাঁদরের মত চলতে পারে; আপনি বাঙালী, আপনি তা পারবেন না। শেষে দুজনেই ফেঁসে যাব। সকাল বেলায় এই ডাণ্ডিওয়ালা এসে আপনাকে সদর পথে তুলে দেবে, সঙ্গে করে কাটমারো পর্যন্ত রেখে আসবে।

রাস্তা থেকে হাত ষোলো উঁচুতে কাঠের ঘর, আমাদের দেশের গোয়াল থেকে নিকৃষ্ট। পাহাড়ের গায়ের সঙ্গে যেন গেঁথে রাখা হয়েছে ঘরখানাকে। নীচের তলায় কতকগুলো শূয়োর আর গরু—ওপর তলায় থাকে গৃহস্বামী। ওপরের ঘরখানা আমায় থাকতে দিয়ে গৃহস্বামিনী বিছানা পেতে দিল।

বেলা তখনও কিছু ছিল, আমি বের হলুম পাহাড়ে বেড়াতে। গৃহস্বামিনী বললেন, আপনার জাত?

—ব্রাহ্মণ।

—তা হলে চৌকাবর্তন করে দেই।

—দরকার নেই।

ব্রাহ্মণের জন্য আলাদা চৌকাবর্তনের প্রয়োজন নেই শুনে গৃহস্বামিনী ক্ষুণ্ণ হলেন। নিতান্ত নিরুপায়ের মত আমার রন্ধনকার্যের অপটুতা ও অনিচ্ছাটা মেনে নিয়ে নিজেই রন্ধন ব্যবস্থায় গেলেন। যাবার বেলায় বলে গেলেন,—বেশি দূর যাবেন না, ভালুকের উৎপাত হয়েছে।

আমি সরল গাছের তলা দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে অনেকটা নীচুতে একটা ঝরনার কিনারায় শুকনো দেখে একটা পাথরের ওপর বসলুম। পাহাড়ের কোণটায় ধীরে

ধীরে সূর্য ঢলে পড়ছিল। বিকেলের সেই পড়ন্ত বেলায় ঝিরঝিরে বাতাসে মাদকতা সৃষ্টি করছিল। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হওয়াতে এদিক-ওদিককার পাহাড়ের গা বেয়ে জলের ধারা এসে ঝরনাকে ফাঁপিয়ে তুলেছে, ঝরঝরে আওয়াজ, সোনালী রোদ আর পড়ন্ত বেলার বাতাস শান্ত সমাহিত প্রকৃতির বুকে কাব্যের মূর্ছনা জাগিয়ে তুলতে থাকে। সন্ধ্যার আগমনে রাখাল ছেলেরাও তড়িৎগতিতে ও-পাশটা দিয়ে মোষ-গরু তাড়িয়ে ঘরে ফিরছে, গরু-মোষের গলায় ঘণ্টা বাঁধা, সেই ঘণ্টার শব্দ অনেকটা গির্জার ঘণ্টার মত কানে এসে বাজছিল। প্রকৃতি যেন তার অফুরন্ত সৌন্দর্য নিয়ে মূর্তিমতী হয়েছে। ধানের কচি কচি গাছ, দোপাটির ঝোঁপ, ঝিঁঝিঁর অক্লান্ত ডাক, সবই যেন এক সঙ্গে বাঁধা—কোথাও যেন কোন ত্রুটি নেই। সবাই আপন আপন প্রাচুর্যে একে অন্যকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। অফুরন্ত যৌবনসম্ভারে পরিপূর্ণ পার্বত্য প্রকৃতি পর্বতের রূঢ়তাকে কমনীয়তা দিয়ে আচ্ছাদিত করে রেখে আপনাকে বিলিয়ে দিতে যেন উন্মুখ হয়ে লজ্জানত রূপসীর মত দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এত সুন্দর পৃথিবীর কোল আরও দেখেছি—আরও দেখেছি একটি পাহাড়ী দেশে। সেও গহন জঙ্গল, অসহনীয় শীতের রাজ্য, এখানকার মত উপত্যকা নেই, নেই এত আবাদ। মাইলের পর মাইল উর্বর ভূমি অকর্ষিত হয়ে রয়েছে সে দেশে, মাইলের পর মাইল গিয়ে যখন ক্লান্তি আসে, তখনই হয়তো দেখা যায় একটা ছোট্ট গ্রাম। কোথাও ঘন বসতি নেই, নেই লোকের চলাচল, নেই গুঞ্জন কলহ, আছে শুধু দূর বন থেকে ভেসে-আসা কাঠুরিয়ার কাঠ কাটার প্রতিধ্বনিত শব্দ। সেখানেও বাস করে এমনি একটা পাহাড়ী জাত—তারাও মঙ্গোলীয়, শ্মশ্রু-গুম্ফবিহীন, মেয়েপুরুষের পোশাকের নেই কোন তারতম্য—এক চেহারা। তারাও আমাদেরই প্রতিবেশী। তাদের কথা ক'জন জানে? জানবার দরকারও হয় না।

কালো পর্দার ওপারে সে দেশ—ভুটান। আজকে ঝরনার পাশে বসে মনে পড়ে সেই দেশটার কথা! অথচ কত তফাত সে দেশটার সঙ্গে এ দেশটার। মনে হল, আগে যদি সে দেশে না যেতুম, তা হলে নেপালের চোখ নিয়ে ভুটানকে দেখতে পেলে বেশি সুন্দর লাগত। পাঁচ হাজার বছর আগেকার ঐতিহাসিক নৃতত্ত্বমূলক যদি কিছু চিহ্ন আবিষ্কার করতে হয়, তা হলে যেতে হয় ভুটানে। স্রষ্টার নিপুণ তুলিকায় আঁকা ভুটান-প্রকৃতির বুকে দুষ্ট ক্ষতের মত বেঁচে রয়েছে স্বকীয়তা ও সত্তা বর্জিত একদল মানুষ, যাদের ইন্দ্রিয়গত অনুভূতি ভিন্ন আর কোন অস্তিত্ব যে রয়েছে এ সত্য কেউই স্বীকার করে না। আজও মানুষ যে

পশুর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে, বা রইতে পারে, তা ভুটানকে না দেখলে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

জাহাজের ব্রীজে বসে নেপাল আর ভুটানকে যেন চাক্ষুষ দেখতে পেলুম। গোর্খা সৈন্যটির উপস্থিতি ভুলে গিয়ে স্মরণ করতে থাকি ফেলে-আসা সেই দিনগুলো! অনন্ত জলরাশির বুকে যেন ভেসে ওঠে সেই দুটো পাহাড়ী রাজ্য। সেই মহাকাল পর্বত! সেই সশব্দনির্গত সংকোশ নদীর উৎস! সেই কালীখোলার বাজার! মাখন আর হরিণের মাংসের বেসাতি পিঠে বেঁধে দুদিনকার পথ বেয়ে ছুটে আসছে পাহাড়ী সওদাগর। আরও কত কি? সব মনে আসছে না। নেপাল ভুটান গলা জড়াজড়ি করে যেন কালো যবনিকার অন্তরাল থেকে আর্তনাদ করছে, 'ভুখ, ভুখ'। বুভুক্ষু জনতার ক্রন্দন যেন তীরের মত কানের পর্দায় আছড়ে পড়ছে, ওরা যেন বলছে—ওরে আমরাও মানুষ, আমরাও বিধাতার সৃষ্ট, আমাদের বাঁচতে দাও। আর রাজা! তার আবার জাত কি? ধর্ম কি? ইংরেজের কৃশ্চান রাজাও যা, আরবের মুসলমান রাজাও তাই, নেপালের হিন্দু রাজাও একই শ্রেণীর, ভুটানের বৌদ্ধ রাজাও কম নয়। রাজা সব সময়ে রাজা। তাঁর কাজ নিজের সুখসম্ভোগ তিলে তিলে বজায় রেখে, প্রজার বুকের রক্ত বিন্দু বিন্দু করে নিঙড়ে নেওয়া। রাজার মুকুটের তলায় সুখ-দুঃখ নিয়ে প্রজাদের চিন্তা বাস করে কাব্যে—বাস্তবের রাজা নিজের সুখ-দুঃখকেই জানে; প্রজাদের কথা চিন্তা করবার অবসর পায় না। রাজার রূপ তার মুকুটে নয়, সিংহাসনে নয়; তার রাজ্যের আনাচে-কানাচে ফুটে ওঠে তার রূপ—সে রূপ বড়ই কদর্য, বড়ই হৃদয়হীন—সেখানে রাজার জাত, রাজাতেই পরিসমাপ্ত।

কত কথাই মনে হয়। মনে হয়—থাকত যদি ক্ষমতা, উপড়ে ফেলে দিতুম এই অভিজাত শ্রেণী।

যাক ওসব কথা।

নেপাল সরকারের সঙ্গে কিছুটা সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রয়েছে তার দেশটার। সামরিক হলেও শাসনব্যবস্থা সেখানে চালু রয়েছে—রইবেও। কিন্তু ভুটানের শাসনপ্রণালী বিচিত্র। সব খবর নিতে পারি নি। তার কারণ, সে দেশের লোকের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে পরোক্ষ অথবা অপরোক্ষ কোন সম্বন্ধই নেই। তারা প্রাপ্যটুকু দিয়ে, জুলুমগুলো মাথায় নিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্তে বাস করছে। রাজার প্রাপ্য মিটিয়ে নিজেদের প্রাপ্যটুকু হজম করে বাস করছে তারা, বিকারও নেই, অনুভূতিও নেই।

গোটা দেশটাকে ভাগ করে দেওয়া আছে কজন দেওয়ানের হাতে, তাদের কাজ সময়মত রাজস্ব পাঠিয়ে স্বাধীনভাবে প্রজাপীড়ন আর নারীধর্ষণ। ইজারা মহালের মত আর কি! তাদের কাজের কৈফিয়ত নেবারও লোক নেই, দেবেই বা কাকে? রাজা বসে আছেন মদের পিপে আর রাজ্যের সুন্দরী নিয়ে—তার অত চিন্তা করে মাথা খারাপ করলে কি চলে? গোটা ভুটিয়া দেশে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যকালেও তিন অঙ্ক ছাড়ায় নি! কজন লামা ধর্মচর্চা করে, তারাই দেশের লেখাপড়া জানা লোকদের মধ্যে গণনীয়, তাদের কাজ পরের ওপর নির্ভর করে বাস করা, হলদে কাপড় পরে, ঢাক বাজিয়ে, ভূত তাড়িয়ে অজ্ঞ জনসাধারণকে নির্বাণের পথে নিয়ে যাওয়া আর গোপনে সন্তান সৃষ্টি করা।

সে রাজ্যের আয়টা যতই হোক, ব্যয় নেই মোটেই। ডাকঘর, টেলিগ্রাম, গাড়ি, রাস্তাঘাট এখনও তাদের অজ্ঞাত। কজন সৈন্য অথবা পুলিস দিয়ে শাসনব্যবস্থা চালু রয়েছে সারা দেশটায়, তবে জংলী-সম্পদের দিকে বড়ই নজর; তার কারণও পয়সা। বনজ সম্পদ স্বর্ণসেতু রচনা করে, সে স্বর্ণসেতুর একমাত্র প্রহরী ও ভোগী সে দেশের রাজা। অন্ধকার—আরও অন্ধকার! যতই দূর পার্বত্য অঞ্চলে যাওয়া যায়, ততই যেন দম আটকে আসে!

ভারতের সীমান্তের ঘরবাড়িগুলো ভারতীয় ধরনের, পাহাড়ের ভেতর গেলে সবই প্রায় চৈনিক ধরনের, ভাষাতেও অনুস্বার বেশি। সমতল আর আধা সমতলে, নেপালী, লেপচা, মেচ, বড়ো আর রাভারা থাকে, আর পাহাড়ের রাজ্যে থাকে ভুটিয়া। আমাদের মতনই খাদ্য তাদের, পার্থক্য কেবল পুড়িয়ে খাওয়ায়। মদটা যেন নিত্য পানীয়; তেষ্টা পেলেই ঢকঢক করে এক ঘটি গলায় ঢেলে দিল।

আশ্চর্য শুধু সেখানকার বৌদ্ধমঠ। ভুটানের এখানে-ওখানে রয়েছে বৌদ্ধমঠ; নেপালের আনাচে কানাচে রয়েছে সিঁদুর মাখানো পাথর; আর বর্মার শহরের প্রতি কোণায় রয়েছে মদের দোকান। রুচির অভিনবত্বে তিনটি দেশই যেন পরস্পরকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে চলেছে।

জাহাজের সেই গোর্খাটির সঙ্গে কথা বলতে বলতে চুপ করে গেছি। তার উপস্থিতিটাও ভুলে গিয়েছি। বিশবছরের ভাঙাচোরা জীবনটার ছেঁড়া তারে কে যেন রিনরিন করে মূর্ছনা জাগিয়ে দিল, কে যেন কর্ণকুহরে সঙ্গীতধ্বনিতে শুনিয়ে গেল, এই কি পৃথিবী—এই কি বিশ্বরূপ!

ধীরে ধীরে সকালের আলো দেখা গেল। ঘুমন্ত জাহাজের হুসহুস করে

নিশ্বাসপাত বিনে আর কিছুই নেই। সামনে জল, পেছনে জল, চারিদিকে জল, জলে জলাকার। সাগরের তরঙ্গের পর তরঙ্গ এসে আছড়ে পড়ছে জাহাজের গায়ে, অতি ধীরে যেন মায়ের হাতে দোলনা দুলছে সন্তানের সুখনিদ্রার জন্য। নিস্তব্ধ শীতল মায়ের হাতের পরশ পেয়ে জাহাজও ঘুমুচ্ছে—আরামে হুসহুস করে নিশ্বাস ফেলছে!

ছটা না বাজতেই জাহাজে আবার বাজার বসে গেল।

ঘুরতে ঘুরতে সুলতান আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, তাকেও দেখি নি। আমায় ধাক্কা দিয়ে বললে, একি, বাবুমশা' কি সারারাত ঘুমোন নি?

আমি অপলকে তার দিকে চেয়ে বললুম, বোধহয়—এখানে বসেই রাতটা তা হলে কেটে গেছে।

একজন ক্যামেরা নিয়ে সূর্যোদয়ের ফটো তুলছিল। তাকেই দেখছিলুম। সুলতান আমার ধ্যান ভঙ্গ করে বললে, চলুন আমাদের কেবিনে, চা খেয়ে আসবেন। অনেকটা 'নিশিতে পাওয়া'র মত তার পেছন পেছন চললুম।

চা খেয়ে শরীরটা চাঙ্গা হল।

সুলতান বলতে থাকে তার সেদিনকার অসম্পূর্ণ ইতিহাস।

—একবার পড়েছিলুম বড়ই বেইজ্জতিতে—খোদার ফজলে বেঁচে গেলুম, শুধু হারামী নই বলে। এক তেঁতুলে জাত যাচ্ছিল বউ নিয়ে আফ্রিকায়। জাতে চুলিয়া মুসলমান। তবে আমাদের মত সুন্নত তারা নয়, তেঁতুলে মুসলমান আর আপনাদের ছোট জাত একই রকমের, এরাও যেমন নামে হিন্দু, ওরাও তেমনি নামে মুসলমান। রাস্তায় মরদটার হল কলেরা—মরল অবশেষে। ডাক্তার সাহেব সারটিফিটি দিল, দিলুম ফেলে দরিয়ার বুকে। টুপুস করে পড়ল আর গেল ডুবে। কিন্তু ফেলবার আগে মনে হল, লোকটা মরে নি। জাহাজে কলেরা হলে ঐ রকমই হয়। ওষুধপত্র নাই বললেই হয়, যাও বা আছে, তাও খরচ হয় সাহেবদের মাথার ব্যথা সারাতে। আর যদি মেমসাহেব রইল জাহাজে, তা হলে ডাক্তার তো 'ইজ মেডা' করতে করতে দিন কাবার করে।

আমি তার বিছানায় কাত হয়ে শুনছিলাম তার কথা। গল্পটা উপভোগ্য মনে হল, বললুম, তার পরে?

—ও পাশটায় কজন খালাসী তাসের জুয়া খেলছিল, তাদের মধ্যে একজন গলা খেঁকর দিয়ে বললে, কি সুলতান মিঞা, নিকার গল্প শুরু হল বুঝি—বলো, বলো, দুনিয়ায় কেউ যেন বাকী থাকে না।

তার কথা গায়ে না মেখে সুলতান আবার বলতে থাকে—মেয়েটা কেঁদেই

আকুল, কত আশা করে নতুন ঘর বাঁধতে যাচ্ছে আফ্রিকায়—খোদা তার সব ভেঙে দিল। কাঁদাটা মনে হল, স্বামী মরবার চেয়ে অচিন জায়গায় অসহায় অবস্থার জন্তই বেশী। জেনাবুকে (জোহান্সবার্গ) ওর স্বামীর বাড়ি আছে, কিন্তু তাকে তো কেউ জানে না।

—এই ভাবেই কেটে যায় ক'টা দিন। অবশেষে আমার হাত ধরে ভাঙা ভাঙা উর্দুতে বললে, মিঞা সাহেব, যদি কোনরকমে আমায় মালাবারে পৌছাতে পার তো আল্লার দরবারে তোমার হাজার দোয়া মাঙব।

আমি বললুম, দেখি কি করা যায়।

—অনেক কষ্টে সাহেবের হাত-পা ধরে রাজী করালুম। এই জাহাজেই সে থাকবে, ফিরতি-পথে ওকে নাবিয়ে দেবে ইণ্ডিয়াতে। তারপর থেকে ওপরের রেলিং ধরে রোজ বিকেলে সে দাঁড়িয়ে থাকত। দূর থেকে দেখেই আসতুম চলে। যা পয়সা ছিল তাই দিয়ে তার দিনও গুজরান হত।

সবাই কিন্তু ঠাট্টা করতে থাকে আমায়। শেষ পর্যন্ত আতিকুল্লা ওকে 'ভাবী ভাবী' বলে ডাকতেও শুরু করল।

তারপর জাহাজ ঘুরতে থাকে কত বন্দর, কত দেশ; সেও তাকিয়ে থাকে অনন্ত সমুদ্রের অজানা পথের দিকে, আমি ভাবি, কবে হবে তার দুঃখের শেষ। আর দু'দিন যদি কাটত, তা হলে হয়তো আমায় আজ আবার জাহাজে আসতে হত না।

হঠাৎ সেদিন দুপুরে আমার কেবিনে এসে হাজির; এসেই কেঁদে বললে, আপনার কি আমি অন্যায় করেছি যে, আমায় নিয়ে আপনার বন্ধু-বান্ধব ঠাট্টা করে। আমার ইজ্জতের কি দাম নেই?

আমি কিন্তু অতশত জানতুম না। আতিকুল্লা ছিল সামনে, সে-ই সব বললে। আমি গেলুম রেগে, হাতাহাতি হয় আর কি। এমন সময় এল সারেঙ্গ। সব শুনে সে রায় দিল, মুসলমানের মেয়ের বেইজ্জতি হতে পারে না। সুলতানকে বিয়ে করতেই হবে।

আমি তো অবাক! এদিকে সারেঙ্গের কথা না শুনলে গিয়ে বলবে সাহেবকে। মহা মুশকিল। একদিকে চাকরি—অপরদিকে মেয়েটার ইজ্জত। অবশেষে সবাই মিলে কাজীগিরি করে, মোহরানা কাগজে লিখে আমায় নিকা করালে। যে ঘরটায় আমরা নামাজ পড়তুম, সেই ঘরটায় বাঁধলুম ঘর। জলের বুকে যে ঘর বেঁধেছিলুম, সে মাটিতে গিয়ে শক্ত হয়ে কেটে বসল; তা নইলে, সুলতান আজ সুলতান হত, জাহাজের লস্করী তাকে করতে হত না। যাই হোক মুসলমানের ইজ্জত তো বাঁচল।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, ক'টা ছেলেমেয়ে হয়েছে।

—একটা মেয়ে, সেও যেন হুরী, খাবুসুরত, বললে বিশ্বেস করবেন না, কালো স্লেটে পেনসিলের সাদা দাগের মত ; ভূতের ঘরে হুরীর জন্ম !

অবশেষে মাটি দেখা গেল কদ্দিন পরে।

খবর নিয়ে জানলুম, পেনাং এসে গেছি।

পেনাং-এ দুদিন মাল ওঠানো-নামানোর জন্য জাহাজ দাঁড়াবে, জল নেবে, কয়লা তুলবে। আমি ঠিক করলুম এ দুদিন পেনাং শহর ঘুরে দেখা যাবে।

শরীফ আমার সঙ্গী—তাকে নিয়েই জাহাজ থেকে নামলুম।

জাহাজ-ঘাটায় কড়া পুলিসের পাহারা। পেনাং ইংরেজ স্বার্থের মস্তবড় কেন্দ্র। এখান থেকে হাজার হাজার টন রবারের রস যায় দেশ-বিদেশে। বিদেশে যায়, তবে সে বিদেশটা ইংরেজের দেশ। এখান থেকেই চালান যায় সীসা আর টিন। এই কারণেই ইংরেজ এই শহরটাকে সুরক্ষিত করতে ত্রুটি করে নি।

আমার পাসপোর্ট ও টিকিট দেখে, জাহাজ-ঘাটার পুলিস কর্মচারী জানাল আমায় সে জাহাজ থেকে নামতে দিতে পারে না।

আমি বিস্মিতভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে বললুম, কারণ ?

—আমাকে কৈফিয়ত দেবার জন্য সরকার এখানে রাখে নি, আমাকে হুকুম তালিম করতে রেখেছে।

কি দম্ভ এই ইংরেজ তনয়ের !

পরে সিঙ্গাপুরে শুনেছি কেন আমায় নামতে দেয় নি।

ইংরেজ লাঠিপেটা করে মালয়ে তার রাজত্ব কায়েম রেখেছে, তাই নতুন লোককে সেখানে আসতে দিতে চায় না। যদি পেনাংএর টিকিট থাকত, তা হলে হয়তো আমায় সেখানে নামতে দিত ; কিন্তু থাকতে হত নজর-বন্দী। ভারতীয়কে সুনজরে তারা দেখতে পারে না। ভারতের অনেক কালো-চামড়াই নেতৃত্ব করছে মালয়ের বিদ্রোহীদের। সেজন্য তারা সম্ভবপক্ষে ভারত থেকে নূতন লোককে আসতে দিতে চায় না।

কিন্তু শরীফ ছিল জাহাজের খালাসী, সে পাকিস্তানী—সে কারণে তার পক্ষে পেনাং প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়।

ক'টা দিন বন্দী-জীবন অনিবার্য। তাই স্বেচ্ছায় জাহাজের খোলে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। সন্ধ্যে বেলায় দল বেঁধে ইংরেজ মেয়ে-মরদ জাহাজ থেকে নামল,

তারা যাচ্ছে নিকটবর্তী মেরাইন ক্লাবে। সারারাত সেখানে চলবে মদের হুল্লোড় আর নাচ। বিকেলে কেবিনের ডেকের পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিলুম সারবন্দী মেয়ে-পুরুষের জাহাজ ত্যাগ। জাহাজে শ্বেতচর্ম বিশেষ দেখা যায় না। কেবল একটি ইংরেজ রমণী ওপরের ডেকটায় দাঁড়িয়ে আমারই মত চেয়ে ছিল ঐ দলটার দিকে। একবার ইচ্ছে হল, ওর সঙ্গে গিয়ে গল্প করি, কিন্তু তা করবার উপায় কৈ?

আমি উৎসুক নয়নে ওর দিকে মাঝে মাঝে চাইছিলুম—সেও মাঝে মাঝে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল। বয়সের বোকামিতে অথবা শাসকের দম্ভে ঠিক বুঝতে পারি নি।

জাহাজের সারা গায়ে আলো জ্বলে উঠল।

আমি ডেক ছেড়ে নীচের সিঁড়ির দিকে যাচ্ছিলুম, সিঁড়ির মুখে দেখা হল সেই ইংরেজ রমণীর সঙ্গে। কথা বলি বলি করি, বলতে পারছি না। ভারতীয় সভ্যতার কতকগুলো সংস্কার রয়েছে—তার মধ্যে গায়ে পড়ে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলাটা একটা অসম্ভব ঘটনা। আমার দিক থেকেও তার কোন ব্যতিক্রম নেই।

—আমাকে তুমি কিছু বলতে চাও? ঘাড় ফিরিয়ে ইংরেজ রমণীটি জিজ্ঞেস করেন।

—এমন কিছু নয়, ভাবছিলুম সবাই ক্লাবে গেল, তুমি গেলে না, এই আর কি? তুমি অসুস্থ?

—অসুস্থ নই, ক্লাব আমার ভালো লাগে না—তাই যাই নি।

আমি বললুম, ভালো, ধন্যবাদ। আর কিছু আমার বলবার নেই।

—না, ধন্যবাদ নয়, তুমি বেশ পরিষ্কার ইংরেজি বলছ দেখছি। এস আমার কেবিনে, ওখানে কেউ নেই, বড়ই একা একা রয়েছি। তোমার সঙ্গে গল্প করে আনন্দ পাব নিশ্চয়ই, সময়ের সদ্ব্যবহারও হবে। অবশ্য তুমি যদি অসুবিধা মনে কর, তা হলে কিছু বলবার নেই।

আমার অবস্থা কেদার চাটুজ্যের মত। গালে কাঁচা পাকা দাড়ি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, গত রাতে ঘুম ভালো না হওয়াতে চেহারাও বিশেষ সুবিধেজনক নয়। কেমন লজ্জা লজ্জা করতে লাগল। তবুও সে যখন Will you please দু-তিনবার বললে তখন বলতে বাধ্য হলুম,—চল, আসছি।

রেলের দ্বিতীয় শ্রেণী আর প্রথম শ্রেণীর সঙ্গে জাহাজের কেবিনের অনেক তফাত। গোয়ালন্দ থেকে R. S. N. কোম্পানীর স্টীমারে বহুবার দ্বিতীয় শ্রেণীতে চলাচল করেছি, তার দ্বিতীয় শ্রেণী আর জাহাজের কেবিনের তফাতও

অনেক। মনেই হয় না যে আমরা বাড়ির বাইরে এসেছি। কোনও প্রথম শ্রেণীর হোটেলে যেন ঘর ভাড়া নিয়ে রয়েছি—স্থানটা একটু অপরিসর মাত্র। ইংরেজ রমণীর কামরাটা দুজনের জায়গা সমন্বিত—সেজন্য চলবার একটু অসুবিধা রয়েছে একজনের কামরা যেগুলো, সেগুলো আরও আরামদায়ক। একখানা ডেক চেয়ারে বসতে দিয়ে, সে নিজে বসল বিছানার ওপর। প্রারম্ভে সে বলে নিল তার নাম মিস অগাস্টাইন্। লোক ডাকে ক্লারা বলে।

—তুমি জানতে চাইলে নাচের ক্লাবে কেন গেলুম না—এই তো? তুমি কখনও ক্লাবে গিয়েছ? যাও নি? না, না, খাস ইংরেজী ক্লাবে? এক সময় ইংরেজ ছিল পৃথিবীর বৃহৎ অংশের মালিক, আর আজ—ভারত গেছে, সিংহল গেছে, বর্মা গেছে, মালয় যায় যায়, সুদানের অবস্থাও সেরকম; ইরান তো লাথি দিয়ে হাঁকিয়ে দিয়েছে, মিশরের ইচ্ছেটাও ওই রকমই! এর কারণ কি জান? আমাদের দেশে বাইরে থেকে এসেছে প্রাচুর্য, সেখানে ভোগ করেছে সবাই, জীবনের যে কি মূল্য তা তারা জানে, তবুও যেন এরা ব্যালান্স রাখতে পারে নি। সব জায়গায় তারা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছে, তাতে আজ আমাদের ঘটেছে নৈতিক পরাজয়, আজ আমরা তৃতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পরিণতি হয়েছি। 'বৃটেন রুল দি ওয়েভস্'—আজ মিলিয়ে যাচ্ছে স্বপ্নের মত। এটাও আমরা চাই না যে, মানুষ দাসত্ব করুক, আবার এটাও আমরা চাই না যে, আমরা কুকুরের মত পদাঘাত সহ্য করে ঘরে ফিরে আসি। আসতে হয় আসব মর্যাদা নিয়ে—কুকুরের মত নয়—এই জ্ঞান আমার জন্মেছে বলেই ক্লাবকে আমি ঘৃণা করি।

আমি বললুম—আচ্ছা, বলতে পার আমায় কেন নামতে দিলে না এখানে?

—এই তো সংকীর্ণ রাজনীতি, যার ফলে আজ আমরা পৃথিবীর সহানুভূতি হারিয়ে ফেলেছি। তুমি দেশে গিয়ে লোককে বলবে, তারা আন্দোলন না করুক, তাদের মনে ইংরেজের ওপর জন্মাবে ঘৃণা—হয়তো বহির্দেশীয় নীতি অনুসারে মালয় সরকার বলবে, এরকম ঘটনা ঘটে নি, এসব মিথ্যা কথা। কিন্তু গণআদালত তো হাইকোর্ট নয়, যে ধীরে সুস্থে আইনের প্যাঁচ দেখে পা ফেলবে, তারা শুনবে তোমার কথাই বেশি। ঠিক এই ভাবে জন্মাচ্ছে সারা দুনিয়াতে ইংরেজ-বিদ্বেষ।

—একটা ঘটনা আমার মনে হচ্ছে, অনেক দিন আগে লাম্বার্ট নামে এক আইরীশ যুবকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল। লাম্বার্ট তখন শিক্ষানবীশ পুলিস অফিসার। সবে ভারতে এসেছিল—মনটা তার শাসকশ্রেণীর দম্ভে ভরা ছিল না, সেই কারণে সে সেদিন যা বলেছিল, তা বৃটিশ স্বার্থের পরিপন্থী হলেও, তার কথা আর তোমার কথায় যেন সাদৃশ্য রয়েছে। সে বলত, বৃটিশ মরবে শুধু

মদের বোতল মুখে নিয়ে, মেয়েমানুষকে আঁকড়ে ধরে। সত্যিই বুঝি তাই মরতে হচ্ছে বৃটিশকে।

ক্লারা লজ্জায় মুখ লাল করে আমার কথার জবাব খুঁজছিল। তার আরক্তিম মুখের দিকে চেয়ে বললুম—যাক ওসব কথা, বল দেখি তোমার দেশের কথা, আমার খুবই ইচ্ছে আছে একবার তোমার দেশে যাব, কিন্তু পয়সার অভাবে হয়ে উঠছে না।

—আমার দেশটা তোমার দেশের মতই মাটির দেশ, ইট কাঠ পাথর দিয়ে তৈরী বাড়িঘর। মানুষের গায়ের রঙটা বাদ দিয়ে অন্য কিছুর পার্থক্য নেই।

—আরো পার্থক্য আছে, সেইটেই দেখতে যেতে চাই। আমাদের দেশে যেমন ধাঙড় রয়েছে, মেথর রয়েছে, মুদ্দাফরাশ রয়েছে, তোমাদের দেশে আছে কিনা, তাই দেখবার ইচ্ছে আমার প্রবল। সাদা চামড়ার মেথর কেমন করে কাজ করে, সেই দেখবার একটা লোভ আছে। আর দেখতে চাই সসাগরা ধরিত্রীর যারা অধিকারী, তাদের দেশে আমাদের মত নিরন্ন কজন আছে!

আমার কথায় ক্লারা স্তব্ধ হয়ে রইল, ভাবছিল হয়তো কি করে আমার কথার জবাব দেবে। আমি ভাবছিলুম, নোঙরা জিনিস দেখবার যার এত সাধ, তাকে বোধহয় সে গ্রহণ করতে পারে নি মনের উদারতা দিয়ে।

বললুম, ভাবছ কি?

না ভাবছি না—ভাবছি, ভাবছি তোমার দৃষ্টিকোণ কোথায় যাচ্ছে। সবাই দেখতে চায় লণ্ডন, মানচেস্টার, দেখতে চায় রাজপ্রাসাদ আর পার্লামেণ্ট, বেড়াতে চায় টেমসের কিনারায়, স্কচ দেশে, তুমি সেসব না চেয়ে দেখতে চাইছ নোঙড়া কাজগুলো কিভাবে হয় আমার দেশে, ঘুরতে চাইছ কুলি-মজুরদের আস্তানায়, তাদের জানতে চাইছ অনুবীক্ষণ দিয়ে। তাই ভাবছি, আমরাও ওদের কথা ভাববার অবসর পাই না, ওদের যে একটা সামাজিক মর্যাদা আছে, তাও বুঝতে পারি না, অথচ তুমি চাও ওদের দেখতে। হাজার হাজার মাইল দূর থেকে পয়সা ব্যয় করে যেতে চাও ঐ অবহেলিত সমাজকে দেখতে? আশ্চর্য!

—আশ্চর্য নয়। এই ধর, আমি ডেকের যাত্রী আর তুমি কেবিনের যাত্রী। তোমাদের কাছে আসছে চা বিস্কুট, স্যাণ্ডউইচ্, স্যুপ্ কত কি! আর ঐ ডেকের তলায় বসে কেউ খাচ্ছে ইডলী ধোসা, কেউ খাচ্ছে চাপাটি চাটনী, কেউ খাচ্ছে ডাল-ভাত। তুমি কতটুকু জান ওদের? তোমার সাম্রাজ্যবাদী মনে আঘাত-লেগেছে, তোমাদের সাম্রাজ্য খসে পড়ছে; তার কারণ ঠিক করেছ, তোমাদের নরনারীর উচ্ছৃঙ্খলতা। কিন্তু মানুষের মন নিয়ে তুমি একবার চেয়ে দেখ, দেখবে তোমরা

যা হারাচ্ছ, তার জন্য দায়ী তোমাদের উপর তলার মন—নীচের তলার প্রতি উপেক্ষা! তোমার সুখ-সুবিধে বজায় রেখেও একটুখানি ত্যাগ, একটুখানি মমত্ব নিয়ে নীচের তলার নেমে এসে, দেখবে ইংরেজ যা হারাচ্ছে তার কারণ হৃদয়হীনতা, আর সে হারানোর দাম অঙ্ক দিয়ে কসবার মত নয়, হৃদয় দিয়ে অনুভব করবার।

—আচ্ছা, আজ শুভরাত্রি জানাচ্ছি আবার কোনও সময় দেখা করব।

—না বস। তোমার তত্ত্বকথা আমার যেন উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলল!

আমি হেসে বললুম, তত্ত্বকথা নয়। এইগুলোও ঘটনা, যার ভিত্তিতে আজ পৃথিবী চলছে। আজকে এইগুলোই সত্য। পাঠশালার গুরুমশায়ের মত বোর্ডে 'সদা সত্য কথা বলিও' লিখে বাড়িতে তামাক চুরি করতে শিশুকে পাঠালে যেমন সত্য শিক্ষা ব্যর্থ হয়, তেমনি তত্ত্বকথা বলে কার্যক্ষেত্রে বৈরাগ্য নিয়ে নাক উঁচু করে থাকলে তত্ত্বকথা ব্যর্থ হয়। ব্যর্থ হয় না ঘটনা। আজকের সত্য হয়তো কালকে সত্য নয়, কিন্তু আজকের উপলব্ধি আগামী দিনের সঞ্চয়। তাই বলছিলুম, চল, দেখে আসবে, দুশো বছর ভারত শাসন করে আজ ভারতীয়দের কোথায় তোমরা টেনে এনেছ, আর আমায় দেখিয়ে আন দুশো বছরে কত সম্পদ তোমরা সংগ্রহ করেছ পরদেশ শোষণ করে।

—আমাদের আভিজাত্য মূল্যহীন নয় মিঃ—, আমাদের এই আভিজাত্য আমাদের যে অভিমান সৃষ্টি করেছে, তাতেই আমরা পেরেছি অন্যদেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে।

—সেই অভিমানের জন্যই তোমরা শৃঙ্খলমুক্ত করতে পার নি বললেই ঠিক হয়। আভিজাত্যের তাসের ঘর ভেঙেছে বলে তোমরা শৃঙ্খল মোচন করতে বাধ্য হয়েছে।

স্টুয়ার্ড এসে এক কাপ কফি আর দুটো স্যাণ্ডউইচ দিয়ে গেল।

মিস ক্লারা ডাকল—বয়। শ্মশ্রুগুম্ফ বিরহিত পক্বকেশ গোয়ানীজ বয় এসে আবার সেলাম দিল।

—আর এক কাপ!

—ইয়েস মেমসা—বলে বয় চলে গেল।

আমি বললুম—অনর্থক অর্থব্যয় করে কি লাভ, আমি তো এখুনি হোটেলে যাব।

—তাতে কি, আজকের রাতের খাবার আমার সঙ্গে খেয়ে যেও।

—তোমার বিশেষ অনুগ্রহ, কিন্তু তুমি যদি আমার কথার ধাক্কায় ঔদার্য দেখাতে চাও, তা হলে অনর্থক তোমার নেমন্তন্ন। যদি আমার মত মন নিয়ে মানুষকে

ভাবতে পার, হাজার বার তোমার নেমন্তন্ন গ্রহণ করব ; আর তার সঙ্গে তোমায়ও নেমন্তন্ন করব, আমার সঙ্গে ডিনার খেতে।

কফি খেয়ে সে বললে, চল, ডেক দেখে আসি।

দুজনে নামলুম।

সিঁড়ির পাশটায় এসে ক্লারা যেন হাঁপিয়ে উঠল, সে বললে, আমার হাত ধর মিঃ—। উঃ, কি অন্ধকার! অন্ধের মত কারুর ঘাড়ে পড়ে না যাই।

—ডেক প্রায় খালি, পড়বার ভয় থাকলেও ঘাড় খুঁজে পাবে না, বরং তোমার পা মচকাবে।

কতকগুলো তক্তা ডেকের ছাদ থেকে শেকল দিয়ে ঝোলান ছিল, তার দিকে আঙুল দিয়ে বলল, ওগুলো কি?

—আমিও এই প্রথমে জাহাজে উঠেছি, সব জিনিস ব্যাখ্যা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বরং দুজনে মিলে দেখতে থাকি। ঐ দেখ এক-একটা পরিবার তিন-চার হাত জায়গা কেমন দখল করে বাক্স বিছানার আড়াল দিয়ে সংসার পেতে বসেছে।

—ওরা কোন্ দেশের?

—যতদূর মনে হয় সবাই ভারতীয়, দক্ষিণী। এরা যাচ্ছে সিঙ্গাপুরে কুলির কাজ করতে। আরও দেখতে পেতে কালকে এলে, রবার বাগানের কুলীরা সব এখানে নেমে গেছে। তাই সবাইকে দেখবার মত দুর্ভাগ্য তোমার হল না।

মেম সাহেব দেখে সবাই ভিড় করে দাঁড়াল। ডেকে মেম সাহেব! ওদের কাছেও আশ্চর্য লাগছিল।

ও-পাশে একটা ছেলে জ্বরের ঘোরে চীৎকার করছিল। মিস ক্লারা আমায় সেখানে নিয়ে গেল। সে বললে, জাহাজের ডাক্তারকে দেখাচ্ছে না কেন?

—ও ডাক্তার তোমাদের জন্য, এই কুলীদের দেখবার ডাক্তার ইংরেজ সৃষ্টি করে নি।

—তুমি কেন ইংরেজকে ঠেস দিয়ে কথা বল? গরীবদের দেখবার ডাক্তার ইংরেজেরই সৃষ্ট, সত্যের অপলাপ কর না।

আমি লজ্জিত না হয়ে বললুম, সেই গরীবদের ডাক্তার দেখাবার ব্যবস্থা তোমরা কর, অবশ্য যাদের কাছ থেকে তোমরা সুখ-সুবিধে আদায় করতে পার। নয়তো গরীব সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কত কম, তা কিছুক্ষণ আগে তুমিই স্বীকার করেছ।

সে যেন ক্ষেপে গেল, বললে, আচ্ছা চল আমি ডাক্তার পাঠাচ্ছি।

—তুমি গেলে আসবে, আমি গেলে আসবে না। দেখবে পরীক্ষা করে?

—হাঁ। দৃঢ়তার সঙ্গে সে জবাব দেয়।

ডাক্তারবাবু বাঙালী। যেন খাস কলকাতার লোক। আমি সবিনয়ে তাঁকে বললুম, নীচে একটা ছেলের খুবই অসুখ।

—তাকে আসতে বল।

—বল নয়, বলুন। কিন্তু তার আসবার ক্ষমতা নেই।

আমার সংশোধনটা ডাক্তারবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আজ পর্যন্ত কেউ বোধহয় তাঁকে সাধারণ ভদ্রতা শেখাবার সাহস পায় নি। কিন্তু আত্মাভিমান এমন একটা জিনিস, যা আঘাতে ভেঙে গেলেও, খন খন একটা শব্দ না করে হার মানে না। তিনি বললেন, কারুর কোন ফোঁপরদালালীর দরকার নেই, যার দরকার সে-ই আসবে।

দরজার বাইরে ক্লারা দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে এসে বললুম সব কথা। সে আমাকে দাঁড়াতে বলে, নিজে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তারসহ ক্লারা বেরিয়ে এল।

খেতে বসে মিস ক্লারা বললে, আভিজাত্য অভিমান সৃষ্টি করে। কিন্তু সে অভিমান মূর্খতার নামান্তর।

—এতদিনে বুঝলে বুঝি। দেখলে তো ডাক্তারকে। এই হল ইংরেজের সৃষ্ট অভিজাত শ্রেণী। এদের সম্মানবোধ নেই, কিন্তু আভিজাত্যের ভেক আছে। শুধু এই ডাক্তারই নয়, আমাদের দেশকে যে আজাদী দিয়ে তোমরা মন্ত্রী, আধামন্ত্রী সব সৃষ্টি করেছ, তারাও এমনি অন্তঃসারশূন্য; তাদের আভিজাত্যের দম্ভ আছে, আবার পদলেহনের ইতরামিও আছে, এই ডাক্তারের মত। তারা সত্যকে স্বীকার করে না, তারা ঘটনাকে নস্যাৎ করতে চায়। আমি তোমাদের অপমান করতে ইচ্ছুক নই, কিন্তু এই হয়েছে তোমাদের দুশো বছরের শাসন ও শোষণের ফল।

আমি হাত দিয়ে সুপের সঙ্গে রুটি চটকে খাচ্ছিলুম। ক্লারা অনেকক্ষণ আমার খাওয়া লক্ষ্য করে বলল, তোমাদের কাঁটা-চামচের দরকার হয় না?

—হওয়ালে হয়, কিন্তু কেনবার পয়সা কোথায়? তুমি বুঝি ভারতবর্ষে যাও নি?

—গিয়েছি, কিন্তু থেকেছি মাত্র ছ দিন—অত দেখবার অবসর পাই নি।

—এই অভিজ্ঞতা নিয়েই তুমি বোধহয় দেশে গিয়ে বড় বড় প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করবে? বম্বে আর কলকাতা দেখে তুমি তৈরি করবে গালগল্প, তারপর মসলা দিয়ে পরিবেশন করবে আমাদের দেশ কেমন! কলকাতা আর বম্বে ভারতবর্ষ নয়। দিল্লীর প্রেসিডেন্ট ভারতের প্রতীক নয়। ভারত তৈরী তার

অসংখ্য গ্রাম আর নিরন্ন গ্রামবাসী নিয়ে। তাদের খাবারের পয়সা নেই, কোথায় পাবে তারা কাঁটা-চামচ, কোথায় পাবে তারা স্যুপ-স্যাণ্ডউইচ? স্বাধীন হয়েছি সত্য, সেও যেন কাগজে-কলমে, সে স্বাধীনতা কয়েক গণ্ডা লোকের জন্ম; মানুষের স্বাধীনতা আজও আসে নি। এই সমাজব্যবস্থা থাকলে আসবেও না ইহ-জীবনে।

পরের দিনটাও গেল মিস ক্লারার সঙ্গে গল্প করে।

জাহাজ আবার চলল।

জলের বুক কেটে ছুটছে—ছুটছেই।

কেবিনের বারান্দায় আবার সাদা চামড়ার ভিড় বসেছে, ডেকের খোলে আবার বাজার বসেছে কালোর।

জাহাজ চলেছে—চলেছেই।

খালাসীদের সেই জল মাপা, রশি টানা—কাপ্তেনের সবুট মচমচানি চলনফিরন আর হুকুম তেমনি শোনা যাচ্ছে।

জাহাজ দুলছে—দুলছেই।

আবার ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে আঘাত দিচ্ছে জাহাজের গায়ে, স্নেহ-পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে জাহাজের সামনে পেছনে।

জাহাজ এগোচ্ছে—এগোচ্ছেই।

সেই জল—জলের নীলিমা—ফিকে থেকে গাঢ় হয়ে উঠছে, আবার সেই গাঙ্‌চিল, অবার সেই অনন্ত জলরাশি দিগন্ত প্রসারিত!

অধীর আগ্রহে যাত্রীরা দিন গুনছে—গুনছেই।

রাতের বেলায় সিঙ্গাপুরের বাহির দরিয়ায় জাহাজ এসে দাঁড়াল।

প্রাচ্যের দুর্ভেদ্য দুর্গ সিঙ্গাপুর। ইংরেজের শক্তি-বিনিময় কেন্দ্র সিঙ্গাপুর। কে যে সিঙ্গাপুর নাম রেখেছিল জানি না। তবে শৃঙ্গের মত জলের বুকে এসে মিলেছে প্রধান ভূমিখণ্ড—তাই বোধহয় শৃঙ্গপুর ধীরে ধীরে সিঙ্গাপুরে পরিণত হয়েছে, কে জানে কি কারণে সে নাম।

কাটমণ্ডু নামটা শুনে মনে হয়েছিল, কোনকালে বুঝি মানুষের মুণ্ডু কেটে পত্তন হয়েছিল সেই নগরীর—কিন্তু আমি মনে করেছিলুম, অমন সুন্দর নগরীটা তৈরী হয়েছে গরীবের মুণ্ডু কেটে—তাই নামের সার্থকতা রয়েছে। বিলাসের উচ্চতা যেমন, তেমনি দারিদ্র্যের ভয়াবহ পরিণতি। এমন কি পয়সা থাকলেও সাধারণ লোকে যেখানে পাকাবাড়ি তৈরি করতে পারে না, বাধ্য হয় অন্ধকূপে থাকতে,

কাঠের ঝুপড়ি বেঁধে দিন কাটাতে ; সে শহরের নাম কাঠমণ্ডু বিনা অন্য কিছু রাখলে অবিচার করা হত।

অনেক সময় মনে হয়েছে রঙ-ইন নামটা বোধহয় রেঙ্গুনের পক্ষে বেশী প্রযোজ্য। কত রঙই আছে তার ভেতর, কত পাপ সঞ্চিত আছে তার ভেতর, কে বলতে পারে ? ঠিকই Wrong-in.

যাই হোক বহুপ্রার্থিত সিঙ্গাপুর এলুম।

এখানে জন্ম হয়েছিল, আজাদ হিন্দ সরকারের—তাই বিরাটত্ব না হোক ভারতের কাছে সেই কারণে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে এই নগরী।

এই সেই সোনান, যার বুকে প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল 'জয়হিন্দ !' মনে হল, সোনানের মাটি কপালে তুলে তিলক পরি। মন আমার বৈরী হঠাৎ মনে পড়ল একটা ঘটনা।

ঘটনার নায়ক আমারই এক সহকর্মী।

তাকে স্বদেশী আমলে গোয়েন্দাপুলিসের ইনসপেক্টর গুলী করলেন। গুলী বুক ভেদ করে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

তাকে নিয়ে গেল হাসপাতালে, সাত মাস পরে সে বেঁচে উঠল, তবুও হল তার বিচার—শাস্তি হল এক বছরের কারাদণ্ড !

দেশ স্বাধীন হবার পর কলকাতায় তার সঙ্গে দেখা। দেখলুম বেশ খুশী হয়ে ঘুরছে, বললুম, হঠাৎ এত খুশী।

—যাক, এবার অন্তত আমায় যে গুলী করেছিল তার শাস্তি হবে।

আমি হাসলুম।

আবার তার সঙ্গে দেখা দুবছর পরে। বললে, দাদা, না খেতে পেয়ে বউ-ছেলে যে মরে যাচ্ছে ! সে ব্যাটা ডি. এস. পি. হল, আর আমি না খেয়ে মলুম।

আমি আবার হাসলুম।

সে বললে, হাসছেন যে ?

—ভাবছি, সেদিন যদি গুলী খেয়ে আপনি মরতেন, তা হলে আজ শহীদ লিস্টে আপনার নাম উঠত। আমরা তেরচা করে তিন-চারখানা ইটের বেদী করে বাজার থেকে ছ পয়সার মালা কিনে বেদী সাজিয়ে, কৃত্রিম চোখের জলে গামছা ভিজিয়ে বলতুম, 'জয়হিন্দ'। কিন্তু শহীদ হতে যখন পারেন নি, আবার প্রস্তুত হতে থাকুন সপরিবারে শহীদ হবার জন্য, তবে অনাহারে।

আমার ব্যঙ্গে সে মর্মাহত হল, বললে, আপনার ঘরে খাবার আছে বলে আপনি আজ হাসতে পারছেন, ব্যঙ্গ করছেন !

—আপনার জ্যোতিষ ভুল, আমার খাবার নেই, আর নেই কেন জানেন? আমি শহীদ হতে পারি নি, শহীদ হয়েছে আধা বাঙলাদেশ, তাই আজ খাবার নেই ! বেঁচে থাকলে ভাত-কাপড় সংগ্রহ মুশকিল, মরলে দানসাগর শ্রাদ্ধ করতে বেশি বিলম্ব হয় না, একটা যে Permanent liability—আর অন্যটা যে সাময়িক। তাই আমি আপনি একই platform-এ শহীদ হবার প্রতীক্ষায় আছি !

এই গল্পটা গল্প নয়, সিঙ্গাপুরের জমিতে পা দিয়ে এই ঘটনাটা মনে পড়ে গেল।

কেন মনে পড়ল তাই বলছি।

সুভাষবাবুর নামে এখানকার ভারতীয়রা পাগল, ভারত স্বাধীন দেখবে বলে এদের আগ্রহের অন্ত নেই। সেই ভারত স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু স্বাধীন ভারতের সিঙ্গাপুরী অধিবাসীরা আজও ইংরেজের গোলামী করছে। আজও রবার বাগানের রসের সঙ্গে তাদের বুকের রক্ত মিশিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু তাদের দারিদ্র্য আর দুর্ভোগ শেষ হয় নি। ওরাও যদি শহীদ হত, আমরা কাঁদতুম, অন্তত কাঁদবার ভান করতুম। কিন্তু বেঁচেও ওরা মরে আছে। ওদিকে দিল্লীর কেল্লায় পত পত করে উড়ছে অশোকচক্র ; বয়স্থ নিয়ে শাসক বলছে, 'সত্যমেব জয়তে'।

আজও বর্মার পথে পথে স্বাধীন ভারতের লোক রিক্‌শা টানছে, বর্মীদের পায়খানা পরিষ্কার করছে, আজও সিঙ্গাপুরের পথে পথে স্বাধীন ভারতের নাগরিক ঠেলা টানছে, রবারের বাগানে রক্ত মোক্ষণ করছে। আজও স্বাধীন ভারতের স্ত্রী-পুরুষ ভারতের বাইরে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইছে—রেণ্ডা পৈসা—রেণ্ডা আনা কুরুপ্পা, স্বাদম ইল্লে—অন্নম ইল্লে (দুটো পয়সা, দুটো আনা দিন মশায়, ভাত নেই —ভাত নেই)। অথচ আমরা স্বাধীন ! এরাও শহীদ হবে একদিন, এদের হাড়েই দধীচি উঠবে জেগে।

তাই যারা দেউলে হয়ে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে, তাদেরই দেওয়া হয়েছে অনাহারে শহীদ হবার পথ খুলে।

কলকাতার মত নদীর বুকে টিপটিপ করে এসে জাহাজ এখানে নোঙর করে না। সিঙ্গাপুর মস্ত বড় পোতাশ্রয়—চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টনী জাহাজ নিরাপদে নোঙর করে থাকতে পারে জমির কিনারায়। কিন্তু সিঙ্গাপুরটা আসল ভূখণ্ডের

অংশ নয়, দ্বীপ মাত্র, অনেকটা বোম্বাইয়ের মত। কিন্তু দ্বীপের আকার বড়। শাসনব্যবস্থাও মালয়ের অন্যান্য অংশ থেকে আলাদা।

নির্বিবাদে কাস্টম্‌সের বেষ্টনী পার হওয়া দুষ্কর। যতগুলো সম্ভব-অসম্ভব প্রশ্ন করা যায়, সবই করবে তারা; কেন যে বউ আনি নি সঙ্গে তারও কৈফিয়ত দিতে হয়। কাগজপত্র চিঠিচাপাটি সবগুলো খুলে খুলে চীনা কনস্টেবল দেখল। তাতেও খুশী নয়, পাশের ঘরে গিয়ে স্থান-অস্থান অনুসন্ধান করবার পর সিঙ্গাপুর প্রবেশের অনুমতি পেলাম। মনে হল, আমার বেলায় যেন কড়াকড়ি বেশী। কারণটা আজও অজ্ঞাত। সিঙ্গাপুর প্রাচ্যের দ্বাররক্ষক—দ্বারী ইংরেজ—তল্পিবাহক মালয়ী, ভারতীয় আর চীনা পুলিস কর্মচারী। চীনাদের সংখ্যা খুব কম নয়। মালয়ীরা বেশীর ভাগই মিশ্রিত জাতি; তাদের রং দেখে সব সময় ভারতীয় বলে ভুল হয়। বন্দুক শুধু গোর্খাদের হাতে।

সুন্দর শহর। শুনেছি যুদ্ধের পূর্বে আরও সুন্দর ছিল। অনেক অট্টালিকাই বোমার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে অতীত গৌরবের আর ইংরেজের প্রাচুর্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে। কোথাও কোথাও মেরামত হচ্ছে কঙ্কালসার বাড়িগুলো, কোথাও বা তারই বুকে ঝুপড়ি বেঁধে কুলী বস্তী বসেছে। স্থানে স্থানে নর্দমাগুলো পচা ময়লা আর জলে ফেঁপে উঠেছে।

চীনা পল্লীটা অনেকটা সুদৃশ্য—কিন্তু ভারতীয় পল্লীটা অত্যাধিক দুর্গন্ধময়। আমি ভারতীয় বলতে ধনীকে বোঝাতে চাচ্ছি না, যারা কুলী-মজুর তাদের কথাই বলছি। অনেকটা বর্মার মত, মদের দোকানের প্রাচুর্য রয়েছে, দেহ-বিপণীও রয়েছে, আর দেহ-বিক্রেতার বহুলাংশ ভারতীয়।

এক সময় কোয়েটায় বাঙালী মেয়েকে দেহপণ্যে আত্মপ্রবঞ্চনা করতে দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলুম, কিন্তু সিঙ্গাপুরে এসে আমার ভ্রান্তি ঘুচে গেল। বেশ স্পষ্ট করে ভাবতে চাইলুম, এ দেহবিক্রয়ের কারণ কি। অর্থনৈতিক ভিন্ন আর কোন কারণ খুঁজে পাই নি। নয়তো মাদ্রাজ থেকে দেহের পশরা নিয়ে মেয়েরা নিশ্চয়ই এদেশে আসে নি; তারা এসেছিল তাদের গরীব মা-বাপের সঙ্গে, দারিদ্র্য তাদের বিপথে এনেছে।

পঞ্জাবীদের একটা হোটেল দেখে খেতে বসলুম।

হোটেলের যাত্রী সবাই আমার মত দরিদ্র। ডাল, ভাত, চাটনি, ভাজি, এরই খরিদ্দার বেশি; মাছ-মাংস ভক্ষণকারীর সংখ্যা কম। কেউ কেউ রুটি আর তড়কা দিয়ে ডালও খাচ্ছে। দইও দেখলুম কারুর পাতে।

এসব দেশেই দেখলুম, আহারের ব্যবস্থা রয়েছে, বাসস্থানের ব্যবস্থা নেই। অবশেষে চীনা পল্লীর একটা হোটেলে বাসস্থান ঠিক করলুম।

তিনতলা পাকাবাড়ি—মেঝেটা কাঠের পাটাতনের, ওপরে টিনের ছাউনি। রাস্তা থেকে সিঁড়ি থাকে না। প্রত্যেকটা অংশ আলাদা করে ভাগ করা। আমার কামরায় খাট, বিছানা, মশারি ছিল, পাশে বাথরুমও পাওয়া গেল—অনেকটা ইংরেজী কায়দায় ব্যবস্থা। দৈনিক দক্ষিণা দিতে হবে ছয় স্টার্লিং—আমাদের দশ টাকার মত।

বর্মায় প্রথমে গিয়ে গ্রীন হোটেলে ছিলুম; তার ব্যবস্থা যদিও এর চেয়েও নিকৃষ্ট, কিন্তু সেখানে দক্ষিণা দিতে হয়েছে দৈনিক সাড়ে বাইশ টাকা।

আমার সামনের ঘরটায় একটি থাই-দম্পতি পুত্রকন্যা নিয়ে এসে উঠেছেন। দেশে তাঁর মস্ত ব্যবসায়; এসেছেন জাকার্তার পথে সিঙ্গাপুর। এখানে কদিন থেকেই তিনি রওনা হবেন।

আমার মনে হয় সেদিন রবিবার।

শহরের চঞ্চলতা কম।

থাই ভদ্রলোকের ঘরে বিরাট আড্ডা বসেছে। কজন লোক ছিল তা দেখি নি তবে হট্টগোলটা ক্রমেই বেড়ে চলছিল।

এমন সময় দরজা ধাক্কাধাক্কিতে উঠে দরজা খুললুম।

সামনে দাঁড়িয়ে পুলিস অফিসার।

আমায় কথা বলবার অবসর না দিয়েই তিনি বললেন, তুমি সিঙ্গাপুরে কেন এসেছ?

—সে কথা তোমাদের সিকিউরিটি পুলিসকে বলে এসেছি।

—আমি সিকিউরিটি থেকে আসছি, তোমার statement-টা আমায় পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

আমার পাসপোর্ট উলটে-পালটে দেখে বললে, এতে দেখছি লেখা আছে, তুমি চাকরি কর, অথচ তুমি লিখেয়েছ, তুমি ব্যবসায়ী—এর অর্থ?

—অতি সহজ। যখন পাসপোর্টের দরখাস্ত করেছিলুম, তখন চাকরি করতুম, যখন সিঙ্গাপুরে আসি, তখন চাকরি ছেড়ে ব্যবসায়ের খোঁজেই এসেছি।

—তুমি কার কার চাকরি করতে তার একটা লিস্ট দাও—তাদের ঠিকানা দাও। সাতদিনের বেশি তোমার যদি থাকতে হয়, তা হলে আমাদের বিনা হুকুমে হোটেলের বাইরে যেও না।

আমি নিজেকে অপমানিত মনে করলুম, বললুম, আমায় যতক্ষণ তোমার গবর্নমেন্ট লিখিত-হুকুম না দিচ্ছে, ততক্ষণ আমি কোন কথাই শুনতে রাজী নই।

—এটা তোমার দেশ নয়, বেশি চালাকি করলে কয়েদ হবে। সেও তর্জন করলে।

আমি বললুম, আমি সিঙ্গাপুরী-ভারতীয় নই, আমি, যাকে বলে পাকা ভারতীয়, তাই আমার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমার দেশের গবর্নমেন্টের। যদি কখনোও কয়েদ করতে পার, তার বিহিত করবার দায়িত্ব আমি নিলুম, কিন্তু বিনা লিখিত-হুকুমে তোমার ঔদ্ধত্য শুনতে রাজী নই।

—বেশ দেখা যাবে। বলে ইনস্পেক্টরটি চলে গেলেন। তাঁর ইংরেজী উচ্চারণের ভঙ্গীতে মনে হল, তিনি সংকর-মালয়ী; পিতা বোধহয় তামিলী-মাদ্রাজী।

আমি দরজা দিয়ে বসেছি; তখনও উত্তেজনায় মুখ কান গরম, এমন সময় আবার দরজায় ধাক্কা।

দরজা খুললুম। সামনে দাঁড়িয়ে একটি বালক আর একটি বালিকা। প্রথম জনের বয়স ষোলো-সতেরো হবে, দ্বিতীয় জন তার চেয়ে কিছু বড়। বিলিতী কায়দায় পোশাক দুজনেরই, কিন্তু চেহারা বিলিতী নয়।

তারা সটান ঘরে ঢুকে বিছানায় বসল; আমার অনুমতি নেবার অপেক্ষাও করল না। ছেলেটা উপযাচক হয়ে বলল, আমার নাম তৈয়চি; এ আমার বড় বোন চোনাদা। আমরা থাই, অর্থাৎ স্বাধীন দেশের ছেলেমেয়ে; তোমার প্রতিবাসী, ঐ সামনের ঘরটায় থাকি।

—ভালো কথা, তোমাদের কি কাজে আমি লাগতে পারি? বলে দুজনের দিকে চাইলুম।

মেয়েটা উত্তর দিলে, কিচ্ছু না, আমাদের ঘরটায় বড়ই হট্টগোল হচ্ছে বলে তোমার ঘরে এসে বসলুম।

—বেশ ভালো, বলে আমি উঠে দরজা বন্ধ করে চিঠির কাগজ নিয়ে লিখতে বসলুম। আমার লেখা দেখে ছেলেটা অধৈর্য হয়ে বললে, বাঃ! আমরা এলাম তোমার ঘরে, তুমি আমাদের সঙ্গে কথা বন্ধ করে লিখতে বসলে যে বড়?

—তোমাদের জিজ্ঞেস করলুম, তোমাদের কি কাজ করতে পারি, তোমরা বললে, কিছু না। তা হলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে অনর্থক বসে কি লাভ; তাই ক'টা দরকারী চিটি লিখতে বসেছি। তোমরা চাও তো, তোমাদের দেশের গল্প বল। আমি চিঠি লেখা বন্ধ করে তোমাদের গল্প শুনব।

—আমাদের দেশ, ওঃ, সে একটা বিরাট দেশ—জাহাজ, ট্রাম, মোটর, প্লেন—যা আছে দুনিয়ায়, তাই আছে আমাদের! বলে গর্বে মেয়েটা ভালো হয়ে বসল।

—এই তোমাদের দেশের বুঝি পরিচয়? তোমাদের দেশে আমি যদি যাই, তা হলে কোথায় গিয়ে থাকব?

—কত হোটেল রয়েছে, তার কি শেষ আছে? সেখানে থাকবে! প্লেনে টুপ করে গিয়ে বাৎলে দিও কেমন ভাবে থাকতে চাও, তা হলে গাইড পাবে; সে-ই নিয়ে যাবে তোমার পছন্দমত জায়গায়। দেখবে রাজবাড়ি, পার্লামেণ্ট, চিড়িয়াখানা। কোন জিনিসের দুঃখ নেই।

আমি হেসে বললুম, তোমাদের দেশটা একবার বেড়িয়ে এসেছি, সেজন্য যা বলবে, তা ঠিক ঠিক বলবে। বাইরের লোক মনে করে লম্বা লম্বা কথা বল না যেন। কোনও জিনিসের দুঃখ নেই তো বললে, রাস্তায় অত ভিখিরী ঘোরে কেন? ধনীর বড় বড় বাড়ির তলায়, ছোট ছোট ঝুপড়িতে যারা বাস করে, তাদের দুঃখ নিশ্চয়ই তোমাদের চেয়ে বেশি নয়?

মেয়েটি নির্বাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল। ছেলেটি এতক্ষণ কথা বলে নি; এবার সে বললে, তা হলে তুমি ব্যাঙ্কক গিয়েছ?

—শুধু ব্যাঙ্কক নয়, আরও দু-এক জায়গায় গিয়েছি, যেখানে তোমাদের দেশে মানুষ পেষণের ব্যবসা চলে। এই ধর মালয়ের উত্তরে; সেখানে রয়েছে শ্যামদেশের টিনের খনি, রবার বাগান; সেখান দিয়েও যেতে হয়েছে, অবশ্য নেমে দেখবার সৌভাগ্য সব সময় হয় নি। তবুও রেল স্টেশনে তোমাদেরই মত ছেলেমেয়েদের অর্ধ-উলঙ্গভাবে দেখেছি, দেখেছি ছোট ছোট ছেলেরা মোট বইতে বইতে কুঁজো হয়ে গেছে, দেখেছি কুষ্ঠ রোগী রাস্তায় পড়ে কাতরাচ্ছে, দেখেছি মজুরের হাড়ভাঙা খাটুনি—আবার দেখেছি ধনীর বিলাস, মদের ফোয়ারা, ইয়াংকী নাচ, আরও কত কি। দুঃখ নেই বললে, আমি স্বীকার করি না।

ওরা আমায় সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস তখনও করতে পারে নি, তাই ছেলেটি কৈফিয়ত আদায়ের সুরে বললে, বল দেখি, ব্যাঙ্ককে কোথায় ছিলে তুমি?

মেয়েটি ডান হাতের মধ্যমার আঙটিটা বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে বললে, এইবার বুঝব তুমি, আমাদের দেশে গিয়েছ কিনা।

আমি তাদের অবিশ্বাসটাকে পাকিয়ে তুলতে বললুম, তোমরাই বল দেখি, কোথায় ছিলুম।

—তা হলে তুমি ব্যাঙ্ককে যাও নি!

—হাঁ, ব্যাঙ্ককে যাই নি—তবে তোমাদের দেশে গিয়েছিলুম।

এবার ওরা পেয়ে বসল, মেয়েটা আমার জামার হাতাটা টেনে ধরে বললে, তবে মিছে কথা কেন বললে?

এইবার আর হাসি দমন করতে পারলুম না; বললুম, তোমাদের জন্মাবার আঠারো-বিশ বছর আগে আমি জন্মেছি। সেই আঠারো-বিশ বছরে অনেক কিছু পৃথিবীতে ঘটেছে, সে তোমরা জান না। মনে কর, এমন একটা ঘটনা ঘটেছে, যা তোমরা বিশ্বাস করতেও পার না—অথচ সেটা সত্যি। সত্যিটা গোপন করলে কি মিথ্যে হয়, না তোমাদের জেরায় সেটা মিথ্যে হয়। আচ্ছা, ব্যাঙ্ককের উড়োজাহাজের ঘাঁটি নিশ্চয়ই তোমরা দেখেছ। বল দেখি, যে রাস্তাটা শহর থেকে এই ঘাঁটিতে এসেছে, সে পথের ডান দিকে লাল রং-এর একটা দোতলা বাড়ি রয়েছে, তার চারপাশেই জল—নয় কি?

মেয়েটা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, হাঁ আছে, তার পর!

—জেলখানাটা পেরিয়ে একেবারে প্লেনের অফিসের কোণায় নেবে—বাঁ-হাতি রাস্তাটা ধরে চলতে চলতে—যে বড় রাস্তাটা পড়ে সেটার নাম—তালাত নৈ কিনা?

মেয়েটি আমার জামার হাতা ছেড়ে দিয়ে বললে, হাঁ। তা হলে তুমি গিয়েছ। ওটাই আমাদের ব্যবসায়ীদের প্রধান কেন্দ্র—কেবল ওটা নয়, ওর চার পাশেও।

—আচ্ছা, জাহাজ-ঘাটার সামনে পার্কের মত যে জায়গাটা আছে, তার কোণায় একটা শরবতের দোকান দেখেছ কি? এবার বিশ্বাস হল? এখন তোমাদের গল্প বল।

—আমাদের গল্প আর কি বলব।

—কেন? তোমাদের স্কুলই তো তোমাদের গল্পের সেরা গল্প, তার পর তোমার বাবা-মায়ের গল্প, তোমাদের ঘরবাড়ির গল্প, আরও কত কি তোমরা বলতে পার; এমন কি তোমাদের ঘরের ভারতীয় চাকর রঙ্গনাথনের কথাও বলতে পার।

—আমাদের স্কুল, সেটা আংলো-ভার্নাকুলার। তবে সব স্কুলই দেশীয় ভাষার। আমাদের মঠের সন্ন্যাসীরা আমাদের দেশে প্রাথমিক পড়ায়। সেখানে শুনেছি, পুতুল দিয়ে খেলনা দিয়ে লেখাপড়া শেখায়। বাড়ি থেকে একটা আসন-বগলে করে ছেলেরা যায় সেখানে, সঙ্গে নেয় খড়-কুটো, ছেঁড়া ন্যাকড়া—এই সব দিয়ে সেখানে লেখাপড়া শেখান হয়। সকালে আর দুপুরে দুবার নাকি তারা পড়ায়।

আমাদের স্কুল কিন্তু দশটা-তিনটে—সকালেও আমরা বাড়িতে পড়তে পাই; রাতেও। বিকেলে খেলবার সময়ও থাকে। ওদের কিন্তু স্কুলে বসেই পড়া তৈরি করে আসতে হয়। ওরা পড়ে সাহিত্য, গণিত আর ধর্মপুস্তক, চার বছরে পড়ায় ইতিহাস। আমরা কিন্তু বিজ্ঞান, ভূগোল—সবই পড়তে পাই। ওদের থেকে অনেক উঁচু মানের পড়া আমাদের।

—স্কুল থেকে এসে তোমরা বিকেলে কি খাও?

—কেন, রোজ যা খাই, সকালে ভাত, মাছের তরকারি, বীন খেয়ে স্কুলে যাই; দুপুরে স্কুল থেকেই দুধ, বিস্কুট দেয়; বিকেলে এসে রুটি, ফল খাই। ডিম আর মাংসের স্টু-ও থাকে।

—তোমার বাবা কি করেন?

—বাবার রয়েছে থাই-লুঙ্গির চালানী ব্যবসায়—সিঙ্গাপুরে, জোহোরে, পেনাংএ রেঙ্গুনে, জাকার্তায় আমাদের অফিস রয়েছে, দোকান রয়েছে। বাবা তো সারা বছর বাইরেই থাকেন। এবারই আমরা কাঁদাকাটি করায় সিঙ্গাপুর এনেছেন; এখানে আমাদের রেখে, কালপরশু জাকার্তায় যাবেন।

—বাড়িতে কে কে আছেন?

—মা আর আমার দু ভাইবোন। লুয়াক আমাদের ম্যানেজার, সে রোজ হিসেব দিয়ে যায়; মাকে টাকা-পয়সা বুঝিয়ে দিয়ে যায়।

মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলুম, তোমার বিয়ে হয়ে গেছে কি?

—বিয়ে! হেসেই সে অস্থির, তার পর বললে, অবশ্য আমার বয়সে অনেকেরই বিয়ে হয়ে থাকে, কিন্তু উনিশ বছর বয়সে কে কবে বিয়ে করেছে বল দেখি? বিয়ে করলেই তো ছেলেমেয়ে নিয়ে হাঙ্গামা। তার চেয়ে ক্লাবে যাচ্ছি, নাচছি, খেলছি, বন্ধুও আছে অনেক—পুরুষ-বন্ধুও কম নয়। তারা কানে কানে প্রেমের কথা বলে, শুনতে বেশ লাগে। সবাইকে আশা দেই, কিন্তু বিয়ে করবার ইচ্ছে আমার নেই।

আমি ভেতো বাঙালী। ঘোমটা-টানা বউ নিয়ে কারবার। সারাদিন খাটুনির পর বউয়ের সঙ্গে কথা কইবারই অবসর থাকে না, কানে কানে প্রেম-কথা তো দূরের কথা। তাই তার কথা শুনে ঝিমিয়ে পড়লুম, আশ্চর্য হই নি। যতগুলো প্রাচ্য দেশ দেখেছি তার ভিতর বর্মার স্ত্রী-স্বাধীনতা অগ্রগণ্য। সেই দেশটা দেখবার পর আর আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না। আমি বললুম, আবার বিকেলে এস। এখন স্নান করে খেতে যাব।

—এখন স্নান, এই বেলা বারোটায়! আমরা সেই কোন্ সকালে নেয়েছি! তোমাদের দেশে সবই অদ্ভুত!

আমাদের দেশ সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না অথচ মন্তব্য করলে। আমিও মন্তব্যটুকু উপভোগ করলাম।

ওদের নাম দুটো ভালো লেগেছিল। ছেলেটির নাম তৈয়চি—বোধহয় শচী হবে, আর মেয়েটার নাম চোনাদা—বোধহয় চন্দ্রা; ভারতীয় নামের অপভ্রংশ; বলেই মনে হল। শ্যামদেশের নামগুলো ভারতীয় ভাষার অপভ্রংশ; এমন কি সাধারণ ভাষায়ও মনে হয়, শতকরা পাঁচভাগ ভারতীয় ভাষা রয়েছে। পালিকে শ্যামীয় ভাষার প্রসূতি বলা চলে। লেখা হরফও ব্রাহ্মী ধরনের—যেমনটা তেলুগু ধরনের হরফ বর্মায়। বর্মীভাষার এক-দশমাংশ ভারতীয় ভাষার অপভ্রংশ।

প্রাচ্যে জাপানের পরই ইংরেজ আর ইয়াংকীদের বড় আস্তানা। ইন্দোচীনে ফরাসী ঘাঁটির অন্তিমকাল উপস্থিত হয়েছে। আর শ্যাম আর জাপানের ভাগাড়ে মৃতের মাংসলোলুপ পক্ষীবিশেষের মত ইংরেজ আর ইয়াংকী ঘাঁটি গড়েছে। মামার গাছের কাঁঠাল, মামার মাথায় ভেঙে খেয়ে, আঠা মুছে, দিব্যি পিতার শ্যালকদের ওরা ঢুপা তুলে আশীর্বাদ করছে।

শ্যামদেশের কথা বলবার ইচ্ছে ছিল, তা বারান্তরে লিখব। এবার সিঙ্গাপুর প্রসঙ্গ শেষ করে বর্তমান পত্রের যবনিকা টানব।

সন্ধ্যে বেলায় তৈয়চি আর চোনাদা এল না দেখে আমি লুঙ্গী পরে রাস্তায় বের হলুম।

দোকানপাট গমগম করছে। সাইনবোর্ডে ইংরেজী আর আরবীয় ধরনের হরফে দোকানের নাম ও পণ্য-ব্যবস্থা লেখা রয়েছে। মালয় সিঙ্গাপুরে আরবী অক্ষরে সে দেশের ভাষা লেখা হয়। অনেক কষ্টে 'আলেফ-বে-পে' করে দু-একটা সাইনবোর্ড পড়বার চেষ্টাও করলুম। সফল হয়েছি বলে মনে হয় না। বিজলী-বাতি, মোটরের আলো আর দোকানের ঝলমলানি সত্যই নয়নানন্দকর।

সমুদ্রের বাতাসও লুটিয়ে পড়ছে এদিক-ওদিক। মন্দ নয়!

ঘুরতে ঘুরতে একটা গলির সামনে এলুম। একটা দোকানের সামনে বড়ই ভিড়। একপাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। সাইনবোর্ডটার দিকে নজর পড়তেই উৎসুক হয়ে দেখতে থাকি।

"Country liquor shop."

ক্রেতা সবাই তেলিঙ্গা বললে অত্যুক্তি হয় না। মদের বোতল ধরে রাস্তায় দাঁড়িয়েই ঢকঢক করে গলায় ঢেলে দিচ্ছে। বোতলগুলো রাস্তায় যাচ্ছে গড়াগড়ি। যেন টালার ট্যাঙ্ক খুলে দেওয়া হয়েছে, আদিম অসভ্য মানুষগুলো পকেটের কড়ি ছুড়ে দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে চোঁ চোঁ শব্দে পান করে চলেছে। কতকগুলো মেয়ে ছোলাসেদ্ধ, ফুলুরি-পেঁয়াজী নিয়ে দোকান সাজিয়ে বসেছে। তারই পাশে বসে স্থান-অস্থানে হাত বুলিয়ে নোংরা পুরুষগুলো কারণ সেবন করছে, উচ্চনাদে নিজেদের মহিমাও কীর্তন করছে—ভাষা অবোধ্য হলেও শ্লীল নয়, একথা জোর করেই বলতে পারি।

শাজাহান বাদশাহ্ লিখে গেছেন, পৃথিবীতে কোথাও স্বর্গ থাকলে তা এখানে।

আমি ভাবলুম, কেউ যদি এখানে লিখে দেয়—পৃথিবীতে কোথাও নরক থাকলে তা এখানে, তা এখানে।

ভারতীয়দের এই নির্লজ্জ বীভৎসকাণ্ড দেখে মরমে যেন মরে গেলুম। বর্মাতেও সুব্রহ্মণিয় বলেছিল, I don't believe in prohibition. গান্ধীজী যদি তাঁর প্রিয় ভারতবাসীদের এই অবস্থায় দেখতেন, তিনি বলিতেন—It is better to die than to look at this. ভাগ্যি গান্ধী মহারাজ শহীদ হয়েছেন, না হয়তো আফিং তাঁর না খেয়ে উপায় থাকত না।

একটা গাছের তলায় দিব্যি জুয়ায় বসে গেছে কজন।

অবশ্য জুয়া আইনে দোষণীয় নয়! শুধু রকম-ফেরে দোষণীয়। ঘোড়দৌড়, লটারী, এগুলো ভদ্র জুয়া আর আইনসম্মত। তবে তাজঝাণ্ডা নিয়েই গণ্ডগোল। এরাও আইন মোতাবেক সব করেই রাখে। থানার পুলিস অফিসার থেকে চুনোপুঁটি পর্যন্ত সবাইকে ভাগ দেবার বন্দোবস্ত থাকে বলেই জুয়া আইনী কাজ।

দাঁড়িয়ে দেখবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু পরাজিত কোন পক্ষ বিতণ্ডা শুরু করাতে একটু দূরে দাঁড়ালুম। তারপর যা হয়। মদের বোতলের পেটাপেটি।

ফিরে এলুম হোটেলে।

একটা ওয়েটারনী জিজ্ঞেস করল, খাবার দেবে কি না?

আমি আনতে বললুম।

দুটো চীনা যুবতী খাবার নিয়ে হাজির হল।

একজনের হাতে বাটি আর মাছের কারি। অন্য জনের হাতে সুপ আর রুটি। মিশ্রিত আহার্য। তারপর এল ভাজাভুজি—অনেক কিছু, তার নাম জানি না।

•

একজন জিজ্ঞেস করলে— Any drink ?

—Excuse me, thank you.

খাবার পর থালাবাটি ওঠাতে ওঠাতে বললে—Any attendant ?

—Of course not—

—Yet...

—Excuse me, please.

মশারি টাঙিয়ে শুয়েছি মাত্র, এমন সময় কড়া নাড়ানাড়ি।

দরজা খুললুম। সেই চীনা মেয়েটা।

—Excuse me—I have a talk.

তাকে চেয়ার টেনে বসতে দিলুম।

—এখানে যারা আসে, তাদেরই পরিচর্যাকারিণী দরকার হয়, সেই জন্যই লোকে এখানে আসে। তোমার কি সত্যই দরকার নেই ?

আমি জবাব দেবার ভাষা খুঁজে পেলুম না। আমায় নির্বাক দেখে সে বললে, কৈ জবাব দিচ্ছ না কেন ?

—আমি যদি বলি দরকার আছে, তা হলে কি হয় ?

—তা হলে আজ কিছু উপার্জন করতে পারি।

—কে ? তুমি ?

—হ্যাঁ।

—আর যদি বলি দরকার নেই, তা হলে কি হয় ?

—বিশেষ কিছু নয়, এ ঘরটা আমার জিম্মায়, সেজন্য তোমার বদলে অন্য অতিথি দেখতে হবে।

কি বেহায়ার মত উক্তি! আমি ধৈর্য ধরে বললুম, দশটা বছর আগে এ কথার মূল্য আমার কাছে ছিল কিন্তু আজ বড়ই অসময়।

সে আমার কথা বুঝল না।

আমি বললুম, আমি তোমাদের দেশে গিয়েছিলুম। সেখানে আমার এক বন্ধু বলেছিল, বাইরের চীনারা ঘরেরও নয়, বাইরেরও নয়। আজ দেখছি সে সত্য কথাই বলেছে। তুমি তোমার দেশে ফিরে যাও না কেন ? এই পাপ-

ব্যবসায় আজ আর তোমাদের দেশে নেই। মেয়েদের ইজ্জত সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আমার কথায় সে যেন মুহ্যমান হয়ে গেল। আজ অবধি এমন কথা হয়তো তাকে কেউ বলে নি, তবুও শেষ শক্তি সংগ্রহ করে বললে, আমরা যা করি, তা শুধু পেটের দায়ে—নয়তো—

—নয়তো কী?

—নয়তো এ জীবনে ঘৃণা ধরে গেছে। ত্রিশ বছর বয়সে, রুগ্ন দেহ আর মন নিয়ে গালে রঙ মেখে ছুঁড়ি সাজতে কি এমনি শখ হয়? যাক, মার্জনা করবে। আমার যা বলবার তাই বলেছি মাত্র।

—দাঁড়াও! বলে তার হাতে এক স্টার্লিং-এর একটা নোট দিয়ে বললুম, যাই হোক, তোমায় রোজ একটা করে টাকা দেব, যে কয়দিন থাকব সে কয়দিন আমায় বিরক্ত কর না, আর তাড়িয়ে দেবার চেষ্টাও কর না। উপার্জন একটু কম হল, তাই বলে অভিসম্পাত দিও না। চীনের মেয়ে হয়ে যখন ইংরেজের রাজ্যে বাস করছ, তখন তোমাদের নীতিগত দুর্বলতা না আসাই আশ্চর্য। চিয়াং-এর চীনে এমনি দৈন্য ছিল সেদিনও।

সে টাকাও নিল না, উঠলও না।

সে বলতে থাকে তার অভিশপ্ত জীবনের কাহিনী, কেমন করে জাপানীরা তার স্বামীকে হত্যা করে এই নরকে টেনে এনেছে—আরও কত কি। জাতিতে সে চীনা হলেও, তার তিনপুরুষে কখনও চীন দেখে নি—তবুও চীনকে সে ভালো-বাসে। আজকে সত্যিই তার ধিক্কার এসেছে।

পরদিন থেকে তাকে আর দেখি নি; অন্য ওয়েটার এসেছে। সে মালয়ী একটি বালক। আমি নিশ্চিন্ত হলুম। খুশী হলুম সেই জাতটার উপর, যারা সামান্য কথায় নিজেদের পথ দেখতে পায়।

এমনি করে গড়াতে গড়াতে দিন যায়। কোন দিন সেই থাই কিশোর-কিশোরী এসে গল্প করত, কোন দিন আসত তাদের মা।

সেদিন দুপুরবেলায় এক গুজরাটীর দোকানে গেলুম, সে বললে, ভারতে যদি সাগু নিয়ে যেতে পার, তাহলে খুব লাভ। কদিন বাজার ঘুরে সব সংবাদও সংগ্রহ করলুম। শেষ পর্যন্ত সে চেষ্টা ত্যাগ করতে হল। খোঁজ নিয়ে জানলুম, সাগু বলে যে পদার্থ আমাদের দেশে আসে, তার শতকরা পঞ্চাশ ভাগই ভেজাল।

যবের গুঁড়ো এমনভাবে মেশিনে দানা বেঁধে দেয়, তা সাগু বলে বাজারে চলতে মোটেই দেরী হয় না। নইলে সেগুলো টেপিয়'কো দানা যা বাজারে সাগু বলে চালু রয়েছে অনেক কাল ধরে। শখ করে নিজের দেশের জন্য ভেজাল কিনবার ইচ্ছে ছিল না।

কদিন থেকেই ঘুরছি অলিতে-গলিতে, চায়ের দোকানে, ছোট ছোট হোটেলে. কোথাও যদি খবর পাই এদেশের প্রকৃত রাজনৈতিক অবস্থার। কিন্তু বিফল হলুম সর্বত্র। বেশির ভাগ লোকই কুলি-মজুর—তারা বিদেশী—দেশের রাজ-নীতির ধার ধারে না। ধার ধারে স্থায়ী চীনারা আর ভারতীয়রা। কিন্তু তাদের ঠোঁট খোলা শুধু কঠিন নয়, অসম্ভব। আবার যারা খুচরো কথা বলে, তারাও পুলিসের ভয়ে কোন রকম আলোচনাই করে না। অবশ্য তাদের জ্ঞান শোনা কথায়।

যে দুটো উদ্দেশ্য নিয়ে সিঙ্গাপুর এসেছিলুম, তার একটাও সফল হবার কোন সম্ভাবনা নেই দেখে ফিরবার চেষ্টায় রইলুম।

একবার ভেবেছিলাম মালয় দেশটা ঘুরে দেখে যাই। বৃহত্তর ভারতের এই সমৃদ্ধ অঞ্চলকে কি ভাবে শোষণ করছে বিদেশী শাসক, তার নমুনা সংগ্রহই ছিল ইচ্ছা। কিন্তু আমার পক্ষে সিঙ্গাপুরের এলাকা ছেড়ে মালয়ে যাওয়াও নিরাপদ নয়। সিঙ্গাপুরে বসে মালয়কে জানার চেষ্টা মূর্খতাই নয়, অন্যায়ও। এই সামান্য জ্ঞানটুকুর ওপর মালয়ের বর্তমান অবস্থাকে বর্ণনা করা ধৃষ্টতা। তাও হবে মিস্ মেয়োর মত অপরাধজনক পত্র। সেই কারণে ইচ্ছে রয়ে গেল, কোন চোরাই পথে যদি মালয় আসতে পারি, তা হলে মালয়কে জানা যাবে; নয়তো ইংরেজের রক্তচক্ষুর তলায় বসে মালয়ের প্রাণকেন্দ্র খুঁজে বের করা অসম্ভব।

ব্যবসায়ের দিক থেকে সিঙ্গাপুর Free port. আমাদের স্বল্প বিত্তে প্রতিযোগিতার মুখে দাঁড়ানো অসম্ভব। সেই কারণে সিঙ্গাপুরের নোনা জলের হাওয়া খেয়ে প্রত্যহ পনেরো টাকার উপর খরচ করে বড়লোকী করা ধৃষ্টতা, অন্তত দেশের বর্তমান অবস্থায় অপরাধ।

সিঙ্গাপুর শহর অথবা পোতাশ্রয় অথবা শহীদবেদী দেখতে আসি নি, এসেছিলুম নিপীড়িত আর মুক্ত জনতার মনের কথা জানতে আর

সুখে-দুঃখে বৃহত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে নিজেদের আহার্য সংগ্রহ করতে। কোনটাই সফল হয় নি। হবে বলে মনেও হয় না। তবে আমি আশাবাদী। এখনও বিশ্বাস আছে, সুযোগ-সুবিধা এলে তার উপযুক্ত ব্যবহার করতে ত্রুটি করব না।

আবার বর্ষ বিদায়ের পালা। এবার বাংলা বর্ষ নয়, ইংরেজী। এবার তোমার কাছে শুভেচ্ছার সঙ্গে মর্মান্তিক খবর দিচ্ছি যে, আমাকেও ঐ সিঙ্গাপুরী আর বর্মী ভারতীয়দের মতই নিঃস্বতা গ্রাস করেছে।

আগামী দিনের প্রতীক্ষায় রইলুম

রেঙ্গুন
২২ ডিসেম্বর, ১৯৫১

চার

নতুন বছর এসেছে !

তিনশত পঁয়ষট্টি দিন পর এমনি ভাবেই নতুন বছর আসে, আসবেও অনন্তকাল অবধি।

কিন্তু আসবে না নিপীড়িত জনতার মুখে হাসি, আসবে না মানুষের বাঁচার অধিকার, আসবে না অনাগত বিধাতার আগমনী সন্দেশ !

তাই একটা বছর যখন পেরিয়ে যায়, তখন আয়নায় মুখ দেখি একবার। কতটা হ্রাস-বৃদ্ধি হয়েছে দেহের ; আর অন্তরের দর্পণে দেখতে চাই কতটা শক্তি হারিয়েছি এই একটা বছরে। তবুও কেটে গেছে একটা বছর। একটা বছর তো আমাদের একটা যুগ। যদি ম্যাক্‌বেথের মত বলতে পারতুম, 'If it were done, it is done,' তা হলে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারতুম, ভালোই হোক, মন্দই হোক হয়ে গেছে কিছু। কিন্তু কোথায় যেন একটা কাঁটা আটকে আছে, যার জন্য বিশ্বজনীন ভাবে বলছি 'It is not done.' নতুন বল সংগ্রহ করবার শেষ চেষ্টা করছি—কালকের আশায়, সেই পুরাতন "Tomorrow and Tomorrow'. গ্রীক উপকথার প্যাণ্ডোরার বাক্স কে যেন বন্ধ করেই রেখেছে অনাদি কাল থেকে। না—ভালো লাগে না। ভালো লাগে না আশার পেছনে ধাওয়া করতে।

সিঙ্গাপুর থেকে বর্মায় ফেরবার পথে, মনে হয়েছে, প্রভার কথা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। তোমার নিশ্চয়ই ঔৎসুক্য জেগেছে, কি হল ওর ! কিন্তু তার বিষয় চিন্তা করলে নিজের কাছে নিজের মাথাটা হেঁট হয়ে যায়। সেও নিজেকে সামলে নিয়েছিল, তবুও শেষ পর্যন্ত ভারসাম্য রাখতে পারে নি। পারে নি, আমাদের সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয় নি বলে। আমাদের মনের প্রসারতা গেছে কমে, আমাদের ক্ষীণদৃষ্টি প্রগতিকে উপহাস করছে।

শেষে তাকে পেলুম একজন মুসলমান ডাক্তারের স্ত্রী হিসেবে। চলে গেছে অভিশপ্ত ভারতের ভূমি ছেড়ে পবিত্র স্থান পাকিস্তানে। হিন্দুর ছেলেরা এসেছিল তার কাছে ভোগের বেসাতি নিয়ে, অতীত তাকে সাবধান করেছে, সে খুঁজে নিয়েছে সুখের ঘর। এই ভালো, সুখের

হোক তার নতুন ঘর। তার সারা জীবনের ঘর বাঁধার আকাঙ্ক্ষা সর্বাংশে পূর্ণ হোক। সম্পূর্ণ হোক তার জীবনকাব্য।

যারা ঘর বাঁধতে পারে না, তারা সুখী হয় অন্যের সুখের ঘর দেখে। অবশ্য হিংসেও হয় কারুর কারুর, কিন্তু আমার দিক থেকে হিংসে হবার মত কিছু নেই। আমি পৃথিবীর দুটো জাত দেখেছি, নর ও নারী; একের পরিপূর্ণতা অন্যের পরিপূর্ণতাই এনে দেয়।

সুখটা মানুষের একচেটিয়া নয়, বরং তার চ্যুতির ভয় বেশি।

এমন একদিন ছিল, যেদিন সত্যই সুখ-দুঃখের অনুভূতির বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম—হারিয়ে ফেলেছিলুম অনুভূতি। কেন যে এই অবস্থা এসেছিল তা ভেবে দেখি নি, তবে অবস্থাকে মানতে বাধ্য হয়েছি, উপায়হীন হয়ে। সেদিন দুর্ভাগ্যের গৌরব ছিল, বিকাশ ছিল লাঞ্ছনায়।

একত্রিশ সাল যেন ধূমকেতুর মত হাজির হল। যেদিন ঘর ছেড়ে বাইরের টানে বের হলুম, সেদিন বোধহয় অগস্ত্য-যাত্রার দিন ছিল। নয়তো সবল সতেজ দেহমন নিয়ে আজও ঘর বাঁধতে পারছি না কেন?

কলকাতার ফুটপাতে যেন মোহ বেশি! অনাহার আর অর্ধাহার জেনেও আর সয়েও কেন ছিলুম, তাও জানি না। জোর করে কেউ না তাড়ালে ছাড়তে চাই নি এই শহরটা। বাঙলার নালন্দা এই কলকাতা। শিক্ষা, কৃষ্টি, সভ্যতা যা কিছু আছে বাঙালীর, তার বিকাশ-কেন্দ্র এই কলকাতা। নালন্দার মত ঐতিহ্য রয়েছে এর, যদিও ততটা পুরাতন নয়। তাই কলকাতার মাটি ছাড়তে বড়ই মর্মপীড়া হত।

লিখতে বসে অনেক সময়ই অনেক প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে গেছি। বারান্তরে বলব বলে মনে করেছি, সব কথা বলা হয় নি। তাতে চিঠির পরিসর বৃদ্ধি পায়, আর অনেক সময় একঘেয়ে মনে হয়।

কখনও কখনও এমন পথের নেশায় পেয়ে বসত যে, ছুটে চলাটা অভ্যাস হয়ে গেছে। নূতনত্ব কিছু নেই, চলি যেন চলার নেশায়। অনেক সময় দেখা যায় কর্ম-জীবন থেকে বিদায় নিয়েও বিদ্যালয়ের শিক্ষক দুপুর বেলায় ঘরে থাকতে পারেন না, এও তেমনি যাকে বলে—Long-standing practice.

মনে হয়, প্রতিদিনকার খুঁটিনাটি ঘটনা নিয়ে লিখতে বসলে প্রত্যেকটি মানুষের জীবনই এক এইটা বিশ্বকোষে পরিণত হবে। সেই বিশ্বকোষরূপ মানব-জীবনের

একটা দিক রয়েছে, যে দিকটায় সহজে কেউ নজর দেয় না, উপেক্ষিত থেকে যায়। সে হচ্ছে, সূত্রহীন ছুটকো ঘটনা। তোমার সন্তান কি করে বড় হচ্ছে, তার প্রতিদিনকার পঞ্জী তুমি তৈরি কর না, দরকারও হয় না। আমি কিন্তু চেষ্টা করেছি, এই সব ছোট ঘটনা দিয়েই মানুষকে বিচার করতে আর অসমাপ্ত বিশ্ব-কোষ পূর্ণ করতে।

সিংহগড় দুর্গের দরজায় দাঁড়িয়ে আমি শিবাজীকে অথবা তানাজীকে কল্পনায় দেখতে চাই নি। হয়তো কিছু দুর্গের নির্মাণ-কৌশল, ইতিহাস ও দুর্গ তৈরীর সময় জানবার ইচ্ছে হয়েছে, কিন্তু দেখেছি পাহাড়ের তলায় গোয়ালা, আর পাহাড়ের ওপরের প্রমোদ-ভ্রমণকারীদের। দেখেছি তাদের বেশভূষা, চাল-চলন, দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ। গভীর বিস্ময়ে চেয়ে থেকেছি কতকগুলো ঝরনার দিকে, যেগুলোর জন্য দুর্গটি তৈরী সম্ভব হয়েছিল। পাথরের বুক চিরে কি করে এল অত জল, তাই ভেবেছি।

Rest-house-টার গঠন না দেখে, দেখেছি অতীতের কোন ঘরবাড়ি আজো সাক্ষ্য দিতে দাঁড়িয়ে আছে কিনা! এসব থেকে সৃষ্টি করতে চেয়েছি একটা বাস্তব ধারণা—যার বর্ণনা দিলে ফুটে উঠবে আমাদের দেশের প্রকৃত রূপ। আমরা জানি, মাওয়ালীরা পার্বত্য-জাতি, তারা ছিল শিবাজীর সঙ্গী। কিন্তু মারাঠাদের মত মাওয়ালীরাও একই পাহাড়ী দেশের ছেলে, হয়তো বা সবাই একই জাতের—তবুও মারাঠা দেশে মাওয়ালী তাদেরই বলে, যাদের বৃত্তি ভবঘুরেপণা আর লুঠপাট করা। তাই মারাঠীরাও মাওয়ালী, মাওয়ালীরাও মারাঠী; অর্থাৎ ইতিহাস অথবা কাহিনী আর প্রকৃত বাস্তব ক্ষেত্রের ঘটনায় রয়ে যায় অনেক দূরত্ব। সে সমস্যার সমাধান হয় একমাত্র সেইসব দেশে গিয়ে খুঁটিনাটি জিনিসগুলো পর্যালোচনা করলে। তাই আমার চিঠিতে নেই উটকো গালগল্প, নেই রূপকাহিনী।

প্রকৃতিকে আমি ভালোবাসি, তাই প্রকৃতির সৌন্দর্য বলেছি কোথাও, তাও আমার প্রকৃতির দোষে।

পাহাড়ের তলায় গয়লা যখন একসের মিষ্টিবিহীন পেড়া দিতে পারল না, তখন ভেবেছি, আজ সে পাচ আনা উপায়ের মত সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে নি। যতক্ষণ তার ঘরে বসে ছিলুম, ততক্ষণ দেখছিলুম তার ঘর, তার মোষ-গরু আর গৃহস্থালীর অবস্থা। একখানা ঘর—তার মাঝামাঝি জায়গায় মাচাং বাঁধা, নীচে থাকে গরু, ওপরে থাকে সেই গোয়ালা তার পরিবার-পরিজন নিয়ে। গোবর আর গোমূত্রের গন্ধে আমার অন্নপ্রাশনের অন্ন উর্ধ্বমুখী হয়ে উঠছিল। কেমন করে ওরা থাকে, আশ্চর্য!

এইগুলো আমার চিঠির ত্রুটি। আমি যদি বলতুম—আহা, শিবাজী মহারাজ এই দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় করে পৃথিবীতে অক্ষয়কীর্তি স্থাপন করে গেছেন, আর যদি বলতুম, কাফি খাঁর ইতিহাস, স্যার যদুনাথের টিকা-টিপ্পনী, তা হলে শুনতে ভালো লাগত। কিন্তু আমি দেখছি দুটো গর্ভবতী মারাঠা নারী অন্ন-সংস্থানের আশায় কাঁধে ডুলি নিয়ে পাহাড়ের তলা থেকে ওপর পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গ সোয়ারীকে নিয়ে চলেছে। তাই বাস্তবের কশাঘাতে, ভারতের নগ্নমূর্তি আমার কল্পনাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। আমি জানি না, এই খুঁটিনাটি দেখবার কোন প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ লাভ আছে কিনা, কিন্তু মনে হয়, মানুষকে মানুষ হিসেবে ভালোবাসতে হলে এইগুলোরই প্রয়োজন সব চেয়ে বেশি। ন্যাকামি আর নাকে কাঁদুনির কোন দাম নেই। যে বাস্তব সত্যকে উপলব্ধি করে প্রকৃত কর্মকে বেছে নিতে পারা যায় না, তার জন্য দুহাজার পাতার রামায়ণ-মহাভারত লেখা বাতুলতা মাত্র। যেমন আমি চীনে গিয়ে চৈনিক নারীর বিরাটত্ব দেখেছি, তেমনি সিঙ্গাপুরে তাদের দেখেছি দেহ-ব্যবসায়ে আত্মহত্যা করতে। তাই সারা জীবন প্রশ্ন করছি, কেন? তাই নিজের কাছে নিজেকে প্রতারণা করতে পারি নি কোনও সময়। হয়তো বা বাহির থেকে প্রতারিত হয়েছি, কিন্তু প্রতারক অজ্ঞাত থাকে নি।

এমনি করে গড়িয়ে গড়িয়ে বিশ বছর শুধু দেখেছি, জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে রয়েছি, পণ্ডিত যাঁরা তাঁদের কাছে সমাধান খুঁজেছি, আর সেইগুলোকে কেন্দ্র করে অনুভূতি দিয়ে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছি।

তাই নূতন বছরের নূতন খবর—লাঞ্ছিত মানবতার ইতিহাসের শেষ নাই।

কোথায় ইরান আর কোথায় শ্যাম, কোথায় আফগানিস্তান আর কোথায় রামেশ্বর-সেতুবন্ধ—সর্বত্রই শিখেছি, পরাজিত মানুষের অসহ্য জীবন মানুষকে বিপ্লবের পথ টেনে নিয়ে যায়, নিয়ে যায় ভাঙন-গড়নের পথে। মানুষ তার অবস্থাকে অসহ্য মনে করে তার প্রতিকার চায়।

যারা নির্মমতা দিয়ে মানুষকে পঙ্গু করতে চায় তারা ইতিহাসের অভিশাপকে ব্যঙ্গ করতে চায় ক্ষমতার দম্ভে। তারা ভুলে যায় ইতিহাস কখন অন্যায়কারী অত্যাচারীকে মার্জনা করে নি, ইতিহাসে 'ক্ষমা' শব্দ চিরকালের জন্যই অজ্ঞাত রয়ে গেছে। এশিয়ার এই বিরাট অংশের যে পরাজিত মানুষের বুকের দেবতা ডুকরে কেঁদে উঠছে সে শুধু সান্ত্বনা খুঁজে পাবে বিক্ষোভ আর বিপ্লবের মাঝ দিয়ে।

সেদিন আর দূরে নয়। সুদিনের ইঙ্গিত দিগন্তে দেখা গেছে। বাহ্যত প্রতিকারহীন অবস্থাকে জয় করবার আকাঙ্ক্ষা আজ বিশ্বজনীন।

এবার বর্মায় গিয়ে ঘর গোছাচ্ছি; কিন্তু কোথায় কে যেন আমার মনে আঘাত দিচ্ছে, ভাবছি শুধু পরাজয় বিনা আর কিছু কি ছিল না আমার প্রাপ্য! তাই মনটা বিদ্রোহ করতে চায়—মন চায় দুরন্ত বেগে পরিসমাপ্তির দিকে ছুটতে। যে ঘর বেঁধেছিলুম কত সোহাগে—তাকেই নিজের হাতে ভাঙতে হয়।

পুরাতন সংবাদপত্রের পাতা উলটে চলেছি। হঠাৎ চোখে পড়ল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের অশান্তির কথা। কাগজখানা ভাজ করে রেখে ভাবছিলাম। কঠোর পার্বত্য এলাকার কঠোরতম মানুষের কথা ভাবতে ভাবতে বেমনা হয়ে গিয়েছিলাম।

আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাক-আফগান বিরোধ জমে উঠেছে, কোরিয়ার লড়াই থেমেও থামছে না, কাশ্মীরের ঘটনা লজ্জিত করে তুলছে। আরও কত কি! কিন্তু প্যান্-ইসলামের দোহাই দিলেও, পাশাপাশি দুটো মুসলিম রাষ্ট্রে এত মন কষাকষি কেন? আমরা যদি কেতাবী কথায় পররাষ্ট্রের জগাখিচুড়ি করি, তা হলে বাস্তব ঘটনাকে হারিয়ে ফেলব। তার চেয়ে চল একবার আফগানিস্থানে বেড়াতে যাই। এস, আমরা লাণ্ডিকোটাল থেকে জালালাবাদ আর কাবুলের ভৌগোলিক অবস্থান আর সেখানকার বাসিন্দাদের দেখে আসি, তা হলেই খুঁজে পাব কোথায় কলহের প্রথম বীজ রোপিত রয়েছে। ইতিহাস মানুষের গড়া একটা দৈব ঘটনা নয়। কতকগুলো মানবগোষ্ঠীর যুগ-যুগান্তের কর্ম আর তার ফলাফল নিয়ে তৈরী হয় ইতিহাস। এস, আমরা সেই ইতিহাসকে দেখি।

আফগান আর পাক—এই দুটো দেশের ভিতর রয়েছে ত্রিশ-চল্লিশ মাইল চওড়া আর তিনশো মাইলের উপর লম্বা একটা পার্বত্য রাজ্য—আমি রাজ্য বললেও, সে রাজ্যকে সভ্য জাতিসংঘ স্বীকার করে না। তাই রাজ্যটাকে গ্রাস করবার চেষ্টা আগেও যেমন ইংরেজরা করেছে, তেমনি করছে ইংরেজী স্কুলে-পড়া পাকিস্তানী শাসকশ্রেণী।

প্রকৃতপক্ষে আফগান জাতিরই সমগোত্র ওই রাজ্যের বাসিন্দা। সেইজন্য তাদের পক্ষে আফগান-প্রীতি যেমন সম্ভব, তেমনি আফগানদের পক্ষেও। আবার এই ছোট রাজ্যটিকে বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন আফগানিস্থানের নিরাপত্তার জন্য?

একশত বছরের ওপর এই এলাকার অধিবাসী পাখতুন ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করেছে, বুকের রক্ত দিয়ে পাথরের বুকে শহীদ-স্মৃতি সৃষ্টি করেছে তাদের সত্তা

বজায় রাখতে। এরা আবার ইংরেজদের কাছ থেকে আদায়ও করেছে তাদের প্রাপ্য-অপ্রাপ্য সুদে-আসলে। এদের সাথে কোন দিন পরিচয় ঘটবে তা স্বপ্নেও ভাবি নি, কিন্তু কর্মসূত্রে এবং অন্যান্য যোগাযোগে তাই সম্ভব হয়েছিল।

বান্নুতে এসেই বুঝতে পেরেছিলুম, জীবন এবং মৃত্যু এ দুটোর দূরত্ব দশ-বিশ গজ মাত্র—জীবনের মূল্যটা এখানে পদার্পণ করা মাত্র ঠুনকো হয়ে গেছে।

জীবনকে যদি ঠুনকো ভাবতে না শিখতুম, তা হলে আফগান-পাক-পাখতুন কেন, অনেক কিছুই আমার জীবনে অজ্ঞাত থাকত। আজকে কলম নিয়ে বসে নানা দেশের কথা লিখতে পারতুম না।

কোন জিনিসকেই অকারণ গুরুত্ব দেওয়া আমার মতে কাপুরুষতা। অম্লানবদনে কোন কিছুকে মেনে নেওয়াও অপরাধ। কাপুরুষতা এবং অপরাধের পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিলাম এই ভারত সীমান্তে।

সীমান্ত প্রদেশের সীমান্তে এক-একটি গ্রামকে দুর্গ বললে প্রবঞ্চনা করা হয় না। গ্রামগুলো পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রতি সন্ধ্যার পূর্বে গ্রামের মেয়েপুরুষ সবাইকে গুনে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। অবশ্য এতেই যে গ্রামবাসীরা নিরাপদ একথা বলা অসঙ্গত হবে, সাময়িক সান্ত্বনা মাত্র।

প্রত্যেক গ্রামে থাকে একটা করে মোর্চা। মোর্চাগুলো উঁচু মিনারের মত, যদি বিপদ-আপদ কখনও আসে, তখন সব সম্পদ নিয়ে গ্রামের মেয়েপুরুষেরা ঐ মোর্চার মাথায় নিরাপদ কুঠরিতে আশ্রয় নেয় তারপর চলতে থাকে গুলী! গ্রামের সবার ঘরেই একটা করে বন্দুক রয়েছে, চুপে-চাপে দু-তিনটে বন্দুকও রাখে অনেকেই। এই হল বৃটিশ এলাকার কথা, সে এলাকা বর্ত্তমানে পাকিস্তানের এলাকা।

আর যাদের ভয়ে এই ব্যবস্থা, তারা থাকে পাহাড়ের খোলা মাঠে মাটির ঘরে। কাঠ মাটি পাথর দিয়ে তৈরি করে তাদের দরিদ্র আগার। সামনের শুকনো মাঠের দিকে চেয়ে তাদের বছর কেটে যায়, একটা ক্ষুদকণাও তারা ফলাতে পারে না ঐ পাহাড়ের বুকে। তাদের প্রয়োজন আহার্য। বাহির থেকে আহার্য সংগ্রহ করতে হলে প্রয়োজন অর্থের। তাও নেই বলে তারা হামলা দেয় ইংরেজ এলাকায়, আজকের পাকিস্তানে। এই হল মোটমাট কথা।

প্রকাশের বাবার ছিল P. W. D.-র ঠিকাদারী। অর্থবান ব্যক্তি। বাড়িতে রয়েছে তিনখানা গাড়ি। সীমান্তের রাস্তা তৈরী আর মেরামত তাঁর কাজ। অর্থও

উপার্জন করেন যেমন, তেমন করেন ব্যয়। প্রকাশ আমার সহকর্মী—লাহোরে একই অফিসে দুজনে কাজ করি, পদমর্যাদায় আমি একটু বড়, আর সে একটু ছোট, অবশ্য সেটা কাগজে-কলমে আর অফিসী ডিসিপ্লিনের খাতিরে। বন্ধুত্বের পরিমাণে আমাদের কোথাও কোন পার্থক্য ছিল বলে আজও মনে করি না। তখন সবে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। তখনও আমায় অর্ধচন্দ্র দেয় নি—তবে সে সময়টা নিকটবর্তী।

তুমি গেলে মামার সঙ্গে মুরী হয়ে শ্রীনগর।

আমি ঘরে তালা লাগাতে বাধ্য হলুম।

সরলার বিয়ে। সরলা প্রকাশের বোন। প্রকাশ বললে, যেতেই হবে। অন্তত লাহোরের বাইরে কিছু দিন থেকে আসতে পারব, এই আশায় ছুটি নিয়ে প্রকাশের সঙ্গে রওনা দিলুম।

মোরমীর্জা তার পৈতৃক বাসস্থান। বান্নু থেকে মোটরে যেতে হয় মীরনশাহের পথে। এই মীরনশাহ পেরোলে কয়েক মাইল বাদে দক্ষিণ আফগানিস্থানের জুরমত এলাকা। এপথে আফগানিস্থানে যাবার কোন বিধিবদ্ধ রাস্তা-ঘাট নেই। শুনেছি এদিকটা ওয়াজিরী এলাকা।

প্রকাশের বোনের বয়স বললে ষোলো বছর। আমাদের দেশে তাকে দেখলে পঁচিশ বছর তো হামেশাই বলবে। স্বাস্থ্য তার অতুলনীয়, গায়ের রঙ গৌরবর্ণ হলেও কমনীয়তা বড় কম, কি যেন একটা পাহাড়ী রুক্ষতা তার চেহারায়।

আমার সাথে প্রকাশ তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। পরিচয়ের প্রাথমিক অবস্থায় দুই হাত দিয়ে আমার ডান হাত খানা চেপে ধরে যখন সে ক'টা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "ভাইসাব, আপকা বহুত মেহেরবানি" তখন মনে হল আমার হাতখানা বোধহয় কোন গমভাঙা দেশী জাঁতার দুটো পাথরের সন্ধিস্থলে আটক পড়েছে। কোন রকমে শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বস্থানে ফিরতে পারলে যেন বাঁচি। কিন্তু দৈহিক রুক্ষতা দিয়ে সরলাকে বিচার করা সঙ্গত নয়, তার মাধুর্য ফুটে উঠেছিল তার সপ্রতিভ সরল ব্যবহারের মাঝ দিয়ে।

বিয়ের আসরে সালোয়ার কামিজ আর ওড়না পরে যখন সে এসে দাঁড়াল তখন প্রকৃতই মনে হচ্ছিল, ঝাঁসীর রানীর মত বুঝি কোনও বীরাঙ্গনা এসে দাঁড়িয়েছে সামনে।

আমাদের দেশের মত ছাঁদনা সেখানে বাঁধা হয় না, হয় না সাতদিন ধরে হাবিজাবি। বৈদিক প্রথায় কন্যাদান আর সপ্তপদগমন বিবাহের প্রধান অঙ্গ। মালা-বদলটা কিন্তু সবার দেশেই রয়েছে। শুধু আমাদের দেশের মত নেই

কতকগুলো মাথামুণ্ডুহীন স্ত্রী-আচার আর অর্থের অপব্যয়। সে দেশেও বিয়ে হয় রাতে, মাদ্রাজী তামিল তেলুগুর মত দিনে বিবাহ সে দেশে হয় না। সর্বত্রই একটা নিপুণতার ছাপ। বিয়ে হল, বাসর বসল, শুরু হল গান, কুলকামিনীরা কেউ কেউ নাচলও। এ দুটোই ও দেশের বিয়ের অংশ। অশ্লীল রসিকতা কিছু ছিল, কিন্তু নাচের মাধুর্য বেশি—ওতে যৌন আবেদন নেই, আছে ভঙ্গিমা আর মুদ্রা, যার স্বাভাবিক গতি সৌন্দর্য সৃষ্টি করে।

খাবার বেলায় একটু উলটো ধরন। আগেই তারা মিষ্টিমণ্ডা খেয়ে তারপর খেতে থাকে পুরী-কোর্মা—আমাদের মত লুচি-মাংস খেয়ে মিষ্টি খাওয়া নয়। ব্যবস্থা মন্দ নয়। মধুরেন সমাপয়েত ওদের ঠিকুজিতে নেই।

প্রকাশের ভগ্নীপতি সুপুরুষ, বয়স তেইশ-চব্বিশ হবে, আফগান সরকারের কর্মচারী। আমরা যেমন মনে করি, চীনদেশের লোকেরা আরশুলা আর ইঁদুর খেয়ে লোপাট করে, তেমনি আমাদের অনেকেরই জানা নেই যে, আফগানিস্থানে বহু হিন্দু রয়েছে, রয়েছে কিছু বৌদ্ধ। চীনারা যেমন আমাদের মতই ভাত, ডাল, মাছ, মাংস খায়, তেমনি আফগানিস্থানেও হিন্দু ধর্মব্যবস্থা আজও রয়েছে। আর এই হিন্দুরা অনেকেই রয়েছেন সরকারী উচ্চপদে। নাম দেখলে সহজে বোঝা যায় না—ওঁরা সত্যিই হিন্দু!

এই আফগানি হিন্দু জামাতার সঙ্গে কন্যা প্রেরণ করে প্রকাশের বাবা একটু অস্থির হয়ে পড়লেন। পরের দিন যতক্ষণ তাদের নিরাপদ পৌঁছসংবাদ না এল ততক্ষণ তিনি ঘর-বাহির করছিলেন।

ফিরনীতে মেয়ে আনতে যাবে কে? দুজনের হুকুমনামা এসেছে। প্রকাশ বললে, চলুন আমরা দুজনেই যাই।

আমি তো লড়াইয়ের ঘোড়া, যুদ্ধের বাজনা শুনবার প্রতীক্ষায় ছিলুম।

লাহোরে যেমন অলিতে গলিতে ঠোঁটে আলতাপরা পাশ্চাত্যভাব-বিলাসী অসংখ্য নারী চোখে পড়ে, সীমান্তপ্রদেশে কিন্তু তা নেই। সীমান্ত ঠিক ভারতীয় এলাকা নয়, ভারতীয় সভ্যতার সংমিশ্রণে আফগানি-এলাকা। তারা কিন্তু নকলনবীশ নয়। প্রসাধনে তাদেরও কৃতিত্ব রয়েছে, কিন্তু তা শুধু মেহেদী-কুমকুম দিয়ে আর পাটীপেড়ে চুল বেঁধে; চোখে সুরমাটানা অবশ্য বাদ যায় না। নখের মাথায় রঙ, ঠোঁটের মাথায় রঙ, গালের ওপর রঙ দিয়ে রঙ-এ রঙাকার করে চিড়িয়াখানার জীববিশেষ হবার প্রলোভনটা ওদেশে কম। সেখানে শহুরে মেয়েদের বোরখার

প্রাচুর্য রয়েছে, কিন্তু গ্রামের মেয়েরা পার্বত্য প্রকৃতির সুস্থ সন্তান। ওড়না ঘুরিয়ে, বেণী ঝুলিয়ে দৌড়ঝাঁপ করে বেড়ানো তাদের পক্ষে নূতন কিছু নয়। দেহে তাদের রয়েছে অফুরন্ত স্বাস্থ্যসম্ভার, চোখে তাদের রয়েছে মোহ, চেহারায় লালিমা।

জাতির গণ্ডী দিয়ে এই প্রকৃতির সন্তানগুলোকে আড়ালে রাখা হয় নি। শহর তো আর দেশের পরিচয় নয়, দেশ আমাদের গ্রাম। গ্রাম্য-জীবনকে তন্ন তন্ন করলে তবেই পাওয়া যায় আমাদের পরিচয়। সীমান্তের ওপর এলাকার গ্রাম হল সমাজজীবনের প্রাণকেন্দ্র, শহর হল সাময়িক ভাগ্যান্বেষীর তাঁবু।

জালালাবাদ রওয়ানা হবার আগের দিন বিকেলে ছোট একটা পার্বত্য নদীর কিনারায় এসে বসেছিলুম। নদী ঠিক নয়, একটা নালা বললেও চলে।

ঝরনার জল পাথরের কোণ বেয়ে কুরান নদীর দিকে ছুটেছে। এই সব ছোট নদীর কিনারায় কিছু কিছু আগাছা হয়, সেই আগাছার আশেপাশে গ্রামের রাখাল ছেলেমেয়ে ছাগল চরিয়ে বেড়াচ্ছিল। নদীর ওপাশের কিনারায় ছিল দু-একটা গ্রাম। অনেকটা পথ এসে সেই নদীর কিনারায় বসলুম। বৈকালিক একটা নিস্তব্ধতা রুক্ষ পাহাড়গুলোর বুকে বিচরণ করছিল।

আমার কাছে ক'টা ছাগল চরাচ্ছিল একটা এগারো-বারো বছরের বালিকা। লাঠি হাতে সে তাড়িয়ে চলছিল; যদিও নোঙরা তার বেশভূষা, তবুও তার সুপুষ্ট দেহে পোশাক মানিয়েছিল বেশ। তাকে আমার পাশে আসতে বললুম, কি খবর, ভালো আছ তো!

আমার আত্মীয়তার ভঙ্গীতে সে ঘাবড়ে গেল, হয়তো তার ইচ্ছে ছিল আমার সঙ্গে কথা বলে, আলাপ জমায়, আমার কথায় সে পিছিয়ে গেল।

আমি ডেকে বললুম, মুন্নী, এদিকে এস, যাচ্ছ কেন?

তবুও সে পেছন হাটে, আমি ভাবলুম থাকগে।

অন্যমনস্ক হয়েছিলুম, চেতনা পেলুম বালিকার কণ্ঠস্বরে, সে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, বললে, এখানে বসে থেক না।

আমি মুখ ফিরিয়ে তাকালুম, সে তার নাকের ফাঁদির মধ্যে কড়ে আঙুল দিয়ে শিক্ষয়িত্রীর ভঙ্গিতে আবার বললে, এখানে থেক না, গাঁয়ে যাও। আমি বললুম, কেন?

—ওহো, তুমি বুঝি নয়া মেহমান! সন্ধ্যের আগে সবাই আমরা গাঁয়ে ফিরে যাই, নয়তো কোথা থেকে আসবে একটা গুলী, উরে বাস্‌রে, তখন কে সামলাবে বল দেখি!

ইতিমধ্যে বছর তেরো-চৌদ্দর একটি ছেলে এসে সেখানে জুটেছে, সে মেয়েটার কথা শেষ হতেই আরম্ভ করলে—সেবার মেহদী খাঁ-টা ওই করেই তো মরল—তাই নারে আরজু ?

আরজু তার বেণী দুলিয়ে মাথা নেড়ে বললে, হঁ্যা ! বাপরে, কি মোটা লাশ ! আমার তো দুদিন ঘুমই হলো না। আতঙ্কে সে যেন শিউরে উঠল।

ছেলেটা আমার দিকে চেয়ে বললে, ঐ পাহাড়টার ওপারে থাকে আফ্রিদি, আর ওয়াজিরী, ওরা আমাদের দুশমন। সন্ধ্যের পর একলা পেলে, দেখবে কেমন ঝুলি ভর্তি করে তোমায় নিয়ে যায়।

আমি হেসে বললুম, তোমরা বাইরে আস কেন ?

—দেখছিস্ আরজু, লোকটা আবার হাসছে, আমাদের কথা ও ভাবছে মিথ্যে। সেদিন মক্তবে মৌলবী সাহেব বললে নারে, যারা অবিশ্বাসী তারা বেহস্তে যেতে পারে না।

আরজু আমার পাশে বসে চুপি চুপি বললে, হাদীর কথা শুনো না। ও নিজেই মিথ্যে কথা বলে, সেদিন একখানা দীনিয়াত এনে বললে, ওর বাবা ওকে দিয়েছে। মৌলবী সাহেব বললে, এর পাতায় তো অন্যের নাম লেখা রয়েছে। তাইতে না মৌলবী সাহেব ওকে বলেছিল মিথ্যাবাদী আর অবিশ্বাসী বেহস্তে যেতে পায় না !

চুপি চুপি বললেও হাদী তার সব কথাই শুনতে পেয়েছিল—সে রেগে গিয়ে বললে, কি ! ও দীনিয়াত আমার বাবার নয় তো তোর বাবার ? হাজার বার ওটা আমার বাবার। মৌলবী বললেই বুঝি হল !

এর মধ্যেই মৌলবীসাহেবের বলার ওপর শ্রদ্ধা কমে গেছে। এর মধ্যে আরজু চটে গেছে। সে চোখ পাকিয়ে বললে, কী, আমার বাবা তুলে তুই কথা বললি, তুই পাকা মিথ্যাবাদী, সেদিন পিয়ার খাঁয়ের মুরগীর ঠ্যাঙ কে ভেঙেছিল ? তুই কি না ? তবে স্বীকার করলি না কেন ?

হাদীও মুখ খিঁচিয়ে বললে, ওটা বুঝি পিয়ারের মুরগী ? আমাদের কাছ থেকে ও আধি নিয়েছে না ?

আমি দেখলুম গতিক খারাপ, অনেক সাধ্যসাধনা করে তাদের ঝগড়া বন্ধ করলুম। আরজু আমায় কিছুটা স্বপক্ষে পেয়ে বললে, এস তুমি আমার সঙ্গে, কাল সকালে আমার সঙ্গে এলে তোমায় আঙুরের ক্ষেতে নিয়ে যাব। কিন্তু ঐ হাদীটার কথা তুমি একটুও শুনো না।—চল হাদী, ছাগল ফেরা।

হাদী মুখ দিয়ে উটটা—উটটা শব্দ করতে করতে ছাগলের মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা লাঠি দিয়ে ছাগল তাড়াচ্ছে আর গল্প করছে। এর মধ্যে সামান্য পূর্বের কলহটা তারা বেমালুম ভুলে যায়!

ওদের সব কথা বুঝতে পারছিলুম না। ঐ কথার মাঝখানে ওদের মান-অভিমানও চলছিল। আমার বিশ্বাস ছিল, আমি খুব ভাল হিন্দী আর উর্দু বলতে, লিখতে আর পড়তে পারি। কিন্তু ওদের কথা বুঝতে না পেরে সে ভুল আমার ভেঙে গেল। জিজ্ঞাসা করলুম, তোমরা কি ভাষায় কথা কইছ?

—কেন, উর্দু!

—কিন্তু তোমাদের কথা তো আমি বুঝতে পারছি না, তোমরা বোধহয় পুস্তু বলছ!

—না, গো না, বলে মেয়েটা মুখ ঘুরিয়ে বললে, আমরা কি আফ্রিদি না মাস্থদ যে পুস্তু বলব? আমরা উর্দু বলছি, তবে গেঁয়ো উর্দু।

—তা হলে ভালো করে বল যাতে আমিও বুঝতে পারি।

—ভালো করে বলা যায় না, লেখা যায়। এবার উত্তর দেয় ছেলেটা।

হঠাৎ উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার কোন গেঁয়োলোক যদি চট্টগ্রামের কক্সবাজার এলাকায় হাজির হয়, তারও যেমন দুরবস্থা হবে, আমারও তেমনি হয়েছিল! প্রতি দশ-পনেরো মাইল অন্তর কথ্যভাষার পরিবর্তন হবেই হবে, আর যদি মাঝখানে থাকে নদী—তা হলে তো অবাক কাণ্ড। নদীর এপার-ওপারের ভাষার পার্থক্যে যেন খিঁচুনী থাকে বেশি।

আমি চেষ্টা করতে থাকি ওদের কথা বুঝতে। ওরা বলছিল, কোন্ ছাগলটা কত দুধ দেয়, গাঁয়ের কার ছাগলের দুধ সবচেয়ে বেশি হয়। কোন্ ভেড়াটা ওদের বিক্রি করবে বাজারে, কোন্‌টাকে জবেহ্ করে পেটে পুরবে, এই সব।

চলতে চলতে লাঠির আগা দিয়ে ছোট ছোট নুড়িগুলি ছুঁড়ছিল। অনেকটা ডাংগুলীর মত করে খেলবার ভঙ্গীতে নুড়ি একজন ছোঁড়ামাত্র অপরজন দৌড়ে গিয়ে সেটা নিয়ে আসছিল। আবার চকচকে পাথর কুড়িয়ে পকেটে রেখে একে অন্যের সওদা নিয়ে কাড়াকাড়িও করছিল। একজন পেছনে পড়ে গেলে অপরজন তার ছাগলভেড়াও সামলাচ্ছিল, কখনও বা তার জন্য অপেক্ষাও করছিল। এই দৌড়া-দৌড়িতে ওদের কষ্ট নেই—এমনই অভ্যাস, তবে সবার পায়ে জুতো, সে কাঁচা চামড়ারই হোক আর পাকা।

পাহাড়ী দেশে জুতোর চলন বেশি। মারাঠা মেয়ে-পুরুষ তো চপ্পল না হলে চলতেই পারে না।

সেদিন সেই কচি কিশোর দুটোকে কিশোর মনে করতে পারি নি। তাদের চেহারায় যৌবনের জোয়ার এসে গেছে। আকারে, আমায় তোমায় ওদের সঙ্গে বদল দেওয়া যায়। তাদের দেহের পরিমাপ দেখে বয়স বলবার উপায় নেই! ঐ পাহাড়ের কোলে উচ্চ গৌরবর্ণ, স্বাস্থ্যবান, আয়ত-চক্ষু, উন্নতনাসা স্ত্রী-পুরুষের সৃষ্টি হয়—যাদের তুলনায় আমরা বামনমাত্র।

পাহাড়ের বুকে শীত বেশি। কাশ্মীরের মত আগুনের হাঁড়ি পেটের সঙ্গে বেঁধে চলা অভ্যাস অনেকেরই। উত্তর ভারতীয় শীতে শুষ্কতা বেশি—আমাদের দেশে রয়েছে আর্দ্রতা। ব্যারোমিটারে দু দেশে পঁয়ষট্টি ডিগ্রী তাপ হলে—ওদের দেশে দরকার হয় দুখানা কম্বল—আর আমাদের দেশে দরকার হয় একখানা।

আমি শুধু প্রকাশের অতিথি নই—সারা গাঁয়ের অতিথি, নেমতন্ন খেতে খেতে হাঁপিয়ে উঠলাম। গাঁয়ের চল্লিশ-বেয়াল্লিশ ঘর বাসিন্দার মাত্র চারঘর হিন্দু—দুঘর শিখ আর বাকিটা মুসলমান। সবারই মাটির আর পাথরের বাড়ি, সামনের আঙিনায় তারা গ্রীষ্মে খাটিয়া পেতে দিন কাটায়—শীতকালে যায় ছাউনীর ভেতর।

নেমতন্ন করল শেখ সাহেব। অতিশয় বিনয়সহকারে জানাল, তার গরীবখানায় সামান্য নাস্তাপানির বন্দোবস্ত করেছে আল্লার মর্জিতে, সেখানে যেন মেহেরবানী করে অবশ্যই যাই।

সবারই প্রায় একখানা ঘর। বাড়তি রয়েছে কারুর ছাগলের খোঁয়াড়। অবশ্য ধনবানদের ধনের উপযোগী গৃহ ও উপকরণও রয়েছে।

সন্ধ্যেয় আমি আর প্রকাশ হাজির হলুম শেখ সাহেবের গরীবখানায়। মোর্চার পাশে পাথরের পাকাবাড়ি। জানালাহীন হলেও, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মেঝেতে গালিচা পাতা, তার ওপর রয়েছে আহার্য সামগ্রী। আমি তো পরিমাণ দেখেই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলুম।

প্রকাশ বললে, যা খাবার খাও—নষ্ট হবে না কিছুই।

শেখ সাহেব গামলাগুলো এগিয়ে দেয় আর বলে, এইটে জর্দা, এইটে কোর্মা, এটা ফিরনী, এটা বিরিয়ানী—আরও কত কি! শুধু স্বাদ গ্রহণ করতেই পেট ভর্তি, নিরাপদে খাবার উপায় আছে কি।

শেখ সাহেব আপসোস করতে থাকেন, তাঁর প্রথমা বিবির এন্তেকাল না হলে আমাদের খাবার কোনই কষ্ট হত না। তার মত রসুই-করিয়ে মেয়ে সারা বারামুলা জেলাতেও পাওয়া দুষ্কর।

শুধু শেখ সাহেব নন, বিগতা স্ত্রীর গুণকাহিনী অনেকের মুখেই শুনেছি। এমন লোক দেখেছি, যে সারাজীবনে কোন দিন স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে নি, সেও বিগতা সেই স্ত্রীর গুণপনা বলতে উথলে ওঠে। এর কারণ হতে পারে দুটো, প্রথম জীবনের নারী-সাহচর্য যত আনন্দের—তত আনন্দের নয় পরবর্তী জীবনের, তাই তার স্মৃতি ভোলা যায় না; আর, Man wars not with the dead. আমার কাছে কোন সহানুভূতিসূচক উত্তর না পেলেও সে ক্ষতিটা পূরণ করল প্রকাশ, সত্যি বাবুজী, আমাদের সে চাচী যে ছিল, ওঃ, তা বলবার নয়। গ্রামের ছেলেমেয়েরা সবাই যেন ছিল তার নিজের ছেলে। সন্ধ্যেবেলায় কাজ ছিল তার ঘরে ঘরে খবর নেওয়া, কে কেমন রয়েছে।

আমি নীরবে আহারকার্য সমাধা করছিলুম; প্রকাশ ইংরেজীতে বললে, আপনি কিছু বলুন, তা হলে আবার নেমতন্ন পাওয়া যাবে। বুড়ো তার বিশ বছর আগের বিগতা স্ত্রীর কথা যার মুখে শোনে, তার মুখমিষ্টি না করিয়ে ছাড়ে না।

শেখ সাহেবের দ্বিতীয়া স্ত্রী এলেন, বয়সে শেখ সাহেবের কন্যার তুল্য। পড়ন্ত জীবনে উঠন্ত যৌবনের এ দীপ্তি সহ্য করবার মত সামর্থ্য শেখ সাহেবের ছিল বলে মনে হল না। একখানা তীক্ষ্ণধার অসি যেন বিদ্যুৎ প্রভায় ঝলকে উঠল চোখের সামনে। নয়নযুগল বিস্ফারিত করে একবার তার রূপ ও যৌবনের চমৎকারিত্ব দেখে নিলুম, বিস্ময়ে বাক্‌হীন হয়ে বসতে বাধ্য হলুম ঐ তীক্ষ্ণ অসির সম্মুখে। যাই হোক, হাত জোড় করে গেঁয়ো উর্দুতে আমাদের শুক্‌রিয়া আদায় করল। আবার যদি কখনও আসি, তখন যেন তার ঘরে তশরীফ্ নিয়ে তার খেদমত গ্রহণ করি, এইসব কথায় আমাদের আপ্যায়িত করল।

আমরা এসে জলের চৌবাচ্চার কাছে বসলুম। পাথরের একটা ফাটল দিয়ে সরু ধারায় জল এসে চৌবাচ্চাটা ভর্তি করছে; সেই জল নিয়ে যায় সবাই, তাতেই চলে গৃহস্থালী। চৌবাচ্চার উপরি জল বেরিয়ে যাবার একটা নালাও রয়েছে। টালিগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির জলের কলের মত তার অবস্থা। টিমটিমে জলের ধারা।

যে নালাটা দিয়ে জল বেরিয়ে যায় তার পাশে ছোট ছোট বাগান করেছে অনেকেই—টম্যাটো আর সালাদ জাতীয় শাক লাগিয়েছে কেউ কেউ, ঢ্যাঁড়স গাছটা একটু যেন বেশি। গ্রাম থেকে কিছু নীচে রয়েছে একটা মালভূমি, প্রায় পাঁচশো বিঘে হবে তার মাপ, কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু পাঁচটা গ্রামের নালার জল আর ঐ ছোট নদীর জল এসে পড়েছে ঐ মালভূমিটায়, তাতেই ওরা লাগায় ভুট্টা, যব, কিছু গম। যা উৎপন্ন হয় তাই দিয়েই চলে যায় প্রায় সারা বছরের খরচ, অল্প কিছু

বাকী পড়লে, তা পূরণ করে আঙুর, ন্যাসপাতি আর আনার দিয়ে। বাকিটা পাঠায় আমাদের দেশে কিশমিশ মনক্কা করে।

পরের দিন রওনা হলাম জালালাবাদের পথে।

গাড়িখানা বড়, সেজন্য আমরা পাঁচজন ছাড়া আরও দুজনের নিরাপদে চলবার স্থান তাতে থেকেই গেছে। সামনে ড্রাইভার, তার পাশে দুটো রাইফেল নিয়ে মোরমীর্জার দুজন মুসলমান চাষী, প্রকাশদের বড়ই বিশ্বস্ত লোক। আমি আর প্রকাশ পেছনের সীটে।

গাড়ির গতি কম, পাহাড়ী চড়াই-উতরাই ভাঙতে অনেক জায়গায় বেশ ধীরেই চলছিল। রাস্তাও সব জায়গায় সমান নয়, কোথাও কোথাও জখম রয়েছে। চলবার প্রারম্ভে আমরা প্রোগ্রাম করেছিলুম মোটরে কোহাট হয়ে পেশোয়ার, সেখান থেকে লাণ্ডিকোটালে আমাদের গাড়ি ছেড়ে ওপারে গিয়ে গুলজারের মোটরে আমরা জালালাবাদ যাব। এতটা রাস্তা মুখ বুঁজে তো চলা যায় না! প্রথম জীবনে উত্তেজনা ছিল, জানবার ইচ্ছে ছিল অদম্য—সেজন্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রকাশকে জিজ্ঞেস করতে থাকি ওদের সব রকম কথা। বিদ্যালয়ে যদি ভূগোলটা ভালো করে পড়তে পারতুম, তা হলে অনেক কথাই না জিজ্ঞেস করলে হত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে লংম্যানের ইংরেজ ভূগোলের চেহারা দেখে পত্রপাঠ বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছিলুম বলে পৃথিবী সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞতাই সেদিন ছিল।

ভূগোলের কথাই বা বলে কি লাভ। ইতিহাসেও ঐজন্য বিকৃত জ্ঞানলাভ করেছি। সেটাও পড়ি নি প্রয়োজনমত। সবুক্তগীনের পুত্র সুলতান মামুদ পর্যন্ত বিদ্যা ছিল, হয়তো অষ্টম হেনরী থেকে ষষ্ঠ জর্জের পৈতৃক বংশনামা বলতে পারতুম, কিন্তু সেকেন্দর লোদীর বাবার নাম বলতে গলদঘর্ম হতে হত। শিক্ষা-প্রণালীর ত্রুটিতে অতি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোও ভীতিপ্রদ ছিল সে সময়। আবার দেবভাষার জ্ঞানও অনেকের আবার ভূগোলের জ্ঞানের মতই ছিল। শুনেছি কোন কলেজে একজন ইংরেজ পরিদর্শক ছাত্রদের গীতার কথা জিজ্ঞেস করায় সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকে। ইংরেজ পরিদর্শক হতাশভাবে জিজ্ঞেস করলেন, তা হলে তোমরা তোমাদের ধর্মশাস্ত্র কেউ পড় নি?

ছাত্রদেরও তো ইজ্জতজ্ঞান আছে, হঠাৎ একজন দাঁড়িয়ে বললে, আমি পড়েছি।

পরিদর্শক বললে, বল দেখি কি পড়েছ।

বিনা দ্বিধায় ছাত্রটি বলতে থাকে, 'অস্তি গোদাবরী তীরে বৃহৎ শাল্মলী তরু—।' সাহেবের বিদ্যাও ঐ পর্যন্ত—তিনি বললেন, Only one boy is religious -minded.

শিক্ষা ব্যবস্থায় ও শিক্ষাদান প্রণালীতে এমন বিভ্রাট সে সময় প্রায়ই ঘটত। আইনের শ্রেণীতে পড়তে গিয়ে অধ্যাপক ছুদিন ধরে Juris means পড়িয়ে আমাদের আইনজ্ঞও করে থাকেন। Comitia Curiata ব্যবহারিক জীবনে যেন কত দরকার! আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে যেগুলো অতি প্রয়োজনীয় সেগুলো বাল্যকাল থেকে জুজুর বাড়ি পাঠিয়ে আমাদের দেওয়া হত কাষ্ঠচর্বণ করতে, দাঁত ভেঙে মাড়ি কেটে রক্তারক্তি হত অনবরত। ক্যাঙ্গারু যে একটা জন্তু, সেটাও জানতুম না পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত। এই ছিল সেদিন আমার বাহির-জগতের জ্ঞান।

প্রকাশ ধীরে ধীরে বলতে থাকে তার দেশের কথা, বলতে থাকে ওপারের পাঠানদের কথা, বলতে থাকে তার জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতার কথা।

—ভয় শুধু পাঠানদের। ওদের নিশানা কখনও ব্যর্থ হয় না। রাতের অন্ধকারে বন্দুকের নলে আগুন দেখে এমনি তাক করতে পারে ওরা, যে ওদের গুলী বুকে এসে লাগবেই লাগবে। যেমন ওরা হিংস্র তেমনি ওরা একগুঁয়ে।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, ওদের বশ করবার মত কেউ কি নেই?

—আছে। কিন্তু যাদের কথায় ওরা ওঠাবসা করে তারাই ওদের লুটপাট করবার হুকুম দেয়। এই এলাকাগুলো জির্গায় ভাগ করা রয়েছে, জির্গাদার বছর বছর ঘুষ নেয় বৃটিশদের কাছে থেকে; তবুও যদি কোন সময় ওদের পয়সার কমতি হয়, অমনি পাঠায় তাদের অনুচরদের হামলা দিতে। এ ঘটনা তো হামেশাই হচ্ছে। ইংরেজ জাত মনে করে পয়সা দিয়েই বুঝি দুনিয়াটা কেনা যায়। আমরা এখন চলেছি বৃটিশ এলাকা দিয়ে, রাস্তার মাঝে মাঝে পুলিসের ঘাঁটি রয়েছে তবুও আমরা নিরাপদ নই, কখন কোথা থেকে গুলী আসে তার ঠিক নেই। ওদের যেমন প্রাণের মায়া নেই—তেমনি আমাদের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে চলতে হয়। লাইফ ইন্‌সিওর করাই আমাদের বাঁচার পথ।

পাহাড়ের বুকে এঁকে বেঁকে পাথরের রাস্তা চলেছে, কোথাও ছোট ছোট ঝরনার পাশে কিছু কিছু সবুজ গাছপালা দেখা গেলেও, পাহাড়ের রুক্ষতা কোন সময়েই কম মনে হচ্ছিল না। যেখানে রয়েছে জল, সেখানেই গড়ে উঠেছে গ্রাম। একেবারে রাস্তার কোলে যেখানে গ্রাম রয়েছে, সেখানে রয়েছে পুলিসের ঘাঁটি, সেখানে খাবারও পাওয়া যায়, পাওয়া যায় প্রচুর দুধ, দুধের প্রাচুর্য রয়েছে সে দেশে, সে ছাগলেরই হোক আর উটেরই হোক। রুক্ষ পার্বত্য প্রকৃতির সৌন্দর্যের কোন

একটা বাস্তব সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। তবে এটুকু বলা চলে কর্কশতার উপর সামান্য কমনীয়তার প্রলেপ রয়েছে এদিক-ওদিক।

পথে কুরাম নদী পার হতে হয়েছিল। আজকে সে নদীর বর্ণনা দিতে পারব কিনা সন্দেহ। কাচের মত চকচকে জল, পাথরের বুকে কোথাও বা সবুজ শ্যাওলা দেখা যায়, পাহাড়ী নদীর যেমন গতি বেশি, গভীরতা কম ; এও তেমনি। কাবুল উপত্যকায় বরফ গললে আর বৃষ্টি হলে গভীরতা বাড়ে, অনেক সময় দুকূল ছাপিয়ে যায়। এই নদীর ধারে মোটামুটি দূরত্ব রক্ষা করে গ্রামের পর গ্রাম রয়েছে। আবাদ করবার উপযুক্ত মালভূমিও রয়েছে।

আমার মৌন ভাব দেখে প্রকাশ তার কাহিনী অসমাপ্ত রেখেছিল। আমি তাকে ডেকে বললুম, তারপর বল তোমার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কথা। প্রকাশ বলতে থাকে তার অভিজ্ঞতার কথা। এই সেদিনের কথা, চার বছরও হয় নি।

—আমার বাবাকে সবাই এ অঞ্চলে জানে আর খাতির করে। প্রথম প্রথম তাঁকে কিছু কষ্ট করতে হয়েছে, লুঠের ধাক্কায়ও পড়েছেন দুবার। গত দশ বছরের মধ্যে বিশেষ কোন হাঙ্গামা হয় নি। হলেও আমরা শুনি নি। আমি বান্নু থেকে পাস করে এলুম। বাবার ইচ্ছে তাঁর ঠিকেদারি আমি দেখেশুনে নেই। আমিও বাড়িতে থেকে পয়সা উপায় করতে চাই, সেজন্য রাজী হলুম। সকালে বের হতুম, যেতুম মানুষবিহীন এলাকায়। বৃক্ষলতাদিশূন্য প্রস্তরময় প্রান্তরকে মরুভূমি বলা যায় না, কিন্তু মরুভূমির চেয়েও ভয়ঙ্কর স্থান ঐ পার্বত্য অঞ্চল। ভয়ঙ্কর ভীতি-সঞ্চারক নয় বরং ভয়ঙ্করের মাঝে যে কাজ তাতে বেশ উত্তেজনাও ছিল, আনন্দও ছিল।

—সেদিন সকালে নতুন রাস্তার জরীপ হবে। আমি সেই সকালে ড্রাইভারকে নিয়ে বের হলুম, পিছনে আসবে আমীন আর পাহারাদার। আমরা প্রায় ষাট মাইল গিয়ে গাড়ি থেকে নেমে দেখছিলুম কি করে রাস্তাটা বের করা যায় খাড়া পাহাড়গুলোর গা কেটে। তারপর কি হল জানি না। রাইফেল নিয়ে চারজন আমাদের ঘিরে দাঁড়াল ; কথা বলবার অবসর না দিয়েই তারা টানতে টানতে নিয়ে চলল তাদের প্রদর্শিত পথে। প্রায় সাত-আট মাইল পাহাড় আড়াল দিয়ে এসে একটা নদীর ধার বেয়ে আমাদের নিয়ে তারা চলতে থাকে। সামনে একটা গ্রাম, পেছনে আরেকটা, শেষের গ্রামটা নদী থেকে কিছুটা দূরে। নদীর নাম টোচি নদী, খরস্রোতা অথচ শীর্ণকায়া, কোথাও কোথাও গভীরতা রয়েছে। আমাদের তারা শেষের গ্রামে হাজির করল। গ্রামের মুরুব্বীরা হুকো টানছিল খাটিয়াতে বসে। তারা নিজস্ব

ভাষায় কি যেন বলাবলি করে আমাদের দুজনকে দুটো বাড়িতে নিয়ে আটক করলে।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, ওদের ভাষা তুমি বুঝি জান না।

প্রকাশ হেসে বললে, জানলেও দেহাতি ভাষা বোঝা আমার সাধ্য নয়। ছোট থেকে বান্নুতে থেকেছি, সেখানে উর্দুই পড়েছি, সেজন্য ওদের ভাষার জ্ঞান খুবই কম ছিল। ড্রাইভারটা বুঝতো ; পরে বলছিল যে, ওদের লোক আমাদের পরিচয় জানতে গেল।

আমি উৎসুক হয়ে বললুম, তারপর কি হল ?

প্রকাশ বলতে থাকে, আমায় থাকতে দিল একটা ছাগলের খোঁয়াড়ের ওপর। চারদিকে পাথরের দুফুট উঁচু পাঁচিল—ওপরটা খোলা। বসাল একজন পাহারা। বেলা তখন অনেক হয়েছে, খিদেও লেগেছে। এক বুড়ী এসে শুকনো দুখানা রুটি আর এক টুকরো নুন-মাখা পোড়া মাংস আমায় দিয়ে মুখের দিকে অপলকে চেয়ে রইল ; আমি জল চাইলুম, লোটাভর্তি জলও দিয়ে গেল। সারাদিনটা কেটে গেল এইভাবে। ফাঁসীর আসামীও তার মৃত্যুর দিনক্ষণ জানে, কিন্তু আমি জানতুম না আমার মৃত্যুর দিন আর সময়, অথচ মৃত্যুকে শিয়রে নিয়ে বসে আছি। বিকেলে একটা বুড়ো এসে বললে, জলদী একটা চিঠি লিখে দাও তোমার বাবাকে, তার অনেক টাকা রয়েছে, দশ হাজার টাকা দিলে তোমায় মুক্তি দেব, আর গোলামটার জন্য এক হাজার। আমার কিছুই করবার নেই, সুশীল বালকের মত লিখে দিলুম। বুড়ো চিঠিখানা তার পাগড়ীর ভেতর গুঁজে খুশী মনে বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যের কিছু আগে একপাল ছাগল নিয়ে ষোলো-সতেরো বছরের একটা মেয়ে এসে খোঁয়াড় বন্ধ করছিল। আমায় দেখতে পেয়ে সে যেন সাগ্রহ দৃষ্টিতে আমায় গ্রাস করতে থাকে। মুখখানা তার আজও বুকে আঁকা আছে, মুসলমান না হলে তাকে নিয়ে সত্যিই পালিয়ে আসতুম। অত সুন্দর মেয়ে পাঠানদের ঘরে কখনও দেখি নি। পাকা আপেলের মত তার গালের রঙ, দুটো সুগঠিত সুউচ্চ ডালিমকে যেন লুকিয়ে রেখেছিল তার নিটোল বক্ষের কামিজের তলায়। মাথার পেছনে বেণীটিও যেন তার চলন্ত দেহবল্লরীর চলার তালে তালে নেচে চলছিল। আর্য রক্তের গৌর-উজ্জ্বল বর্ণের সাথে অলক্ষ্যে কে যেন স্বর্ণ সিন্দুরের প্রলেপ দিয়ে রেখেছিল তার সুঠাম অধরোষ্ঠে। কাব্যের বিম্বধরাও হার মানে ঐ সৌন্দর্যের কাছে। কোথায় লাগে নূরজাহান আর মমতাজ—দিল্লীর বাদসাহ্ যদি দেখত ও-রূপ তা হলে ভিরমি খেয়ে মরত। তার সঙ্গে ভরসা করে কথা কইলুম। সে

আমার মুখের দিকে রইল চেয়ে, কি যেন বলতে চায় ; কিন্তু কিছু না বলেই শুধু ঠোঁটের ওপর আঙুল দিয়ে চুপ করতে বলে সে চলে গেল।

সন্ধ্যেবেলায় বুড়ী দুখানা শুকনো রুটি, একটুকরো মাংস, তার সঙ্গে কয়েক টুকরো কাঁচা পেঁয়াজ আর টকো আঙুর দিয়ে গেল। বুঝলুম, আমার চিঠিখানা হাতে পেয়ে ওরা খুশী হয়েছে, তাই তদ্বির শুরু হয়েছে। এবার লোটাভর্তি জল এল না, এল ছাগলের দুধ। 'আম্মাজান' আর কদিন থাকতে হবে আমায়? আমি জিজ্ঞেস করলুম সেই বুড়ীকে। আমার কথা শুনে বুড়ী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আমি গেলুম ঘাবড়ে, বললুম—কাঁদছ কেন? সে বললে, ও দুঃখের কথা আর বল না, তোমার মত আমার মেয়ের ছিল দামাদ। কমাস আগে পেশোয়ার গিয়ে সে আর ফেরে নি, শুনছি লড়াইয়ে সে মরেছে। বুড়ী আর কথা বলতে না পেরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আমি পড়ে গেলুম মুশকিলে। খেয়ে দেয়ে থালা লোটা তাকে দিলুম, সেও চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে একটা কম্বল আমায় দিয়ে গেল।

প্রথম রাতটা চাঁদনী ছিল। রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ চাঁদ গেল ডুবে। আমিও ডুবে গেলুম অন্ধকার ভবিষ্যতের চিন্তায়। বাৎসল্য স্নেহে বাবাকে টাকা সংগ্রহ করে দিতেই হবে, অথচ এতগুলো টাকা দিলে আমাদের ব্যবসা যাবে ধসে। আবার নগদ টাকা সংগ্রহ করে দিতেও দরকার হবে আরও আট-দশ দিন। এই আট-দশ দিন এই খোলা আকাশের তলায় আমায় থাকতে হবে নড়ন-চড়ন-বিহীন ভাবে—শুকনো রুটি আর পোড়া মাংস খেয়ে। আবার দেরী হলে ওদের রাইফেলের গুলীতে প্রাণ যেতেই বা কতক্ষণ! চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলছি। নীচে ছাগলগুলো মাঝে মাঝে লাফালাফি করছিল। তাতেও চিন্তার ব্যাঘাত ঘটছিল। আমার যে কি মানসিক অবস্থা হয়েছিল, তা বলবার নয়।

হঠাৎ মাচাংটার ওধারে খসখস শব্দ হওয়াতে আমি উঠে বসলুম। আমার বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে যাচ্ছে—আধা আলো আধা অন্ধকার একটা ছায়ামূর্তি এসে আমার পাশে বসল। ভয়ে চিৎকার করবার ক্ষমতাটাও লোপ পেয়েছে। এমন ভীতিপ্রদ অবস্থায় বাক্‌রোধ হবার উপক্রম। সে আমায় ফিসফিস করে বললে—চুপ!

বিকেলের সেই মেয়েটা! আমায় বললে, আস্তে কথা বলবে, কেউ যেন শুনতে না পায়। ধীরে ধীরে সে জিজ্ঞেস করতে থাকে সব ঘটনা। আমিও বললুম। সে বললে, এতো হামেশাই হয়। যাই হোক, পালাতে পারবে?

আমি বললুম, যদি সে সুবিধে করে দাও।

সে বললে, করতে পারি একটু দেরী হবে— আর এক শর্তে।

—দেরী করতে রাজী আছি, কিন্তু শর্তটা কি?

অন্ধকারে তাকে ভালো দেখতে পাচ্ছিলুম না। সে বললে, আমার যে মরদ ছিল, সে দেখতে ঠিক তোমারই মত। সারাদিনটা ভেবেছি, তুমি সে-ই কিনা। কিন্তু সে তো মরে গেছে; নয়তো তার বদলে তুমি এলে বুঝতেই পারতুম না, আমার ভুল হয়েছে। আম্মাজান তো বিশ্বাসই করতে চায় না যে, তুমি গ্রেপ্তারী। সে বলছে, তুমি ভেক বদলে এসেছ। আমারও কিন্তু মনে হচ্ছে, আমি আমার হারানো স্বামী ফিরে পেয়েছি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বললে, আমায় যদি সঙ্গে নাও, তা হলে তোমায় পালাবার সুযোগ করে দেব, নয়তো নয়।

শেষের কথাটা সে দৃঢ়তার সঙ্গে বললে।

আমি বললুম, এক সঙ্গে পালাতে গেলে ধরা পড়বার সম্ভাবনা রয়েছে। তাতে বিপদও বাড়বে। বরং আমি এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে তোমায় নিয়ে যাবার রাস্তা দেখব।

—সে তুমি পারবে না। এ জায়গায় প্রাণ নিয়ে কেউ আসতে পারে না। কার এমন দশটা মাথা আছে, যে এখানে আসবে, তবে—

আমি বললুম, তবে কি?

—আসছে ঈদের চাঁদ যেদিন, সেদিন তুমি টৌটি নদীর ওপারে এস ঠিক সন্ধ্যেয়, আমি ওখানে তোমার সঙ্গে মিলব।—কেমন?

আমি বললুম, বেশ, তাই হবে।

প্রকাশ থামতেই আমি বললুম, তুমি রুস্তম আর তাহ্‌মিনার গল্প শুরু করলে দেখছি!

প্রকাশ বললে, শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছে। চারদিনের দিন রাতে সে আমায় নিয়ে এসে সদর রাস্তায় তুলে দিল। ওড়নাতে চোখ মুছতে মুছতে বললে, ঈদের চাঁদের দিনে সন্ধ্যেয় এস, নয়তো তোমার আকলিমা গলায় রশি দেবে।

আমাকে যেতে হবে সত্তর মাইল, তবেই আমাদের গ্রাম। আকাশের তারাকে পথপ্রদর্শক করে দৌড়চ্ছি তো দৌড়চ্ছি। চার-পাঁচ ঘণ্টা দৌড়ে যাবার পর একটা খোলা জায়গায় এলুম। মনে হয় বিশ-পঁচিশ মাইল এসে গেছি। কখনও হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছি, কখনও লাফিয়ে লাফিয়ে টিলায় উঠছি, কখনও বা বাঁদর ঝোলা হয়ে নামছি। অবশেষে মোটর-রাস্তায় এলুম। প্রাণের ভয়ে আশ্রয় নিলুম একটা

পাথরের তলায়। অপেক্ষা করছি ভোরের আলোর। সালোয়ার কামিজ গেছে ছিঁড়ে, জুতো একখানা গেছে হারিয়ে, ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। কদিন মাথায় তেল পড়ে নি, বয়সের উত্তেজনায় দেহের ওপর অত্যাচারও হয়েছে যথেষ্ট—আমি যেন ছিলুম না। কি করে এত রাস্তা এসেছি তা বলতেও পারব না, পিপাসায় গলা শুকিয়ে কাঠ! পাথরের তলা থেকে বেরিয়ে আসবার সামান্য সাহসও তখন লোপ পেয়েছে, পিপাসায় মৃত্যু ঘটলেও গত্যন্তর ছিল না। শুধু প্রতীক্ষা করছিলাম, সে যে কি অধীর প্রতীক্ষা তা ভাষা দিয়ে বোঝানো যায় না।

অনেকটা বেলায় মোটরের আওয়াজ পেয়ে বাইরে এলুম। মিরনশার যাত্রীবাস। যাত্রী হলুম তাতে।

প্রকাশ তার কাহিনী শেষ করতেই আমি বললুম, কই, আক্‌লিমার কথা বললে না তো?

—সে রয়ে গেল, প্রথম একটা উত্তেজনা ছিল, উত্তেজনার আধিক্যে মনের কোণে দুঃসাহস উঁকি দিয়েছিল আকলিমাকে টোটি নদীর কিনারা থেকে নিয়ে আসবার, কিন্তু পরে ভেবে দেখলুম, আর দেখা করা সম্ভব নয়। তাই আর দেখা হয় নি।

আমি হেসে বললুম, হয় নি নয়, কর নি। তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি মত ঈদের চাঁদের সন্ধ্যেয় যাও নি।

—আবার যাব! সেদিন বাঁচবার দরকার ছিল, তাই সব স্বীকার করেছিলুম। কেউ যদি এক পেয়ালা বিষ এনে বলত, এটা খেলে তুমি বাঁচবে, তাও খেতুম।

সে নিজের মনেই আবার বলে উঠল, আবার যাব সেই দুষমনের এলাকায়! আপনি পাগল হয়েছেন!

প্রকাশের বক্তব্য আমায় মোটেই খুশি করে নি। তাকে বাধা দিয়ে বললাম, —আমি পাগল হই নি, মাথার গণ্ডগোল হয়েছে তোমার। সেদিন তোমার বাঁচার প্রয়োজন ছিল, তার সঙ্গে জড়িত ছিল মেয়েটিব ইজ্জতের প্রশ্ন। নিজেরটাই যদি এত বড় করে দেখলে; তবে যাকে নিয়ে ঘর করতে পারবে না, যাকে দিতে পারবে না সামাজিক মর্যাদা, তাকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বাস করলে কেন?

—সেদিন উপায় ছিল না।

—ছিল, তুমি দেখতে পাও নি, তাকে স্তোক দিতেও তো পারতে। অন্তত তুমি যখন বলছ, ওরা সরল আর সৎ, তখন তাকে বুঝিয়ে শান্ত করতে পারতে, হয়তো কিছু মিথ্যে কথা বলা হত কিন্তু তার ইজ্জত নষ্ট হত না।

—খুনী পাঠানের আবার ইজ্জত!

—ইজ্জত সবারই আছে, তাছাড়া ওদের জাত আলাদা—ওরা হচ্ছে নারী। সেই নারীত্বকে ও দেউলে করে তোমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, তুমি তাকে অবমাননা করেছ। একটু চিন্তা করে দেখ, ও-ই তোমার স্ত্রী। বিবাহটা কেবল সমাজের স্বীকৃতি। নয়তো স্ত্রী-পুরুষের মিলন আর বসবাসের জন্য উভয়ের সম্মতিই যথেষ্ট, সেইটেই বিবাহ। মন্ত্রগুলোর অর্থ করে দেখবে, সেগুলো বিদ্রূপাত্মক-ভাবে অর্থহীন। একমাত্র অর্থ রয়েছে ঐ সম্মতিতে। সেই মেয়েটাকে তুমি যতই বঞ্চনা কর, সেই তোমার স্ত্রী। আমি হলে স্ত্রী-ত্যাগ করতুম না।

প্রকাশ একবার তর্কতর্কি করবে বলে সোজা হয়ে বসেছিল। কি জানি আমার যুক্তি ওর পছন্দ হয় নি বলে, ও চুপ করে গেল।

আমিও পাহাড়ের দিকে চেয়ে নীরবে বসে রইলুম।

কোহাট এসে পেট্রোল নেওয়া হল। সঙ্গের খাবারগুলোরও সদ্ব্যবহার করা গেল। আমার ইচ্ছে ছিল শহরের ভিতর দিয়ে গাড়ি গেলে আলগোছে শহরের রূপটা দেখে নেবে। কিন্তু ড্রাইভার বললে, এখানে দেরী করলে পেশোয়ারের চৌকি ফটক বন্ধ হয়ে যাবে, তাতে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। সেজন্য কোহাট শহরকে পাশে রেখে গাড়ি আবার ছুটল।

কোহাট জেলার সদর, মস্ত বড় ফৌজি ঘাঁটি—ইংরেজের সীমান্ত শাসনের বড় আড্ডা। এই আড্ডা সুরক্ষিত।

প্রকাশ তার কাহিনী বলে আমার কাছ থেকে কোন সহানুভূতি না পাওয়াতে বিশেষ মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিল। তাই সে চুপ করে বসে রইল। এতটা রাস্তা নীরবে চলা কষ্টকর। তবুও চলতে হচ্ছে।

নওশেরা হয়ে গাড়ি পেশোয়ারে এল।

বেলা তখন গড়িয়ে গেছে। তাড়াতড়ি লাণ্ডিকোটাল পৌছতে পারলে যেন বাঁচি। কিন্তু জামরুদ গিয়ে আমরা আর এগোতে পারলুম না।

পেশোয়ার সীমান্ত প্রদেশের রাজধানী। মহারাজ কনিষ্ক স্থাপন করেন এই নগর। রণজিত সিংহের সময় পেশোয়ারের খ্যাতি শোনা যায়, তারপর এদেশ জয় করে ইংরেজ, এখানে তাদের কর্মকেন্দ্র গড়ে তোলে। বর্তমানে সভ্যদেশের আধুনিক শহর। বিলাস বৈভব কোনটারই বিশেষ অভাব নাই।

তখন ডাঃ খানসাহেব সীমান্তের প্রধান মন্ত্রী। কংগ্রেস তখন বিজয়দীপ্ত। খানসাহেবের ভাই বাদশা খাঁ—সীমান্তগান্ধী। খানসাহেব বিলাত-ফেরত ডাক্তার, শুনেছিলাম হাজারা জেলার লোক। কাশ্মীরের পুঞ্চ আর পাঞ্জাবের রাওয়ালপিণ্ডি জেলার গায়ে এই জেলাটা।

এই সময় ইংরেজের সঙ্গে কংগ্রেসী টাগ-অব-ওআর চলছে। টাগ-অব-ওআর করতে কংগ্রেসীরা পরিপক্বতা লাভ করেছে। টেবিলে বসে লম্বা কথা বলা, কাজের বেলায় ফক্কা, এই হল কংগ্রেসী ঐতিহ্য। এই ফক্কামির ন্যাকামিতে পড়ে বাংলাটাকে দিল ভাসিয়ে। সমাপ্তি ঘটল বাংলা ভাগে।

এই টাগ-অব-ওআরের নেতা গান্ধীজীর 'বাদ' গান্ধীজীতেই' সমাপ্ত হল। কাল্পনিক দর্শন কখনও যুগের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে না, যুগের ধ্বংস আনে। তার ফলে তৈরী হয় 'বাদের' নামাবলীধারী চোরের উৎপাত। সে চুরিতে অবশ্য সভ্যতার মুখোশ থাকে!

যাই হোক এবারের মান টানাটানির সময় আমি পৌছলুম পেশোয়ারে।

ছয়ফুটী সীমান্ত সন্তানের উন্নত নাসা ও গৌরবর্ণের মধ্যে নূতনত্ব নেই—শুধু বুকের সাথে বেল্টে আঁটা গুলী আর পিঠে রাইফেল, মাথায় পাগড়ি আর পায়ে কাবলী চপ্পল, আর উপরি বস্ত্রের দুর্গন্ধ। এই হল পেশোয়ার। তবে আমাদের শহরগুলোতে দারিদ্র্য যেমন বীভৎসভাবে দেখা যায়, তেমনটা দেখা যায় নি। তার কারণ মনে হয়, জঙ্গী পেশার দরুন সবার ঘরে একটা উপরি আয় আছে, কোথাও পেনসন্ কোথাও মাসিক বরাদ্দ হিসেবে। সেজন্য অপ্রতুলের দরুন আক্ষেপ কম।

শহরটাকে দুভাগে ভাগ করা যায়—একটা ফৌজী অপরটা সাধারণী। ফৌজী শহর আমাদের জন্য নয়। পিচ্-ঢালা চক্চকে রাস্তা, মনোহারী বাংলো, জল আর আলোর সুব্যবস্থা এসব ফৌজী শহরের নিদর্শন। সেখানে অ-ফৌজীরাও সন্ত্রস্ত পদক্ষেপ করে। তার ওপর সাদা মুখের আনাগোনা, কোথাও Store and Provisions-এর মন ভুলানো দোকান, কোথাও রয়েছে Bar আর Military Mess-এ মদের হুল্লোড়। তাতে কালাধলা নেই, সবাই সমান ভাবে পান করে চলেন আর ভাড়া-করা মেয়েদের কোমর জড়িয়ে রাস্তায় বেরোন। তারপর রয়েছে কেল্লা; তাকেও করা হয়েছে সুরক্ষিত। ভেতরটায় মাটির ঢিবির মত মনে হয়; তার মাথায় বসানো সাইরেন, সকাল সন্ধ্যে ভোঁ করে, মজুরদের প্যাটরা-ভর্তি করবার জন্যে আর বের করবার জন্যে। অর্থাৎ nothing new, যেমন কিরকীতে, যেমন বাঙ্গালোরে, যেমন কোয়েটায়, তেমনি পেশোয়ারে।

সেদিন একটি প্রশ্ন মনে জেগেছিল, আজও সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাই নি। ইংরেজের নিজস্ব সৈন্যব্যবস্থা এবং ভাড়াটিয়া ভারতীয় সৈন্য পালনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতশাসন এবং বৈদেশিক আক্রমণ থেকে ভারতকে রক্ষা করা। সারা ভারতে ছড়িয়ে রয়েছে যে সব সৈন্যাবাস, সেখানে মদ ও নারী নিয়ে যে ব্যভিচার অবাধে

চলতে দেখেছি তাতে সন্দেহ জেগেছে, নৈতিক অধঃপতিত এই সব জোয়ানদের পক্ষে ভারতশাসন সম্ভব হলেও কঠিন বৈদেশিক আক্রমণ হলে এরা বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে হয়তো পারবে না! সত্যই এরা পারে নি। বর্মা, মালয় থেকে এরাই পালিয়ে এসেছিল, এদের পক্ষে নিরীহ নিরস্ত্র ভারতবাসী ঠেঙ্গানো যত সহজ, সুসংবদ্ধ বিদেশী বিতাড়ন অতো সহজ নয়। এ প্রমাণ বহুবার পাওয়া গেছে। এই অশ্লীল ঐতিহ্য আজও বজায় আছে কিনা তা কে বলতে পারে!

সাধারণীতেও অসাধারণ কিছু নেই। লোকের পিঠে বন্দুকের সংখ্যাটা একটু বেশি। নয়তো স্থানে স্থানে কলকাতার বস্তির চেয়েও নোংরা। বর্ষাকালে বড়-বাজারের ছোট গলিতে গেলে যেমন অসহায় অবস্থায় পড়তে হয়—এমনি আর কি! দেশী সৈন্যরা ঘোরে সাধারণীতে বেশি। এই দেশী সৈন্যের বৃহৎ সংখ্যাই গোর্খা আর গাড়োয়ালী। নেপালী সৈন্যরা তাদের কানছী নিয়ে যখন পেশোয়ারীদের পাশ দিয়ে চলে তখন সত্যিই চমকে উঠতে হয়। যান্ত্রিক যুগ না হলে, ওদের দুটোকে পকেটে পুরে নিয়ে পেশোয়ারীরা সহজেই চলতে পারত। সবচেয়ে সুন্দর দেখাচ্ছিল লাণ্ডিকোটালে: আড়াই ফুট প্রাচীরের এপাশে বামন অবতার গোর্খা পুঙ্গব টাইটফিটিং পোশাক পরে, ছোট একটা সঙ্গীন বন্দুকের মাথায় চড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে; আর অপর দিকটায় রয়েছে ছয়ফুটী আফগানী সৈন্য—ঢোলা বেশভূষা, মস্ত তার বন্দুকের সঙ্গীন। যেন পিতা পুত্রকে ফৌজী মোর্চা শেখাচ্ছে—লেফট্—রাইট্। ইংরেজের এই পছন্দকে তারিফ না করে পারি নি। এই দুটোই পাহাড়ী জাত, একই হিমালয়ের সন্তান এবং প্রকৃতিতে মায়া-মমতাহীন, মস্তিষ্কশূন্য বীর যোদ্ধা।

মরূদ্যানের মত নীরস পর্বতের বুকে পেশোয়ার—সবুজ মালভূমি। পেশোয়ারের পথে দেখছি ফলের বাগান, চাষের জমি, শাকসবজির প্রাচুর্য। অপ্রতুল কিছুই নেই—করাচীর লোনা সাগরে মাছও পাওয়া যায়।

রাস্তায় খানদানী বোরখা দেখা যা[illegible]। পর্দাটা ধনীদের জন্যে, সাধারণের জন্য নয়। শিখ আর হিন্দুঘরের মেয়েরা বাজারহাটও করে।

এদেশের মেয়ে-পুরুষ আমাদের চেয়ে কাজ করবার সময় বেশি পায়। আমাদের দেশের মত ডাল, সুক্তো, ঝোল, চচ্চড়ি, ঘণ্ট ইত্যাদি নানা পদ রাঁধতে রান্নাঘরেই তাদের সময় কাটে না। দাল-রুটি, মাংস, যাই হোক এরা তাড়াতাড়ি রেঁধে শেষ করে। খাবারের ব্যবস্থায় নোংরা হয় কম; তাতে ঘসর ঘসর করে সারাদিন বাসন মাজতেও হয় না তাদের। এঁটো শকরীর বালাই নেই।

আবার পুরুষেরা সকালে উঠে স্নান করে কিছু মুখে দিয়ে কাজে বেরোয়, আহার্যের কি ব্যবস্থা হবে তার দিকে তার তাকাবার কথা নয়। সকালটা বাজার করতেই কেটে যায় না। বাজার করা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মেয়েদের কাজ। এতে খরচও কম, সময় নষ্টও কম। ফলে কাজ করবার সময় বেশি, আর বাবুগিরি করাও চলে।

সন্ধ্যের আগে গাড়ি দাঁড়াল জামরুদ্!

এখানে আসতেই পুলিস জানাল, আমাদের যাবার হুকুম থাকলেও গাড়ি নিয়ে যাবার হুকুম নেই; অতএব গাড়ি রেখে ট্রেনযোগে লাণ্ডিকোটাল যেতে হবে। জামরুদ্-খাইবার গিরিপথ আটকে ভারতের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে ইংরেজ। যদিও লাণ্ডিকোটাল ভারতের শেষ সীমানা, কিন্তু আসল ঘাঁটি জামরুদে।

প্রকাশ যেন অস্থির হয়ে পড়ল। সে চেয়েছিল আজই জালালাবাদ পৌঁছাতে; কিন্তু উপায় নেই। আমি একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলুম, পেশোয়ার অথবা কোহাটকে দেখতে পেলুম না ভালো করে। রেলের স্টেশনের মত পেরিয়ে যাবে—আর তাই দেখে খুশী হয়ে বলব, আমি অমুক জায়গা দেখেছি, এটা আমার সহ্য হচ্ছিল না। তাই আটক হয়ে খুশী হলুম।

পাহাড়ের বুকে ছোট একট শহর জামরুদ্। অসামরিক অধিবাসী নেই বললেই হয়। বিনা প্রয়োজনে প্রবেশও নিষেধ। ফৌজী এলাকায় ফৌজ প্রতিপালনের উপকরণ তারা মজুদ রাখে। সেই সঞ্চিত শস্যের এক কণিকাও তারা কাউকে দিতে চায় না। তার ওপর এলাকাটা এমনই ভীতিপ্রদ যে, কখন কি প্রয়োজন হবে, তারও ঠিক নেই। সেজন্য বাইরের লোককে ওরা থাকতে দিতে চায় না।

আমাদের কিন্তু রাত্রিবাসের অনুমতি দিল।

সারারাত পালা করে দুজনে পাহারা দিচ্ছিলুম, আর তিনজনে দিচ্ছিল ঘুম। শেষ রাতে মুনীর খাঁয়ের হাত থেকে রাইফেল নিয়ে আমি বসলুম গাড়ির বনেটের ওপর, আর আফাজুল্লা রাইফেল কাঁধে নিয়ে করতে থাকে পায়চারী। শেষরাতের শীত প্রচণ্ড, কম্বল জড়িয়ে বসেছিলুম। পকেটের সিগারেটও কম পড়ে গেছে। তাই আফাজুল্লাকে ডেকে বললুম, বড়মিঞা এস, বস, ঠাণ্ডায় ঘুরলে অসুস্থ হয়ে পড়বে।

আফাজুল্লা হেসে বললে, হুজুর, খোদার দোয়াতে আমাদের সর্দি গরম সবই সমান। আমরা দেহাতী চাষা।

ধীরে ধীরে গল্প জমে উঠল।

আমি বললুম, আফাজুল্লা, তোমার বিবি এই দুশমনের দেশে আসতে দিল?

—তা দেবে না কেন, হুজুর! ঘরের বিবির হুকুম শুনে পাঠানরা চলে না।

—ধর, তুমি যদি গুলী খেয়ে আজ মরে যাও, তা হলে তোমার বিবির কি অবস্থা হবে?

—আবার সে নিকা করবে। আমাদের শরীয়তে যেমন রয়েছে, তাই মেনে চললে কষ্ট কি?

—আর তোমার ছেলেপিলে?

—তাদের কি মা হয়ে ভাসিয়ে দেবে? তারা তো লাট-বেলাট হবে না, পাঠানের ছেলে যদি জমি চষতে পারে, রাইফেল চালাতে পারে, তা হলেই যথেষ্ট। যদি নেহাত কিছু কষ্ট হয়, তা হলে মসজিদের ইমামের কাছে যাবে, নয়তো এতিমখানায়।

আমি কথার মোড় ঘুরিয়ে বললুম, আফ্রিদী, ওয়াজীরি, মাস্থদ, এদের সঙ্গে তোমার মোকাবেলা হয়েছে কখনও?

—হুজুর, নয়া-মেহমান্। আমি নিজেই মাস্থদ। যারা ঐ এলাকায় থাকে, তাদের বড় কষ্ট। অথচ ঘরবাড়ি ছেড়ে এ এলাকায় আসতেও পারে না, এলেও বিশ্বাস করে কেউ থাকতেও দেয় না। তাই তারা লুঠপাট করে। আবার গোলামীটা ওদের অসহ্য।

—তবে তুমি এলে কেন?

—আমি মাস্থদীবাচ্চা; ছোটবেলায় এসেছিলুম এদেশে, বড় হয়ে পাহাড়ের বুকে ফিরে যাবার নেশাও হয়েছে, কিন্তু পারি নি শুধু শোভনলালের জন্য। ও-ই আমাকে রুটি দিয়েছে। ওর মনে আঘাত দিয়ে বেইমানী করতে পারব না, হুজুর। তাই আজও শোভনলালের আমি গোলাম, কিন্তু নেমকহারাম নই। ওই আমার সাদী দিলে, নয়তো মা-বাপ-হারা এতিম তো পাহাড়ের নুড়ি খেয়ে মানুষ হতে পারে না। শোভনলালের জন্যই জানমান কোরবান করতে পারি।

ধীরে ধীরে সকালের আলো দেখা দিল। খাইবার গিরিপথে রোদের আলো পড়ে চকচক করছিল। এই খাইবার গিরিপথ দিয়েই এসেছে শক, হুন, পহ্লব; এই পথেই এসেছে স্থলতান মাহ্মুদ আর ঘোরী। এই পথেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতের পরাধীনতার শেকল ধীরে ধীরে গড়াতে গড়াতে নেমে এসেছে। তাই আজ ইংরেজ এই পথকে করেছে স্থরক্ষিত—মাছি ঢোকবারও রাস্তা রাখে নি।

কাবুল নদীর কিনারায় জালালাবাদ শহর। এই কাবুল নদী পেশোয়ারের পাশ বেয়ে এসে সোয়াতের সঙ্গে মিশেছে।

লাণ্ডিকোটাল পার হয়ে আফগানিস্থানের জমিতে পা দিলুম।

এই আমার প্রথম ভারতের বাইরে পদার্পণ।

জীবনে কখনও ভারতের বাইরে যেতে পাব, একথা ভাবতেও পারি নি কোন দিন। কেমন একটা উদ্দীপনায় আমি আবিষ্ট হয়ে গেলুম। পেছনে তাকিয়ে দেখলুম, ঐ ভারত। মাত্র বিশগজ দূরে সেই মহাভারতের মহনীয় ভূমি। হে ভারত, শত লাঞ্ছিত তুমি, তোমায় নমস্কার!

আফগানী সৈন্য পারমিট দেখামাত্র সসম্মানে আমাদের এগিয়ে দিল। একটা কাঠের বেষ্টনী পার হওয়ামাত্র দুজন আফগান যুবক বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলে, আপনারা কি মোরমির্জা থেকে আসছেন?

—আজ্ঞে হাঁ, বলে প্রকাশ জিজ্ঞেস করল, আর আপনারা?

—গুলজারচাঁদের লোক। কাল থেকে গাড়ি নিয়ে আপানাদের অপেক্ষায় রয়েছি।

আমি হেসে বললুম, বহুৎ বহুৎ মেহেরবানী।

আমরা গাড়িতে বসতেই তারা খাবার আনল—ন্যাসপাতি, কিসমিস আর ঘরে-তৈরী লাড্ডু।

একজন স্টোভ ধরিয়ে জল গরম করলে, তাতে দিল লবঙ্গ, দারুচিনি আর জমানো দুধ। দুধের কৌটায় রোমান হরফে সব কিছু লেখা, অথচ পড়ে বুঝতে পারলুম না। মনে হল, ইউরোপের কোন দেশ থেকে এসেছে। তা দিয়ে তৈরী হল চা, সুস্বাদু না হলেও সুঘ্রাণের অভাব ছিল না।

গাড়ি চলল। এবারও পাচজন যাত্রী। দুজন ফৌজী সেপাই, ড্রাইভার আর আমরা দুজন। সেপাইদের একজন পদস্থ।

আমি গিয়ে বসলুম সামনের সীটে; উদ্দেশ্য সঙ্গী সেপাইটার সঙ্গে কথা বলে আফগানিস্থান সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান সংগ্রহ করা।

আমি সকালের রোদমাখা পাহাড়গুলো দেখছি; উঁচু পাহাড়টার ছায়া এসে নীচু পাহাড়টাকে ঢেকে রেখেছে কোথাও, ঠিক যেন পিতার মত পুত্রকে আচ্ছাদন করে রেখেছে। রাস্তা সোজা আর সমতল। অবশ্য কিছুটা মাত্র। কর্জন পাঠান মেয়ে একটা বড় কাঠের রোলা নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিল, হয়তো ওতেই হবে ওদের জ্বালানি, অথবা ওদের ঘর বাঁধবে ওতে। দূরে দূরে গ্রামও দেখা যাচ্ছিল। ছোট ছোট টিলার ওপর থেকে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছিল। বুঝলুম, আশেপাশে

অনেক গ্রামই আছে। পাহাড়ী এই এলাকায় হয়তো বিশ মাইলের ভেতর কোন গ্রাম নেই, আবার কোথাও গায়ে গা দিয়ে রয়েছে দু পাঁচটা গ্রাম। যেখানে জলের স্থবিধে সেখানেই গ্রাম গড়ে ওঠে। সভ্যতা সব সময়ই নদীমাতৃক। নদী সভ্যতার পরিপোষক। তাই নদী দেখলেই গ্রামের অস্তিত্ব মেনে নিয়েছে।

লাণ্ডিকোটাল থেকে জালালাবাদ খুব দূর নয়, কিন্তু চড়াই-উতরাইয়ের জন্য সময় অনেকটা প্রয়োজন।

আমি সেপাইটিকে জিজ্ঞেস করলুম, উর্দু বলতে পার?

—পারি কিছু কিছু। অবশ্য কথা বলে বুঝলুম, সে আমার চেয়ে কম উর্দু জানে না।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, গুলজারচাঁদ জালালাবাদে কি করে?

—হুজুর হুকুম্‌দার—ফৌজী কাপ্তান।

—তুমি কি?

—রিসালদার। হুজুরের ফৌজের খাদেম।

—আমরা কি আফগান এলাকায় এসে গেছি?

—ঠিক আফগান এলাকা নয়, তবে আমাদের তদারকে আছে। সামনের ঘাঁটিতে গেলেই বুঝতে পারবেন, কোথা থেকে ঠিক আফগান এলাকা আরম্ভ।

—এ রাস্তায় পাখতুন হামলা হয় না?

—হুজুর, পাখতুন কাকে বললেন? এখানে দুজাতির পাঠান আছে, একজাত ইংরেজের গোলাম জির্গার অধীন—তারাই আপনার দেশে পাঠান। আর একজাত আছে, যারা আজাদ জির্গার রইয়ৎ। তারাও পাঠান তাদের আমরা বলি পাখতুন।

আমার যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল। এতদিন যা শুনে এসেছি তা কি মিথ্যা? তবু হাল না ছেড়ে বললুম, যাই হোক, সবাই তো পাঠান, বল দেখি তাদের হামলা হয় কি না।

—পাখতুনী এলাকায় হামলা হয় না হুজুর, হামলা হয় ইংরেজ এলাকায়। পাখতুনীরা গরীব বটে, নিজেদের মধ্যে লড়াই করে, তবে হিংস্র নয়। যেসব এলাকা ইংরেজ দখল করেছে, কিংবা দখল করতে চায়, সেখানেই চলে হামলা। এই ধরুন, চিত্রল, দির সোয়াত এলাকা—এদের জির্গাদার ইংরেজের গোলাম। ইংরেজ জির্গাদারকে দেয় প্রচুর ঘুষ, উদ্দেশ্য পাখতুন এলাকায় যাতে ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই করে নিজেরা হয়রান হয়। কিন্তু জির্গা এলাকায় লোক বড়ই গরীব, জির্গাদার তাদের বাঁচবার মত স্থবিধে দেয় না। গরীব লোক কি করবে, পেটের দায়ে

লুঠপাট করে। চালাক যারা তারা বড়লোকের ছেলে ধরে আনে, মুক্তিপণ পেলে ছেড়ে দেয়। হুজুর, গরীব যারা তাদের রুজি-রোজগার থাকলে, হামেশাই কি বুকের রক্ত দিতে ছুটে যায়? ওরাও যে জানে, রক্ত দিয়েই ওদের খাবার আনতে হবে, না খেয়ে মরবার চেয়ে ঐপথ ওরা বেছে নিয়েছে—ধীরে ধীরে ওরা হিংস্র হয়ে উঠেছে। যারা শান্ত প্রকৃতির নির্মল সন্তান ছিল তারাই বঞ্চনাকে রোধ করতে হয়ে উঠেছে মায়া-মমতাহীন হামলাদার। রক্তপাত ওদের নেশা নয়, আহার্য সংগ্রহ করবার পেশা মাত্র।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, আফগানী এলাকায় ওরা হামলা দেয় না?

—না, গোলাম পাঠান আর আফগানের মাঝে রয়েছে, আজাদ পাখতুন। এরা সব সইবে, বিদেশীর হুকুমত সইবে না। আবার যখন ইংরেজ পেটাতে থাকে ঐ গোলামগুলোকে, তখন ওরা আশ্রয় নেয় আমাদের দেশে। ইংরেজ ঘুষও দেয়, ঘুষিও মারে। সুবিধে বুঝে ওরা গলায় আর পায়ে দুটো হাত রাখে। পাখতুনরা হামলা দেয় ইংরেজের ফৌজী মোর্চায় আর গোলাম জির্গাদারদের উপর। ওরা চায় ওদের জাতভাইকে আজাদ করতে।

ধীরে ধীরে আমার চোখের সামনে থেকে যবনিকা সরে গেল। তা হলে প্রকাশকে যারা আটক করেছিল, তারা খাঁটি পাখতুন নয়। অথচ স্বাধীনতাকামী পাখতুনের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে ইংরেজ চালায় বোমা আর গুলী, জালিয়ে দেয় গ্রামের পর গ্রাম।

এই পুরানো খেলাই চলছে। খেলা যারা খেলে আসছে, তারাই খেলছে। পাখতুন-পাকিস্তান বিবাদের পিছনে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত দুই তরফেই আছে। পাকিস্তানী সমরনায়ক আর শাসকের দল তাই পাখতুনীর স্বাধীনতা স্বীকার করতে চায় না। রিসালদার বলতে থাকে, পাখতুনরা বড়ই শান্ত, সরল আর সৎ; কিন্তু বেজায় জেদী জাত। নিজে না খেয়ে আপনার খাবার দেবে, নিজের বিছানায় আপনাকে শোয়াবে। ওদের সঙ্গে যদি মিল-মহব্বত হয়, তা হলে ওরা আপনার জন্য জান্ কবুল করে বসবে। তবে লেখাপড়া ওরা প্রায়ই জানে না, তাই স্বভাবে ওরা বন্য—তাদের প্রকৃতি একদিকে যেমন সরল তেমনি বুদ্ধিবৃত্তিও একটু ভোঁতা। ওয়াজীরিরা করে লুঠপাট, গুলী খায় পাকতুন, আর—

রিসালদারের কথা অসমাপ্ত রইল, আফগানী প্রথম ঘাঁটিতে গাড়ি এসে গেছে।

খাইবার গিরিপথের শেষ, কাবুল উপত্যকার শুরু।

গৌহাটি থেকে শিলং যেতে যেমন নংপো; অথবা শ্রীহট্ট থেকে শিলং যেতে যেমন ডাউকী—এ জায়গাটাও তেমনি। এক পাশে গুল্মাচ্ছাদিত পাহাড়, অপর-

দিকে দেবদারু আর বাদামের গাছ। আগে এদিক থেকে ইংরেজেরা বাদামের কাঠ সংগ্রহ করত বন্দুকের বাঁট তৈরি করতে। পরে অবশ্য কাশ্মীর থেকেও সংগ্রহ করতে পেরে এদিককার আমদানি বন্ধ করে।

গেট খুলে গাড়ি ভেতরে নিল। গাড়িখানা ছিল ফৌজী; সেজন্য কোন রকম তল্লাশী হল না, কেউ জিজ্ঞেস করল না।

সুন্দর একখানা বাংলো—সরকারী ঘাঁটি। তার পাশে ছোট একটা হোটেল। আশেপাশে আরবী হরফে পুস্ত ভাষায় অনেক কিছু লেখা আছে। ইংরেজীতেও কিছু লেখা রয়েছে। মোটামুটি স্থলশুল্ক অফিসের সব ব্যবস্থাই সুচারুভাবে চালাবার নির্দেশ রয়েছে। এই শুল্ক বিভাগটি পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য বিভাগ। প্রত্যেক দেশেই এই বিভাগ রয়েছে। সরকারী আয়ের মোটা অংশ আসে এখান থেকে, আর এখানকার কর্মচারীরাও অতি মোটা হয় সেই সাথে সাথে। অবশ্য সৎ কর্মচারীর কথা আমি বলছি না।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল ভারতীয় শুল্ক বিভাগের কথা। স্বাধীন ভারতের শুল্ক বিভাগের দুর্ব্যবহারের আস্বাদ সেবার রেঙ্গুন থেকে ফিরবার সময় পেয়েছিলুম।

কিং জর্জ ডকে জাহাজ এল সকাল নটায়। প্রথমে তল্লাশী হল কেবিনের যাত্রীদের—আর ডেকের যাত্রীদের খোঁয়াড়ে লাইন দিয়ে দাঁড় করান হল।

যাত্রীসংখ্যা সাত শতের ওপর, আর পরীক্ষক ছয় জন। তাদের কারুরই পরিধানে কাস্টমসের পোশাক নেই।

বেলা বারোটায় এই ছাগল-ভেড়ার পরিচর্যা শুরু হল।

মালপত্র তছনছ করা হল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জিনিসগুলো মাটির ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হল। খুলবার আর বন্ধ করবার দায়িত্ব এই ছাগল-ভেড়াদের। কারুর স্ত্রী হয়তো আসন্নপ্রসবা অথবা জাহাজে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সে গিয়ে অনুরোধ জানাল, অবশ্য জোড়হস্তে এবং বিনীত বচনে, দেখুন দাদা, আমার—

তার কথা সমাপ্ত হল না, কর্মচারীটি বললেন, আর ফপরদালালি করতে হবে না, নিজের জায়গায় যাও দেখি।

মানুষগুলোর মুক্তি হল বেলা পাঁচটায়।

এর মধ্যে পাওয়া গেল কারুর কাছে পাঁচটা 'গ্রেপ ওয়াটারে'র শিশি, টেনে নিয়ে গেল তাকে, কিছুক্ষণ বাদে সে ফিরে এল হাসতে হাসতে, হাতে তার শিশি। জিজ্ঞেস করলুম, কি হল?

—আট আনা হিসেবে দিলুম।

—রসীদ?

—রসীদ চাইতে গেলে নটাকা দিতে হবে।

শুল্ক বিভাগের কর্মচারীদের একটি ক্ষমতা দেওয়া আছে। সে ক্ষমতাটি হল—তারা ইচ্ছা করলে bonafide বুঝলে নিজ ব্যবহৃত মনে করে কতকগুলো মাল ছেড়ে দিতে পারে। এই সুযোগটি সবাই গ্রহণ করে থাকে; কেউ করে না এমন কথা আজও শুনি নি। তবে দেবাঃ ন জানন্তি—

ভারত সীমান্তের কোনও রেলস্টেশনে দেখলুম সার্চের নামে দিচ্ছে দাঁত খিঁচুনি, ধাক্কা, অবশ্য স্কন্ধদেশে। ভয় দেখাচ্ছে চড়-চাপড়ের। শেষে নিয়ে গেল তাদের ঘাঁটিতে—দক্ষিণা দিয়ে আসতে হল!

বর্মায় বাঁ হাতে চোরাই মাল নাও, ডান হাতে দাও দক্ষিণা, বাস্—খালাস। আমি নিজে চোখেও দেখেছি এমনও Preventive officer আছে, যে সামান্য উপার্জনে একখানা মরিস গাড়ি কিনেছে মাত্র। শুধু কাস্টমস নয়—ইনকাম ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, পুলিস, যারাই জনসাধারণের সাহচর্যে আসে, তারাই এই ব্যবসায় চালায়। ব্যবসায় বললাম, চাকরিতে তাদের পেট ভরে না বলেই side business এটা। ভাওয়ে পোষায় না বলে, ফাওয়ে পুষিয়ে নেয়।

কিন্তু আফগান বর্ডারে যাত্রীবাস আসতেই লাইন দিয়ে তারা দাঁড়াল, যে-যার মাল খুলে দেখাল, যারা আফগানী তারা একটা Declaration form সই করে দিল। সাতজন যাত্রীকে নজন কর্মচারী দশ মিনিটের মধ্যে সার্চ করে বিশ মিনিটের মধ্যে গাড়ি ছেড়ে দিল।

শ্যাম দেশেও কাস্টমসের বড় কড়াকড়ি অর্থাৎ সামান্য জিনিসের জন্য ঘুষ না দিলে উপায় নেই।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আবার রওনা হলুম।

রওনা হবার আগে হোটেলে পেট পুরে দুধ, পরোটা আর মাংস খেয়ে নিলুম। মাংসে হাড় ছিল না, তাই মনে হল দুম্বার মাংস—সুস্বাদুও বটে, তবে এত মসলা আর চর্বি, ঠিক পরিপাক সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল।

খানিকটা পথ যেতেই দেখা গেল কতকগুলো আফগান মজুর মাথার সঙ্গে বেল্ট দিয়ে চুপড়ি ঝুলিয়ে তাতে জ্বালানি কাঠ ভর্তি করে যাচ্ছে। দূর থেকে সিন্ধু-মুনির মত লাগছিল, পিঠে যেন তার পিতা অন্ধমুনি। বোঝাই কাঠের ওজন দু মণের কম হবে বলে মনে হয় না।

সিমলায় যেমন দেখেছি কাশ্মীরী কুলিরা পিঠে তিন মণ বোঝা নিয়ে চলে, এও সেরকম।

পথে মাঝে মাঝে এক্কা শ্রেণীর খচ্চরটানা গাড়িও দু-একটা নজরে পড়ে। কোনটায় কাবুলী দম্পতি, কোনটায় মাল বোঝাই, কাবুলের দিকে এগোচ্ছে। খচ্চরগুলো আমাদের দেশের মত হাড় জিরজিরে মরণোন্মুখ নয়। রাস্তায় যেতে যেতে চিত হয়ে শুয়ে তারা অনিচ্ছা অথবা ক্লেশ ব্যক্ত করে না।

প্রস্তরপুষ্ট পর্বতগুলোও যেমন, তেমনি পুষ্টদেহ নরনারীর, তেমনি পুষ্টদেহ জীবজন্তুর। সবারই রক্তে রয়েছে জোর—রয়েছে কর্মের ক্ষমতা। এই পাহাড়ী জীবনে কাব্য নেই, দর্শন নেই, আছে শুধু কর্ম।

আফগানিস্থান স্বল্প বিত্তের দেশ। তবু দারিদ্র্যকে অতি ভয়াবহরূপে এখানে দেখি নি! শাসনে শিথিলতা আছে, আছে পুরাতন কায়দায় ডিক্টেটরী নাৎসী ভঙ্গি। সামরিক শাসন অনেক ক্ষেত্রেই আছে। কিন্তু জনসাধারণ কেন্দ্রের অথবা আমীরের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখে না। তারা চেনে তাদের দলের পাণ্ডাকে। সামন্ততন্ত্র রয়েছে সর্বক্ষেত্রে। অসামরিক শাসনব্যবস্থায় ত্রুটি থাকলেও জনসাধারণের মধ্যে হাঙ্গামা নেই। শরীয়তি শাসনের ঢঙ রয়েছে, কিন্তু রাজকীয় আইনের মর্যাদা বেশি। তবে স্থানবিশেষে শরীয়তি শাসনের প্রাধান্য রয়েছে; সাধারণত এগুলো বিবাহ-বিচ্ছেদ ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্র। টাকার ক্রয়ক্ষমতা সেখানে বেশি। কিন্তু টাকা আছে খুব কম লোকেরই। দারিদ্র্য সর্বব্যাপক। তাই পাঁচ টাকা বেতনের ফৌজী সেপাই নিজেকে মধ্যবিত্ত মনে করে।

মধ্যযুগীয় মনোভাবাপন্ন ধর্মান্ধ আফগানকে আমরা আমানুল্লার দিনেও দেখেছি দেখেছি জাহিরশাহের প্রথম জীবনে। এই আফগানেরা যে একদিন প্রগতির পথে পা দেবে একথা ভাববার মত লোকের সংখ্যা পৃথিবীতে কোন দিনই ছিল না। হঠাৎ দেখা যাচ্ছে আফগানরাও কদম এগোবার মহড়া দিচ্ছে প্রতিবেশী সোবিয়েতের সংস্পর্শে এসে। এই প্রথম পদক্ষেপ, কিন্তু যেদিন আফগানকে দেখেছি সেদিন এই প্রথম পদক্ষেপের কোন ইঙ্গিতই ছিল না।

জালালাবাদে পৌঁছে সামান্য সময় বাইরে থাকতে পেরেছি, গোটা চব্বিশটা ঘণ্টাও সেখানে থাকতে পাই নি, ইচ্ছা থাকলেও, সুবিধা হয় নি। তবুও—

শুনেছি অনেক কিছু, দেখেছি যা, তাও প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের পক্ষে কম নয়। গাড়িতে বসে রিসালদারকে প্রশ্ন করতে থাকি অনবরত! প্রথম প্রথম সে বিপন্ন বোধ করলেও, পরে বেশ উৎসাহের সঙ্গেই বলে চলেছিল—জিজ্ঞেসও করতে হয় না, এক প্রসঙ্গ থেকে আর এক প্রসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল।

—হাঁ, একটা কথা সত্যি, অনেক সময় আমার দেশে মেয়ে বিক্রি হয়, ধনীরা কেনেও। কিন্তু তা প্রকাশ্য বাজারে হয় না। অনেক ক্ষেত্রেই মোহরানা বলেই তা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বেশ্যালয় নেই এদেশে, নষ্টা মেয়ে যে নেই, একথা বলতে পারি না। তবে হুজুর নষ্টলোক না থাকলে নষ্টা মেয়ে সৃষ্টি কি সম্ভব? পুরুষরাও সেদিক থেকে দোষী বটে! তবে সে সব বড় ঘরের কথা। গরীবের ঘরে নষ্টামি কম।

আমি বললুম, লোকে তো বলে, মেয়েরা যখন ঘর ছাড়ে, তখন পেটের জ্বালায় ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়।

—কেন ছাড়বে হুজুর, মেয়ে লায়েক হলে পুরুষেরা যেচে এসে বিয়ে করে। আর পয়সার লোভ? এমন পেটের জ্বালা আমাদের নেই। যদি বনিবনাও না হয়, তবে দরকার মত তালাক দিতে কতক্ষণ? যাদের দুটো-তিনটে বিবি, তাদের ঘরে পাপ ঢোকে, পুরুষও যেমন হারামী, মেয়েরাও তেমনি।

—তোমাদের পর্দা প্রথায় এটুকু বন্ধ হয় না।

—পর্দা দিয়ে কি মনকে আটক করা যায়? পুরুষের চোখ থেকে সাময়িক মেয়েদের লুকিয়ে রাখা যায়; যেখানে মেয়েদের চোখ পুরুষ খোঁজে সেখানে কি পর্দার আড়াল দিয়ে কিছু হয় হুজুর? তার উপর পর্দাটা হিন্দুস্থানে যেমন তেমন আর কোথাও নয়, পর্দায় একটু বড়লোকী থাকে, আর নিজেদের খানদানীর বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়।

—তোমরা তো তা হলে দু-তিনটে বিবি নিয়েও ঘর কর।

—দু-তিনটে! আশ্চর্য হয়ে সে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তাকিয়ে বলে, একটা বিবিকে রুটি দেওয়াই মুশকিল, আবার দু-তিনটে! বড়লোকের ঘরে কারুর কারুর রয়েছে এমনি ধারা। সবাই যদি দু-তিনটে বিবি নিয়ে ঘর করত, তা হলে আফগান মুলুকে অত মেয়ে পাওয়াই যেত না। আমার ঘরে একজোড়া বিবি থাকলে, আমার পক্ষে যেমন তাদের সঙ্গে সমান ব্যবহার করা অসম্ভব, তাদের পক্ষেও তেমনি। হুজুর, আপনার বয়স কম, চলুন দেখিয়ে দেব, মেয়েদের কেমন তেজ, তারাও লড়াই করতে কসুর করে না, বিপদ হয় পুরুষের।

—তা হলে তোমার দেশে বাইজী কসবী নেই?

—আছে হয়তো, আমীর-ওমরার ঘরে, আমাদের তা জানা নেই।

—তবে মেয়ে কেনে কে?

—ওরাই। তবে মেয়ে কেনা বাঁদীর জন্য নয়, তারও সামাজিক মর্যাদা রয়েছে। নইলে কাজীর আদালতে কয়েদ হতে হবে।

—তা হলে কাজীর কাজ বিবি গোনা !

আমার কথায় রিসালদার খুশী হতে পারল না ; অনুযোগ করে বললে, কাজী শুধু বিবিই গোনে না, তার কাজ ফারাজ করা থেকে খুনীর বিচার।

—শাসন করে কে, কাজী ?

—না, ফৌজী শাসন চলে, বিচার হয় কাজীর দরবারে।

—তাও ভালো ! বিচার আর শাসনবিভাগ মোটামুটি ভাগ করা হয়েছে। মহকুমা হাকিমের মত নিজেই চুয়াল্লিশ ধারা জারীও করে না, আবার তার বিচারও করে না। কিছুটা জুলুমের হাত থেকে তো ওরা বেঁচেছে !

রিসালদার বলে গোষ্ঠী-প্রধানদের কথা, গ্রামের মসজিদে লেখাপড়া শেখানোর কথা, কোথাও কোথাও সামন্ততন্ত্রের জুলুমের কথা, বেকার ব্যবস্থা, আরো কত কি। মন্তব্য করে, রোগটা কম, তাই চিকিৎসকও কম, দেশী প্রথায় হেকিম রয়েছে, তা বাদেও বিদেশ থেকে যারা চিকিৎসা শিখে আসে, তাদের ব্যবস্থা হয় সরকারী ফৌজে। কাবুলে চিকিৎসা শেখাবার স্কুলও নাকি আছে।

রিসালদার বলতে থাকে, লোক বড়ই গরীব হুজুর। তাতেই এরা খুশী। ওরা পরের ঘর থেকে কিছু এনে বড়লোক হতে চায় না। সবারই চাষের জমি রয়েছে, কারুর রয়েছে ছাগল-ভেড়া, তাতেই ওদের দিন গুজরান হয়। তবে জলের বড় কষ্ট। তাও গাঁয়ে গাঁয়ে ইঁদারার জলে চাষও হয়। নদীর জল কম হলেও, কষ্ট কম। ঐ ইঁদারার জলে চাষও হয়। নদীর জল ডোঙা করে আট-দশ মাইল দূরের জমিতে ছেঁচেও নেয়। কিছু বৃষ্টিও হয়।

যদিও সমবায় প্রথায় চাষের ব্যবস্থা নেই, কিন্তু সবাই মিলেমিশে ছেঁচে দেয়, আরও কিছু করে, যা করতে কুলিমজুরের প্রয়োজন হয়।

ওরা স্বাবলম্বী !

কাবুল আর জালালাবাদের দূরত্ব কম। কাবুলের পথেই জালালাবাদ। এই জালালাবাদে ডাক্তার ব্রেনান এসে খবর দিয়েছিল, কি করে আট হাজার ইংরেজ সৈন্যকে কাবুল থেকে জালালাবাদের পথে অনন্ত সমাধি তৈরি করতে হয়েছিল। ইংরেজের ইতিহাসে এর চেয়ে লজ্জাজনক আর করুণ পরাজয় কাহিনী আর লেখা হয় নি। স্বাধীনতা অপহরণকারীদের চরম শাস্তি হয়েছিল সেইদিন। সেই স্মৃতিবিজড়িত জালালাবাদ !

কাল এসেছি—আজ ফিরতে হবে।

কালকের দিনটা মন্দ কাটে নি।

পাশ দিয়ে কাবুল নদী বয়ে যাচ্ছে—তার কিনারায় বিকেলে এসে বসলুম।

পাহাড়ের বুক চিরে নদী চলেছে সাগরের দিকে, সে সাগর কতদূরে কে জানে! পথে-প্রান্তে আরও বন্ধু সংগ্রহ করে স্ফীতকায় হয়েছে নদী। ছুটে চলেছে, কোথাও তার নাম বদল হয়েছে, কোথাও তার গতিপথ, কোথাও তার রূপ, কখনও পাহাড়ের বুকে, কখনও কালোমাটির বুকে, কখনও লালমাটির কোণ কেটে—কোনই ঠিকানা নেই। সিন্ধুর বুকে এসে সে আপনহারা হয়ে লজ্জাবনতা বধূটির মত মহাসিন্ধুর দিকে মন্থরগতিতে চলেছে।

সেই নদীর কিনারায় ছোট ছোট কাব্‌লী ছেলে খেলে বেড়াচ্ছে, তাদের দুর্বোধ্য ভাষায় তারা আলাপ-আলোচনা করছে। কথাগুলো অস্পষ্ট তবুও শ্রুতিমধুর। ও-পাশের গাঁয়ের মেয়েরা জল ভরতে এসেছে—কলসীগুলো মাথায় নিয়ে, হাত দুলিয়ে, কোমর ঘুরিয়ে ওরা গল্প করছে নিজের মধ্যে। তাদের কল-কাকলি মাঝে মাঝে কানে আসছে—দূর বিহঙ্গমের সঙ্গীতের মত। বিরাট তাদের দেহ, উজ্জ্বল তাদের রূপ, আর কণ্ঠে যেন মধুভরা! এ মধুর মাধুরিমা মন মাতায়।

নদীর ধারে এলে কেমন যেন একটা উদাসীনতা এসে যায়। পিছিয়ে পড়ে মনটা। বহুকাল আগের দেশের স্মৃতি মনকে নাড়া দেয়!

আমাদের দেশের বাড়ির নীচ দিয়ে খালের মত যে নদীটা আজ বয়ে যায়, তিরিশ বছর আগে ওটাই ছিল স্রোতস্বতী। ঐ নদীটা ছিল আমার ছুটির দিনের সাথী। আঠারো-বিশ বছর আগে নিস্তব্ধ বৈকালিক আবেষ্টনীর মধ্যে দুই বন্ধুতে জাল নিয়ে ছোট বাড্ডি নৌকায় কতবার বের হয়েছি মাছ ধরতে, ধরাটা আচ্ছাদন, চুরিটাই উদ্দেশ্য।

একবার এমনি ধারা মাছ চুরি করতে বের হলাম। দুই বন্ধু বৈঠা তুলে নিলাম হাতে। নৌকা ভাটিতে ভাসল। বৈঠা মারলেই ছোট ছোট ঢেউগুলো নৌকার গায়ে ছলছল কলকল করে আছড়ে পড়ছিল অতি ধীরে—সোহাগের হাত বুলিয়ে।

সূর্য ডুবতে ডুবতে ছোট শহরটাকে পিছনে ফেলে বিলের জলে নৌকা ভাসল। বিলের জল টলটলে; কোথাও রয়েছে সামান্য স্রোত, কোথাও জল একেবারে স্পন্দনহীন।

আমরা এগোচ্ছি, কখনও বা মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে জাল ফেলছি, ঝপাং। দু-একটা মাছও পাওয়া যাচ্ছে, কখনও বা শুধু শামুক-গুগলি। প্রকৃতপক্ষে আমাদের শ্রমের মূল্য এককণাও পাই নি।

খেয়াজাল নিয়ে জেলেরা বসে আছে বকধার্মিকের মত। নৌকোর আলোটা এসে পড়েছে জলের বুকে, ছইয়ের ওপর বসে তামাক টানছে কেউ কেউ; তাদের বাঁয়ে রেখে এগোতে থাকি, নৌকা থেকে আওয়াজ এল, কে যায়?

—আমরা।

প্রশ্ন হল—আমরা কে?

বন্ধু আমার রসিকতা করে বললে, চলন বিলের নাইয়া।

ওরা উত্তর দেয়, চলন বিলে ঢালন আছে—নাইয়া, হুঁশিয়ার হ'।

আমরা চলি এগিয়ে।

লগি ছেড়ে বৈঠা—বৈঠা ছেড়ে লগি, চলেছি তো চলেছি, কোথায় যাচ্ছি তার নিশানা নেই। আছে কেবল জলের ছলছলানি শব্দ। রাতের প্রদীপ নিভে গেছে সবার ঘরে, আকাশে নক্ষত্র করছে মিটমিট—পিটপিট। শেয়ালগুলো কোথাও দূর ঝোপ থেকে ডেকে উঠে প্রহর জানায়, উককুস পাখি ওঁয়াক্ ওয়াক্ করে ডেকে চৌকি দেয়। কি নিস্তব্ধ বিলের কোল!

হঠাৎ ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পেছনে জলতে থাকে লাল, নীল, সবুজ আলো। আমি বললুম, নৌকা বাঁধ। আমরা পথ হারিয়ে পচা কাদায় এসে গেছি।

কাদার মধ্যে লগি পুঁতে, নৌকো বাঁধা হল।

বন্ধু বললে, তারপর?

—তারপর আর কি, সকাল অবধি এই বিলের বুকে বাস করতে হবে।

—সামনের কোনও একটা গ্রামে চলা যাক। এ ভুতুড়ে জায়গায় থাকা নিরাপদ নয়।

আমি হাসলুম। বললুম, আলেয়া, আলেয়া! দেখছিস, আলেয়া কেমন সুন্দর! কোথায় লাগে শ্যামাপূজার দীপালী। আলোর ঝরনা যেন ঝিরঝির করে নেবে আসছে। দে একটা খোঁচা, দেখবি জলের বুকে ভুটভুট করে শব্দ হওয়ামাত্র খোলা জলের বুকে আলোর খেলা শুরু হবে। আলেয়াকে ছেড়ে আজ আমি কোথাও যাব না!

—আমি বাপু খেয়েদেয়ে ঘুম দিচ্ছি—তুই বসে কাব্যি কর। মাছ তো পাওয়া গেল অষ্টরম্ভা, এখন করতে হবে আদিখ্যেতা।

সে পাউরুটি আর দুধ খেয়ে শুয়ে পড়ল, শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাসিকা-গর্জন। আমি বসে রইলুম ঐ আকাশের তলায়, আলেয়ার রূপ দেখতে। যার আকার নেই, তার রূপ নেই। কিন্তু অন্ধকার রাতে যদি কেউ নিস্তব্ধ লোকালয় থেকে

পরিচয় করিয়ে গুলজার নিষ্ক্রান্ত হল, যাবার সময় বলে গেল, অব্‌হি আ রহা হুঁ।

পরিচয়টা যেন বেশি করে অপরিচিত করে দিল। দুই পক্ষই নির্বাক। আমি ভাবলুম লছমীকে গল্পের আসরে আনা সোজা হবে; বললুম, লছমীজী একটা গান হোক।

লছমী প্রথমে লাল হয়ে উঠল, পরে সামলে নিয়ে বললে, আমরা আমাদের মরদ বিনে কাউকে গান শোনাইনে।

উত্তর খুঁজে পেলুম না। অন্য কাউকে একই অনুরোধ করে অন্যের মরদ হতেও রাজী নই—হবার সঙ্গতিই বা কোথায়!

ওরা আমার বিপন্ন অবস্থায় খুশী হল। প্রকাশ হঠাৎ হারমনিয়ামটা টেনে নিয়ে বললে, আমরা শোনাই আমাদের বোনদের।

প্রকাশ 'সৈঁইয়া সৈঁইয়া' করে গান ধরল। তার গান শেষ হতেই বললুম, কেমন জবাবটা মিলেছে?

ইতিমধ্যে গুলজারী এল। শুরু হল উৎসবের দ্বিতীয় পর্যায়—নাচ।

পরনে সালোয়ার, গায়ে ঢোলা কামিজ, ওড়না ঝুলছে কাঁধে, পিঠে ঝুলছে বেণী। হাতের তেলোয় মেহেদী দিয়ে আঁকা ফুল, নখগুলো মেহেদীর জর্দা রঙে ঝকঝক করছে, চোখে সুরমা, ঠোঁটে রঙ, কপালে কুমকুম। বলা যায় সুন্দরীশ্রেষ্ঠা।

তারা শুরু করলে নাচ। তাদের হাতে ছোট দুটো লাঠি।

বোশেখ মাসে নতুন গমের ফসল ফলবার পর তাদের দেশে যে উৎসব হয় সেই উৎসবের নাচ। ভঙ্গিমায় বলিষ্ঠতা, মুদ্রায় রূপক। সুন্দর শুধু তারা নয়, নাচেও সুন্দর।

আমার মনে হল, পঞ্জাবের কোন পল্লীতে বসে রয়েছি।

না দেখার মত করেই আফগানকে দেখে এসেছি, তবুও মনে হয়েছে স্বাধীনতার সুখের পেয়ালা ওরা চুমুকে চুমুকে গলাধকরণ করেছে। ওরা চায় না প্রতিবেশী পাখতুনরা ইংরেজের ভগ্নদূত পাকিস্তানী শাসকের হাতে নির্যাতিত হয়, আজাদী হারায়। আফগানরা নিজেদের আজাদীর যে সুখ উপভোগ করছে সেই সুখ ভাগাভাগি করে নিতে চায় স্বজাতীয় পাখতুনদের সাথে।

এই চিঠির সূত্রপাত পাক-আফগান মন-কষাকষি নিয়ে। তাদের কথা বলতে গিয়ে স্মৃতির যবনিকার অন্তরাল থেকে ছোটবড় কত কথাই মনে এসে গেছে।

মনে করেছিলুম, সব কথা বুঝি বর্মাতে বসেই লিখে শেষ করতে পারব। কিন্তু সরকারী ব্যবস্থায় আর নিজের দুর্ভাগ্যের তাড়নায় বর্মার জমি ছেড়েছি কাল। আজকের অসমাপ্ত চিঠির বাকি অংশ জাহাজে বসে শেষ করতে চলেছি। তবুও কত কথা বলা হল না। মানুষের সুখ-দুঃখ তো আর পুতুল-খেলা নয়! এ দিয়ে কত মহাভারত রচনা হতে পারে! কিন্তু সে ধৈর্য কোথায় আর কোথায়ই বা সেই মনের সুস্থতা।

পাক-আফগান বিবাদে আমার উত্তর—No man's land.

ইংরেজের স্কুলে-পড়া পাক-নেতারা দমাদম বোমা চালাচ্ছে, মনে ভাবছে ঐ বোমা দিয়ে স্বাধীনতাকামী পাখতুনকে পায়ের তলায় রাখবে। ওরাও আজ মেতেছে হত্যায়, হত্যার শোধ নিতে হবে। আজ সারা দুনিয়াতে চলেছে এগিয়ে চলার প্রতিযোগিতা, আজকে এসেছে শেকল ছেঁড়ার দিন! আজকেও কি পাশব শক্তির যুগ রয়েছে!

বহুকাল পরে মনে পড়ছে এসব কথা। কখনও ভাবি নি কাউকে বলতে হবে এই সব কাহিনী, তা হলে সাজিয়ে রাখতুম, বলতুম নাটকীয় ধরনে। কিন্তু ভাবি নি বলে অনেক জায়গায় হারিয়ে গেছে সূত্র; অনেক ঘটনা হয়তো রয়ে গেছে অকথিত। তাই কাহিনী অসমাপ্ত রয়ে গেল। কিন্তু দেশ-বিদেশ থেকে যে শিক্ষা নিয়ে এসেছি সে শিক্ষা আমায় শিখিয়েছে ভাবতে, শিখিয়েছে পথ খুঁজতে, যে পথে লাঞ্ছনার শেষ হবে।

আমার দেশেও আসমুদ্রহিমাচল একই কাহিনী রয়েছে; বাইরের প্রলেপটা দিয়েছে শাসকরা বাইরের লোককে বঞ্চনা করতে আর দেশের লোককে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিতে।

নয়তো এস আমার সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের গিরিকন্দরে। সেখানে চীনাবাদাম আর কালোমাটির তুলোর ক্ষেতে যেমন দেখতে পাবে বুভুক্ষু বস্ত্রহীন নরনারী, তেমনি দেখতে পাবে নাগা পর্বতের কন্দরে, তেমনি দেখতে পাবে উড়িষ্যার নীলগিরিতে, আর বাংলার সমতল প্রান্তরে। নির্লজ্জ শাসক সেদিনও এই দুর্ভাগ্যকে ব্যঙ্গ করেছে, আর অসহায় নরনারী শোষিত হয়ে রাস্তা-ঘাটে অনাহারে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেছে। আজও তার উল্লেখযোগ্য কোন ব্যতিক্রম হয় নি। এই ছিল ভারতের ছবি বিশ বছর আগে—এই রয়েছে ভারতের ছবি বিশ বছর পরেও। অথচ কত পরিবর্তন ঘটে গেছে পৃথিবীর বুকে!

সেদিন তিনান্‌জনে যাবার ট্রেনে উঠেছি, বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে দেখা।

তিনি বললেন, বর্মার নাগরিক অধিকার না নিলে চাকরি থাকে না, তাই নিতে বাধ্য হয়েছি।

আমি বললুম, একটা কেরানীগিরি-চাকরির মোহে নিজের জাতীয়তাকে ছাড়তে পারলেন!

—এই কেরানীগিরিও ভারতে জোটে না। তার ওপর আমি চট্টগ্রামের লোক, ভারতে যাব তো ভিখিরী হয়ে! জন্মেছিলুম ইণ্ডিয়ান হয়ে, কংগ্রেস আমাদের বানিয়েছিল পাকিস্থানী—শেষে সব ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে হয়েছি বর্মী। দুটো খেয়ে তো বাঁচব, দুজনকে খেতে দিতে তো পারব। পাকিস্থানে গেলে আমরা হলাম পঞ্চমবাহিনী, আর হিন্দুস্থানে ভিখিরী। চমৎকার! অথচ এটাও বাংলা —ওটাও বাংলা—দুটোই আমাদের দেশ! আমরা ঘরছাড়া ইহুদী। আমাদের নিজস্ব কোন দেশ নাই। তার চেয়ে বর্মী হওয়া কি ভালো হয় নি?

তাঁর যুক্তিকে নীতির দিক থেকে না মানলেও, বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারলুম না। যদিও আমি জানি, যতই উনি বর্মী হোন, বর্মীরা ওঁকে শ্রদ্ধা করবে না, বরং অনুকম্পা করবে।

কিন্তু সমাধান কোথায়?

আবার সেই 'সিরধানা' জাহাজ।

সঙ্গী সাথী নেই। একজন বাঙালী ভদ্রলোক ব্রীজের ওপর এসে দাঁড়াল। বাঙালীর পেটেণ্ট চেহারাটা দেখে বললুম, কোথায় যাবেন?

—কলকাতা!

—ওখানেই কি বাড়ি?

—না, যাব তমলুকে, ওখানে ফরিদপুর থেকে আমার পরিবার এসে রয়েছে।

গল্পে গল্পে উনিই বললেন, ছিলুম তো সোয়েবোতে। কিন্তু আগুন লেগে সব পুড়ে গেছে। তাই এখান থেকেও ভিখিরী হয়ে ফিরছি।

—কেন? আপনাদের সাহায্য দেবার চেষ্টায় বর্মার ভারতীয় কংগ্রেস বহু টাকা সংগ্রহ করেছে আর পাঠিয়েছে।

—না, পাঠায় নি, তার রাষ্ট্রদূতের মারফত বর্মী সরকারকে দিয়েছিল, আর সেই টাকায় বর্মী সরকার তাদের দেশের লোকেদের বাড়িঘর তৈরি করে দিয়েছে।

—আপনারা প্রতিবাদ জানালেন না কেন?

—জানাব তো ঐ এমব্যাসিকে? ওদের জানিয়ে কি লাভ? ওদের জিজ্ঞেস করুন গে তো, কতজন ভারতীয় বর্মায় বাস করে, তার হিসাব আছে

কিনা? ওরা তো পোস্ট অফিস—পাসপোর্ট দেওয়া আর চিঠি ফরওয়ার্ড করাই ওদের কাজ।

—ভারতীয়দের কোন উপকার যদি করে থাকে, তা করেছে বর্মার ভারতীয় কংগ্রেস। এমব্যাসি তো জনসাধারণের নয়, কয়েকজন মাথামোটা লোকের জন্য।

আমি বললুম, আমিও কিছু কিছু শুনেছি।

—তা হলে এমব্যাসির কি প্রয়োজন এখানে? কর্তাব্যক্তিদের কাছে যান, তাঁদের কথায় মনে হয়, কোথা থেকে যেন দ্বিতীয় গান্ধী অথবা জওহরলাল এসেছেন।

শুধু বর্মায় এই দুর্দশা নয়, শ্যামদেশে, সিঙ্গাপুরে—সব জায়গায় এই অবস্থা। তারা বলতে পারে না কতজন ভারতীয় রয়েছে সে দেশে, কতজন জন্মাচ্ছে, কতজন মরছে, কার কি পেশা। অথচ তাদের পুষতে পকেট কাটা যাচ্ছে দেশের গরীব জনসাধারণের। স্বদেশে যেমন ফিতেকাটা রাজ্যপাল, বিদেশেও তেমনি মিটিং-করা ভোজ-খাওয়া রাষ্ট্রদূত। অবশ্য শুনেছি, এসব ভোজে কারণও চলে, এঁরাই গান্ধীজীর শিষ্য!

এই হল মহাভারতের ভারতীয়! বলতে গেলে লজ্জা পেতে হয়।

অসম্পূর্ণ কাহিনী সময়ান্তরে সম্পূর্ণ করবার ইচ্ছে নিয়েই আজকের মত বিদায় নিচ্ছি।